প্রতিচিন্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

সপ্তম বর্ষ ● চতুর্থ সংখ্যা ● ঢাকা ● অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা, ২০১৭

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

নির্বাহী সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

দাম : ৫০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : www.prothom-alo.com/protichinta, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
October-December Issue, 2017; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূ চি প ত্র

স ম্পা দ কী য় ৬

স মা জ

তলস্তয়ের দেশে বলশেভিক বিপ্লব ৯
বদরুল আলম খান

রা জ নী তি ও সা হি ত্য

লেনিনের সাহিত্যপ্রেম ও রুশ বিপ্লব ৪৭
তারিক আলি

রা জ নৈ তি ক ই তি হা স

আমার পিতামহ আন্তোনিও গ্রামসি ৫৩
আন্তোনিও গ্রামসি জুনিয়র

দ লি ল প ত্র

১৯২৬-২৭ সময়কালে 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি'র গঠনতন্ত্র, ইতিহাস ও কার্যক্রম ৬৩
গোলাম আম্বিয়া খান লুহানী

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া ৭৩
গোলাম আম্বিয়া খান লুহানী

প র রা ষ্ট্র নী তি

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি দর্শন ৭৯
নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস

রা জ নী তি ও ই তি হা স ত ত্ত্ব

অন্ধকারে হাতড়ানো : একাত্তরের বহুমুখী বয়ান এখনো আসেনি ৯৯
নাঈম মোহায়মেন

ব ই আ লো চ না

ক্রোনিজম : পুঁজিবাদের এক কদর্য রূপ ১৪১
প্রতীক বর্ধন

লেখক পরিচিতি ১৫০

*প্রতিচিন্তা*র এবারের সংখ্যা আমরা অক্টোবর বিপ্লব ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সাজিয়েছি। ১৯১৭ সালের '১৭' উল্টিয়ে দিলে দাঁড়ায় '৭১'। সে দিক থেকে দুটি সালের মধ্যে একটি সংখ্যাগত সাযুজ্য আছে।

১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে রাশিয়ায় ক্ষমতাসীন জারের বিরুদ্ধে বলশেভিক বিপ্লব শুরু হয় এবং এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের গোড়াপত্তন ঘটে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী ভ্লাদিমির ইলিয়াচ লেনিনের নেতৃত্বে সেদিনের সেই বিপ্লব মানবজাতির ইতিহাসে এক অনবদ্য ঘটনা। এর প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে অক্টোবর বিপ্লবের গভীর অবদান রয়েছে। আজও এর প্রভাব বিদ্যমান। সারা দুনিয়ার মতো ভারতবর্ষেও অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব প্রতীয়মান হয়েছিল। এর ঢেউ লাগে এখনকার রাজনীতি ও সামাজিক বিন্যাসে। বাংলাদেশের জন্মলগ্নেও অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব আমরা দেখতে পাই। নির্যাতিত মানুষের অধিকারের দাবিতে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শ প্রতিফলিত হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনদানের মাধ্যমে। যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু পাকিস্তানের পক্ষে ছিল, তাই স্নায়ুযুদ্ধের বাস্তবতায় সোভিয়েত ইউনিয়ন তার প্রাথমিক রাজনৈতিক ফায়দা সমাজতন্ত্রপন্থী ভারতের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিল। তার ওপর ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের সোভিয়েত অক্ষে প্রবেশের সম্ভাবনার মতো বাড়তি সুবিধা।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথে ভারতের পাশে এসে সোভিয়েত ইউনিয়ন না দাঁড়ালে অনেক কিছুই বদলে যেতে পারত। এই সমর্থন প্রদান নিঃসন্দেহে ভূরাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের বাইরে ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতির খতিয়ান করেও অন্যায়-নির্যাতনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে

পারার ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণির আদর্শ বড় ভূমিকা রাখে। তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তা প্রদানে ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা যেমন কাজ করেছিল, তেমনি নির্যাতিতের পাশে দাঁড়ানোর আদর্শও অবদান রেখেছিল। কারণ প্রগতিশীলতা যেমন কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কাছে আদর্শ, তেমনি সাম্প্রদায়িকতাও অন্য কারও কাছে আদর্শ হতে পারে। দুই পক্ষই প্রাথমিক রাজনৈতিক ফায়দা নিজ নিজ আদর্শের মধ্যেই খোঁজার চেষ্টা করে। যদিও সেই আদর্শ চিরস্থায়ী হবে, এমন নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়।

এই সংখ্যায় অক্টোবর বিপ্লবের কোনো সামগ্রিক চিত্র বা পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়নি; বরং আমাদের উদ্যোগ ছিল অক্টোবর বিপ্লবের সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া এবং এর যে প্রভাববলয় সৃষ্টি হয়েছিল, তা ব্যক্তি অভিজ্ঞতার আলোকে তুলে ধরা। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক ইতিহাসের সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। কিন্তু তার গভীরতর সাংস্কৃতিক প্রভাবটি আমাদের বিবেচনায় কোনো অংশে কম মূল্যবান নয়। লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের এই পক্ষপাতিত্বের কথা বিনা দ্বিধায় কবুল করে নিচ্ছি। তাই এবারের সংখ্যায় লেখাগুলোর মধ্যে অভিজ্ঞতা বয়ানের পরিসরটি বড়। তবে অবশ্যই তা স্মৃতিচারণের গণ্ডিতে সীমিত নয়। অভিজ্ঞতার বয়ানের ভাঁজে ভাঁজে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ জায়গা করে নিয়েছে। ধরা পড়েছে অক্টোবর বিপ্লবের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিচ্ছায়া।

বদরুল আলম খান মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অক্টোবর বিপ্লবের দেশ রাশিয়ায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে 'তলস্তয়ের দেশে বলশেভিক বিপ্লব' প্রবন্ধটি লিখেছেন। এখানে একাধারে মুক্তিযুদ্ধের ব্যক্তিগত বর্ণনার পাশাপাশি রয়েছে অক্টোবর বিপ্লব-পরবর্তী রাশিয়ার জীবনধারা এবং বর্তমান অবস্থার চিত্র। লেখক শুধু রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ থাকেননি; তাঁর বর্ণনায় ধরা পড়েছে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য দেশেরও চিত্র।

দ্বিতীয় লেখাটি বামপন্থী তাত্ত্বিক ও *নিউ লেফট রিভিউ* জার্নালের একজন সম্পাদক তারিক আলির একটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে রুশ বিপ্লবের নেতা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জনক ভ্লাদিমির ইলিয়াচ লেনিনের সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা কীভাবে রুশ বিপ্লবকে প্রভাবিত করেছিল তার চিত্রায়ণ ঘটেছে। প্রবন্ধটি ব্রিটিশ সংবাদপত্র *দ্য গার্ডিয়ান* থেকে অনুবাদ করেছেন খলিলউল্লাহ্।

ইতালীয় বামপন্থী তাত্ত্বিক ও নেতা আন্তোনিও গ্রামসি মার্ক্সবাদের এক অপরিহার্য পাঠ। মার্ক্সবাদের তত্ত্বীয় কাঠামোয় রয়েছে তাঁর অনবদ্য অবদান। অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষে এই বিখ্যাত তাত্ত্বিকের নাতি আন্তোনিও গ্রামসি জুনিয়রের একটি লেখা আমরা *প্রতিচিন্তা*র পাঠকদের জন্য ছাপছি। লেখাটি *নিউ*

লেফট রিভিউ জার্নালে নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে লেখক তাঁর দাদা সম্পর্কে অজানা অনেক তথ্য দিয়েছেন। লেখাটিতে গ্রামসির পারিবারিক সম্পর্কের অনেক ঘটনা যেমন পাওয়া যায়, তেমনি লেনিনের সঙ্গে গ্রামসির যোগাযোগ ও সম্পর্কের তথ্যাদিও পাওয়া যায়। ইংরেজি থেকে লেখাটি অনুবাদ করেছেন গোলাম মুস্তাফা।

উপমহাদেশে অক্টোবর বিপ্লবের যে ঢেউ লেগেছিল, তার ফলাফল ছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। এই অঞ্চলে দুনিয়া কাঁপানো সেই বিপ্লবের প্রসঙ্গ টানতে হলে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির আলোচনা বাদ দিয়ে করা যায় না। তাই এই সংখ্যায় আমরা দুটি দলিলপত্র ছাপছি। এই প্রতিবেদনগুলো বর্তমান বাংলাদেশের গোলাম আম্বিয়া খান লুহানী কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের পক্ষে তৈরি করেছিলেন। রাশিয়া থেকে উদ্ধার করা এসব দলিলপত্রে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সে সময়কার গঠনতন্ত্র, ইতিহাস ও কার্যক্রমের বর্ণনার পাশাপাশি ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির উত্থানে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে *প্রতিচিন্তা*র এবারের সংখ্যায় নিলয় রঞ্জন বিশ্বাসের একটি প্রবন্ধ ছাপা হলো। এতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি দর্শন আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ভাষণগুলো কীভাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি দর্শন বিনির্মাণে অবদান রেখেছে, তা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাসহ এই প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারব।

বাঙালির জীবনে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাই বিশাল ক্যানভাসে মুক্তিযুদ্ধকে দেখার প্রয়াস নেওয়া জরুরি। কিন্তু অনেক সময় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করার চেষ্টা আমরা দেখেছি। এমনি একটি চেষ্টা আমরা দেখতে পাই শর্মিলা বসুর *ডেড রেকনিং* বইয়ে। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষক নাঈম মোহায়মেন এই বইয়ের সমালোচনা করে দেখিয়েছেন, কেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বহুমুখী বয়ান এখনো আসেনি। শর্মিলা বসুর বইয়ের সমালোচনার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আরও অনেক বিষয় তুলে এনেছেন এই লেখক।

সব শেষে রয়েছে বই আলোচনা। অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষের প্রেক্ষাপটে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সমাজতান্ত্রিক দেশ চীনে পুঁজিবাদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে চীনা গবেষক মিনঝিন পিয়ের *চায়না'স ক্রোনি ক্যাপিটালিজম: দ্য ডাইনামিকস অব রেজিম ডিকোয়* বইটি আলোচনা করেছেন প্রতীক বর্ধন। এই আলোচনায় ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের যে কদর্য রূপ ফুটে উঠেছে, তা অন্যান্য দেশের বাস্তবতার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তলস্তয়ের দেশে বলশেভিক বিপ্লব

বদরুল আলম খান

এক

যশোরের কালীগঞ্জ বাজার থেকে কোটচাঁদপুর যাওয়ার প্রধান সড়ক। সড়কের দুধার ঘেঁষে রয়েছে সারি সারি বৃক্ষ। সারা বছর তারই ছায়ায় আধো আলো আধো অন্ধকার পরিবেশ বিরাজ করে। প্রচণ্ড রোদে পথচারীদের স্বস্তি দেয় এই বনাশ্রিত পরিসরটুকু। সাত কিলোমিটার যাওয়ার পর ডান হাতে পড়বে এলাঙ্গি নামের একটি গ্রাম। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় আমি এখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বয়সে তখন তরুণ। সে কারণে সমস্যা ছিল দুদিক থেকে। মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার ইচ্ছা অনেকবার ব্যক্ত করেছি। কিন্তু বাবার বাধায় সেটি হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রোশে পড়ারও শঙ্কা ছিল। বাবা-মা চেয়েছিলেন সেই শঙ্কাবোধ থেকে আমাকে মুক্ত রাখতে। মনে আছে, তখনো ঘোর অন্ধকার। সূর্য ওঠার অনেক বাকি। মা একটি ব্যাগে কিছু খাবার এবং কাপড়চোপড় সযত্নে গুছিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন, 'যুদ্ধের কারণে তোকে এলাঙ্গি যেতে হবে। যুদ্ধ চলছে। সেখানেই থাকবে।' জায়গাটিকে নিরাপদ ভেবে সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন বাবা। যুদ্ধের কারণে আমাদের পরিবার তখন গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। বাস-ট্রেনে করে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমি এবং আমার বাবা রওনা হলাম হেঁটে। ২৫ কিলোমিটার পথ। তখনো চারদিক ঘোর অন্ধকার। হেঁটে চলেছি গ্রামের ধূলিময় রাস্তা দিয়ে। মাঝেমধ্যে উন্মুক্ত মাঠ, জলে ভরা খাল-বিল। কৃষকের বাড়ির উঠানের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে আমার ক্লান্ত দুখানি পা। রাস্তার পাশে পোড়াবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। জিজ্ঞাসা করি 'কারা পোড়াল?' উত্তর এল, 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গতকাল এসেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজে।' অতি সন্তর্পণে পাকিস্তানি সেনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোথাও সোজা পথ, কোথাও আঁকাবাঁকা পথ ধরে ক্লান্ত-শ্রান্ত

হয়ে অবশেষে পৌঁছালাম এলাঙ্গি গ্রামে। এই গ্রাম বাবার মায়ের জন্মস্থান।

বাবার বয়স যখন দশ তখন আমার দাদি এবং দাদা দুজনেই মারা গিয়েছিলেন। দাদির মৃত্যুটি ছিল আকস্মিক। ব্যাসিলারি আমাশয় নামের এক রোগে তিনি গত হয়েছিলেন দুই দিনের ব্যবধানে। সে সময় ওই রোগের কোনো ঔষধি প্রতিকার ছিল না। ফলে মারা গিয়েছিলেন যাকে বলে বিনা চিকিৎসায়। এ নিয়ে বাবার মনে দুঃখের সীমা ছিল না। মাঝেমধ্যে আমাদের সঙ্গে যখন তিনি মায়ের গল্প বলতেন তখন দেখতাম তাঁর চোখ দুটো ছলছল করছে। বাবার নানিমাকে আমি দেখেছি অনেকবার। তিনি দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন। একেবারে একচিলতে শরীর। বয়স নব্বই-পঁচানব্বই হবে। মুখের মাংস ঝুলে পড়ছে। চোখের দৃষ্টি নিথর। ধবধবে সাদা শাড়ি পরে পরিসর সীমিত একটি ঘরে তাঁর আশ্রয়। সারা দিন কাটিয়ে দিতেন বিছানার ওপর বসে। দুই পা একসঙ্গে করে হাত দুটো দুই হাঁটুর ওপর রেখে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। মাঝেমধ্যে মন্ত্র পড়ার মতো বিড়বিড় করতেন। নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলছেন। কখনো মনে হতো যেন কোনো গভীর ধ্যানে মগ্ন। সেই মগ্নতা ভেঙে যেত ক্ষণিকে যখন কারও পায়ের শব্দ পেতেন। মাঝেমধ্যে দেখেছি শুয়ে আছেন। শোয়া বলে না। মায়ের গর্ভে শিশু যেভাবে মাথা এবং পা এক বিন্দুতে এনে শরীরটাকে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে রাখে, ঠিক সেই রকম। ভাবি জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যে কতই বা পার্থক্য! সন্দেহ বোধ করি প্রৌঢ়ত্ব আর শিশুকালের মধ্যে ব্যবধান বলে কিছু আছে কি না। মাঝেমধ্যে তাঁর পাশে গিয়ে আমি বসেছি। বসে থেকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো উপভোগ করেছি তাঁর সান্নিধ্য। আমার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন কী আদর করে! ভেবেছি আমার দাদি মেহেরুন্নেছাকে আমি দেখিনি বটে। কিন্তু যিনি তাঁর গর্ভধারিণী তাঁর পাশেই তো বসে আছি আমি। যেন অনুভব করছি মেহেরুন্নেছার স্পর্শ। কেমন ছিলেন তিনি জানি না। তাঁর কোনো ছবিও নেই আমাদের পারিবারিক সংগ্রহে। কিন্তু বাবা বলতেন তাঁর গায়ের রং ছিল এমনই ফরসা যে নীল রঙের শিরা-উপশিরাগুলো দেখা যেত সুস্পষ্টভাবে। বংশ মানসম্মান রক্তের যে ধারা এই বৃদ্ধার দেহে প্রবাহিত তার সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততার কথা ভেবে মন এক আবেগের স্রোতে ভেসে যেত। ভাবলেশহীনভাবে তাঁর পাশে বসে আমি কাটাতাম দীর্ঘ মুহূর্ত।

এই নারীর স্নেহেই বড় হয়েছিলেন আমার বাবা। কিন্তু তারপরও কঠোর অনাথ জীবন তাঁর মনের সব উষ্ণতা এবং জীবনের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিল অনেকটা অলক্ষ্যে। সেই নির্দয় মনোজগৎ তাঁর ব্যবহারিক জীবনে প্রতিফলিত হতে দেখেছি। আলাপ ব্যবহারে দেখেছি রুক্ষতার ছাপ। রাগী ছিলেন প্রবলভাবে। ছেলেমেয়েদের রাখতেন কঠোর শাসনের বাঁধনে। জীবনে অতিমাত্রিক উচ্ছলতা কখনো পছন্দ করতেন না। মায়ের প্রতি ছিল গভীর ভালোবাসা। সেটি

জেনেছি তাঁর লেখা ডায়েরির পাতায়। কিন্তু ভালোবাসার সেই অনুভূতি প্রায়ই ভোঁতা হয়ে তার জায়গায় স্থান করে নিত নির্মম কঠোরতা। যদি সততার কথা বলি তাহলে সেখানে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। কোটচাঁদপুর হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করে তিনি পড়তে গিয়েছিলেন কলকাতার রিপন কলেজে। এই এলাঙ্গি গ্রামে ছোটবেলায় আমি এসেছি বহুবার। মানুষের মুখে শুনেছি বাবার ছোটবেলার নানা কাহিনি। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে যে কটি মাস এখানে কাটিয়েছি, সে সময়কে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বলে মনে করি। আজও মনে পড়ে বাবার মামাতো ভাইয়ের স্নেহ ও আদর। এ যেন আত্মার টান। সেই টান আমাকে বহুবার বহু কারণে নিয়ে এসেছে এলাঙ্গি গ্রামের অতি কাছের কিছু মানুষের সান্নিধ্যে। মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা এখানেও কমবেশি উপলব্ধি করেছি। লক্ষ করেছি গ্রামের আশপাশে মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে সক্রিয় আছে। তাদের সাহায্য করতে সচেষ্ট হয়েছি। একবার এখানে আশ্রয় নেওয়া এক বড় ভাইয়ের সঙ্গে (তাঁর নাম দুলাল) গিয়েছিলাম ট্রেনলাইন উপড়ে ফেলতে। হাতে লোহার রড। সঙ্গে একটি রেঞ্চ। সেই রেঞ্চ দিয়ে খুলতে চেষ্টা করেছিলাম ট্রেনলাইনের নাটবল্টু। পারিনি। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি। সময়টি আমার জন্য ছিল আশা-নিরাশার মধ্যে বাস করা। রাতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর শুনে ভরসায় বুক বেঁধেছি। আবার সব আশা-ভরসা ভেসে গেছে মুক্তিযুদ্ধের কোনো দুঃসংবাদ, ব্যর্থতা অথবা বিশেষ কোনো মৃত্যুসংবাদে। দাদার বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের টহল ছিল প্রায় প্রতিনিয়ত। সামরিক গাড়ির কনভয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ধীরগতিতে এগিয়ে যেত কোটচাঁদপুরের দিকে। আবার ফিরে যেত যশোর ক্যান্টনমেন্টে। বাড়ির জানালা দিয়ে আড়চোখে তাদের চেহারা দেখেছি। জিপ গাড়ি থামিয়ে মাঝেমধ্যে তারা রাস্তার দুপাশে হেঁটে চলা মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করত। দু-একজনকে তুলে নিত জিপে। উত্তেজনা ভীতি আশঙ্কা—সব মিলিয়ে কেটে গেছে ওই কয়েক মাস। একদিন দেখি বাবার সর্বকনিষ্ঠ মামাতো ভাই উধাও। কেউ জানে না কোথায় হাওয়া হয়ে গেলেন তিনি। পরে জানা গেল পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে তাদের ক্যাম্পে। এলাঙ্গি গ্রামে এ ধরনের ঘটনা তেমন ঘটতে শুনিনি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ যতই সমাপ্তির দিকে এগিয়ে গেছে, পাকিস্তানি সেনারা ততই হয়ে উঠেছে মরিয়া।

১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর। দিনটির কথা ঠিক মনে আছে। দুপুরে হঠাৎ রটে গেল পাকিস্তানি সেনারা কালীগঞ্জ বাজার থেকে অগ্রসর হচ্ছে কোটচাঁদপুরের দিকে। আমরা পালাচ্ছি। মাঠ অতিক্রম করে যাচ্ছি পাশের গ্রাম গুড়পাড়ায়। মাঠ পার হতে গিয়ে পড়লাম বিপদে। পাকিস্তানি মর্টার আক্রমণ চলছে মাঝেমধ্যে। মনে হচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে উড়ছে মর্টার। তার বিকট শব্দ আকাশ-বাতাসকে প্রকম্পিত করছে। মাটিতে শুয়ে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করলাম। ওপরে নীল

আকাশ। চারদিকে শীতের শস্যহীন খালি মাঠ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পুনরায় প্রাণ নিয়ে পালানোর চেষ্টা। আমার সঙ্গে ছিল আমার দুই বোন এবং বাবা। রাত কাটল প্রায় না ঘুমিয়ে। প্রচণ্ড গোলাগুলি চলল রাতভর। ঘুম আসে না। উঠানে সবাই জড়ো হয়ে বসে আছি। বাবা ভয়ে সন্ত্রস্ত। কী হবে দুই যুবতী মেয়েকে নিয়ে। যদি পাকিস্তানি সেনারা এই গ্রাম আক্রমণ করে? কী হবে আমার মতো যুবককে নিয়ে। জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ভাবি নানা কথা। ভোরের দিকে গোলাগুলি থেমে এল। সকালে উঠে দাদার বাড়ির দিকে এগোচ্ছি। পুকুরের ধারে পৌঁছে দেখি এক ভারতীয় শিখ সেনার মৃতদেহ গোলার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া নারকেলগাছের একেবারে গোড়ায় শায়িত অবস্থায় আছে। দেহে প্রাণ নেই। বুকের জায়গাটিতে চাপ চাপ রক্ত। পা নেই। হাতে তখনো বন্দুকটি ধরা। ভাবি কোথায় কোন সুদূর পাঞ্জাব থেকে আসা এই তরুণ সেনা। দেহটি পড়ে আছে এই গ্রামের মাটিতে। বাবা-মা, পরিবার-পরিজন আত্মীয়স্বজন জানল না বাংলার প্রত্যন্ত এই গ্রামে চিরশায়িত আছে তাদের সন্তান, ভাই, স্বামী বা আর কেউ। বাংলার মাটিকে মুক্ত করতে গিয়ে জীবন দিল অকৃপণভাবে।

দাদার বাড়ির প্রায় কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। দেখি পিচঢালা রাস্তার ওপর লাশের ছড়াছড়ি। নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে চারদিকে। পাকিস্তানি সেনাদের নিথর দেহ। মাঝেমধ্যে ভারতীয় সেনার মৃতদেহ পড়ে আছে রক্তাক্ত অবস্থায়। কালভার্টের নিচে অথবা পাশে বিলের পানিতে। হঠাৎ দেখি আহত এক পাকিস্তানি সেনা মাথা নিচু করে বসে আছে। চোখে-মুখে আতঙ্ক। মুক্তিযোদ্ধারা তাকে আটক করেছে গত রাতে। আশপাশে পাকিস্তান বাহিনীর কোনো চিহ্ন নেই। বুঝি দলছুট হয়ে অবধারিত মৃত্যুর মুখে সে এখন দাঁড়িয়ে। সবার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছে। দৃশ্যটি কেন জানি আমার দুর্বিষহ মনে হলো। স্থান ত্যাগ করে আমি চলে এলাম বাড়িতে। জানি না কী হয়েছিল পরে। তবে দুপুর গড়াতেই দেখি শত শত ভারতীয় সেনা কোটচাঁদপুরের দিক থেকে এলাঙ্গি গ্রামে এসে হাজির। বুঝতে বাকি নেই তারা এসেছে ভারতের ধর্মপুর এবং পুটিখালি সীমান্ত অতিক্রম করে জীবননগর বৈদ্যনাথপুর হয়ে কোটচাঁদপুর এবং এলাঙ্গি গ্রামে। এসেই তারা দখল করে নিল স্কুলের মাঠটি। দাদার দোতলা বাড়ি হঠাৎ পরিণত হলো ভারতীয় বাহিনীর কমান্ড পোস্টে। দুপুর গড়াতেই দেখি ভারতীয় বিমানবাহিনীর জেট বিকট গর্জন করে ছুটে চলেছে কালীগঞ্জের দিকে। দুই মিনিট পর প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বুঝতে বাকি রইল না বোমাটি পড়েছে কালীগঞ্জ সুগার মিলের ওপরে অথবা কাছাকাছি কোথাও। জানতাম সেখানে রয়েছে পাকিস্তানি সেনাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘাঁটি। কুণ্ডলী পাকিয়ে কমলা রঙের ধোঁয়া উড়ছে আকাশে। স্বাধীনতার যে বেশি বাকি নেই, সেটি বুঝতে দেরি হলো না।

আমার মায়ের মামাতো ভাই আবদুর রাজ্জাক যুদ্ধ চলাকালে একটি বই আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। চাচা পেশায় ছিলেন উকিল। কিন্তু ওকালতির চেয়ে তাঁর মন ছিল রাজনীতিতে। বিশ্ব ইতিহাসের ওপর তাঁর ছিল প্রচণ্ড দখল। এমনিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণি নিয়ে বের হননি। আর বিশেষ জ্ঞান ছিল গাছপালার ওপর। প্রায় সব গাছের লাতিন নাম তিনি জানতেন। তাঁর সঙ্গে রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে প্রায় বিব্রত বোধ করেছি। 'বল তো এই গাছের নাম কী?' দুই আঙুলের ফাঁকে সিগারেট চেপে বুকের ধোঁয়ার সবটুকু নাকের দুই বহির্গমন দিয়ে বের করতেন। মনে হতো যেন বাষ্পচালিত ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে বেরোচ্ছে সেই ধোঁয়া। চাচার বড় ভাই ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি বেশ কয়েকটি ভাষাও জানতেন। শুনেছি কিছুকাল প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীকে কাবুলে থাকাকালীন ফারসি ভাষা শিখিয়েছিলেন। বিলেতে যাওয়ার পথে থেমেছিলেন আফগানিস্তানে। ইরানেও কাটিয়েছিলেন কয়েক মাস। সেখানে রেজা শাহ পাহলভি পরিবারের কাউকে ইংরেজি শিখিয়েছিলেন বলেও শুনেছি। আমার বাবার সঙ্গে আড্ডায় চাচা সোভিয়েত ইউনিয়নের গল্প করতেন। গল্প বলতেন নানা ঢঙে। বলতেন, 'এই না হলে দেশ! সুখী সমাজ হতে গেলে আমাদের দেশকেও গড়তে হবে ওইভাবে।' বর্ণনা দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর ছিল অতুলনীয় প্রতিভা। বাম রাজনীতি করতে গিয়ে একবার তিনি যশোর থেকে কলকাতা গিয়েছিলেন পায়ে হেঁটে। সে ব্রিটিশ আমলের কথা। শুনেছি তাঁকে বহুবার রাত কাটাতে হয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামের কোনো মসজিদ বা কৃষকের গৃহে। তখন পাকিস্তান আমল। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ। চাচাও আত্মগোপনে। বাম রাজনীতির সে এক দুর্যোগময় সময়। চাচা নিজের কথা ভুলে মানুষের উপকার করতে চাইতেন। নড়াইলের তেভাগা আন্দোলনের প্রখ্যাত কৃষকনেতার মৃত্যুর পর চাচা তাঁর কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন স্বেচ্ছায়। নানা সংকট থেকে পরিবারটিকে মুক্ত রাখাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। তারপর থেকে নড়াইলে বাড়ি করে সেখানেই তিনি বসবাস শুরু করেন, যদিও তাঁর ওকালতি ছিল যশোর শহরে। চাচার মুখে শুনেছি আরও অনেক গল্প। আত্মগোপনকালে প্রখ্যাত লেখক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সত্যেন সেনের সঙ্গে সখ্য ছিল। একটি গল্প তিনি একবার আমাকে শুনিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সত্যেনদাকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন গোপনে পার্টির নেতৃস্থানীয় একজনের কাছে পৌঁছে দিতে। খামটি তিনি রেখেছিলেন বগলদাবা করে। সেটি নাকি হারিয়ে গিয়েছিল পথে। যে বইটি তিনি আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন তার রং মেটে। সাইজে বেশ মোটা। নিউজপ্রিন্টে ছাপা। ওপরে লেখা 'প্রশ্নোত্তরে সোভিয়েত ইউনিয়ন'। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে বইটির পাতা উল্টেছি বহুবার। দাদার বাড়ির দোতলার ছাদে বসে। যুদ্ধ

চলাকালে শুনেছিলাম সপ্তম নৌবহরের কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারের কুটিল রাজনীতি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রায় থামিয়ে দিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের পাশে এসে দাঁড়ানোয় তা আর সম্ভব হয়নি। ফলে সহানুভূতির এক বিস্তীর্ণ ভুবন ওই দেশকে ঘিরে আমার মনোজগতে স্থান করে নিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সেটি আরও শিলায়িত হয়েছিল ওই বইটি পড়ে। নানা ধরনের প্রশ্ন ও উত্তর ছিল বইটির প্রতিটি পাতায়। অক্টোবর বিপ্লবের কথা, লেনিনের কথা, প্রতিবিপ্লবীদের কথা, সোভিয়েত রাষ্ট্র গঠনের কথা, সাধারণ মানুষের সংগ্রামের কথা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথা। আমার জ্যেষ্ঠ বোনকে প্রায়ই বলতাম, 'দেখিস, একদিন আমিও যাব ওই দেশে। দেখে আসব দেশটি কেমন।'

আগের কিছু স্মৃতি মনে পড়ে। তখন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে পড়ি। শিগগির উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। কলেজের লাইব্রেরিতে হঠাৎ চোখে পড়ল বিশ্বখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের একটি লেখা। লেখাটি সমাজতন্ত্রের ওপর। নাম 'কেন সমাজতন্ত্র?' লেখাটি প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৯৪৯ সালের মে মাসে। সেখানে তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজকে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সমাজ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। তথ্যপ্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন কী কারণে সমাজতন্ত্রই সেই আদর্শ যে আদর্শ দিয়ে গড়া সম্ভব প্রকৃত মানবসমাজ। লেখাটি পড়ে মনে হয়েছিল এ তো কেবল মহাজ্ঞানধারী কোনো পদার্থবিজ্ঞানী নন। এ তো একাধারে বিশাল মাপের এক সমাজবিজ্ঞানীর লেখা। সেই প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন কেন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করতে হবে। দেখিয়েছিলেন পুঁজিবাদী অর্থনীতি কীভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ব্যক্তিমালিকানা কীভাবে ব্যক্তি এবং সমাজের সম্পর্ককে বিকৃত করে দেয়, যেখানে সাধারণ মানুষের পাওয়ার কিছুই থাকে না। থাকে না জীবনের কোনো নিশ্চয়তা বা ভরসা। যে ধরনের রীতিনীতি ওই সমাজ গড়ে তোলে আইনস্টাইন তাকে সমাজজীবনের জন্য নেতিবাচক ভেবেছিলেন। সেই নীতি তাঁর ধারণায় সাধারণ মানুষের জীবনকে নিঃশেষিত করে দেয়। ধ্বংস করে দেয় জীবনস্পৃহাকে। পঙ্গু করে দেয় স্বাদ-আহ্লাদকে। আইনস্টাইন স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন এক সামাজিক সম্পর্কের যে সম্পর্ক পুঁজিবাদী অর্থনীতির লোভ-লালসাগত উদ্বেগ থেকে বিরত থাকে। মানুষের মনকে পঙ্গু করে দেয় না। আরও ভেবেছিলেন এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার কথা, যা প্রাধান্য দেবে সামাজিক মঙ্গল-ভাবনাকে। মুনাফা বা ভোগদখলের মানসিকতা সৃষ্টি তার কাজ নয়। সেই সময় থেকে কেটে গেছে বহুকাল। আইনস্টাইনের প্রতিটি কথা আমার মনকে সেদিন ভরিয়ে দিয়েছিল। আপেক্ষিক তত্ত্বের স্রষ্টা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সমাজতান্ত্রিক আদর্শে।

তবে একই সঙ্গে আইনস্টাইনের লেখায় লক্ষ করেছিলাম একটি সতর্কবাণী। সে দিকটি আমি কখনো ভুলিনি। আমার মনে হয়েছিল সেটিই ছিল তাঁর লেখার

সবচেয়ে মূল্যবান দিক। তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ভালো। কিন্তু সেই ব্যবস্থাই আবার ব্যক্তিকে শৃঙ্খলিত করতে পারে, যদি আমলাতন্ত্র বা পার্টি সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠে। তাঁর উপদেশ ছিল যেভাবেই হোক আমলাতান্ত্রিক একনায়কত্বকে রুখতে হবে। যেন মাথাচাড়া দিয়ে সে উঠতে না পারে। নিশ্চিত করতে হবে ব্যক্তির অধিকার এবং স্বাধীনতাকে। অন্যথায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের সব চেষ্টা হবে ব্যর্থ। কীভাবে আমলাতান্ত্রিক একনায়কত্বকে রোখা যাবে তার একটি ধারণা তিনি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে তুলতে হবে গণতান্ত্রিক ফ্রেমওয়ার্ক এবং পরিবেশ। সেই ফ্রেমওয়ার্কের প্রকৃত রূপ কী সেটি ওই লেখায় স্থান পায়নি। কিন্তু নিঃসন্দেহে ওই দায়িত্ব তিনি হস্তান্তর করেছিলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে। জানি আইনস্টাইনের ওই ভাবনাটি গড়ে উঠেছিল দুই আদর্শের প্রভাবে। জার্মানিতে বসবাসকালে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজকে তিনি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর অর্থনীতির প্রতি। আবার হিটলারের ফ্যাসিবাদী শাসন যে গভীর সংকটের সৃষ্টি করেছিল, তা থেকে পালিয়ে তিনি এসেছিলেন আমেরিকায়। সেখানে পরিচিত হয়েছিলেন গণতন্ত্রের সঙ্গে। দেখেছিলেন ব্যক্তিস্বাধীনতার মূর্ত বহিঃপ্রকাশ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এক শ বছর পর আজ তাঁর কথাগুলো বারবার মনে পড়ে। মনে পড়ে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের কারণ খুঁজতে গিয়ে। রাজনীতিবিদদের কোনো প্রজন্ম কি আইনস্টাইনের ওই সতর্কবাণীর প্রতি মনোযোগ দিয়েছিল? 'না' বলেই ধারণা করি। সমাজতন্ত্রীরা আইনস্টাইন পড়েননি। পড়লেও উপেক্ষা করেছেন তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান কথাটি। ঊনবিংশ শতাব্দীর অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সৃজনশীল সাহিত্য এবং দার্শনিক ঐতিহ্যকেও তারা ভালো করে অনুধ্যান করেছিল কি না সন্দেহ করি। সে সাহিত্য হোক না ফরাসি, জার্মান অথবা রুশ। প্রতিটি সাহিত্যভান্ডারই শৈল্পিক মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষের মনোজগতের স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়েছে। যে ব্যক্তিস্বাধীনতা পুঁজিবাদী সমাজে অবদমিত হয় সাহিত্যিক ও দার্শনিক সমাজ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু কেউ কি ভেবেছিল সেই স্বাধীনতাই আবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে নিষ্পেষিত হবে? সমাজতন্ত্র কি দাবি করেনি একমাত্র ওই আদর্শই মানুষের সার্বিক বিকাশকে নিশ্চিত করবে। প্রস্ফুটিত করবে মানুষের সব সম্ভাবনাকে। কোনো বৃত্তায়নের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তার সুপ্ত প্রতিভাকে মূর্ত করে তুলবে? 'ডক্টর জিভাগো' বা আরও অন্যান্য লেখা পড়ে কিন্তু বারবার মনে বেজেছে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার দিকটি। শ্রমিক কৃষকের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীর চিন্তার সংযোগ ঘটেনি। না হলে কীভাবে তারই অভ্যন্তরে গড়ে উঠল পুঁজিবাদের হিংস্র এবং কর্তৃত্ববাদের নব্য সংস্করণ। এই ব্যর্থতাই কি সমাজতন্ত্রকে পরিণত করেছিল যান্ত্রিক

এক ব্যবস্থায়, যা কিনা ধ্বংস করল তার অভ্যন্তরীণ সৃজনশীলতাকে? মাঝেমধ্যে মনে হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যেন কেমোথেরাপি দিয়ে ক্যানসারের চিকিৎসা করা। যে থেরাপি ধ্বংস করে শরীরের সুস্থ এবং পীড়িত—উভয় সেলকে। ফলে ভাবি সমাজতন্ত্রের মধ্যেই কি রয়ে গেছে একনায়কত্বের বীজ? তাহলে ব্যক্তিবিশেষকে, যেমন জোসেফ স্তালিন বা আরও কাউকে, দোষারোপ করে কী লাভ!

যা-ই হোক, আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ শেষ হলো। নতুন রাষ্ট্র। ফিরে এলাম বুয়েটে। শেরেবাংলা হলের দক্ষিণ প্রান্তের ৪০৫ নম্বর রুম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ায় মন নেই। চারদিকে আশান্বিত যুবসমাজ ঘিরে রেখেছে আমাকে। চলছে মিটিং-মিছিল। নানা জাতীয় উদ্দীপনার ঢেউ আঘাত করছে চারদিক থেকে। রাত করে আড্ডা। গভীর রাতে দল বেঁধে মোরগ-পোলাও খাওয়ার মধ্যে কী আনন্দ পেয়েছি জানি না। বুয়েটে চলছে ছাত্র ইউনিয়নের নানা সম্মেলন। পোস্টার লেখা মিছিল। এ এক গভীর আনন্দ। নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়নের একচ্ছত্র আধিপত্য। সে এক অন্য আমেজের মধ্যে বাস করা। এরই মধ্যে ঘটে গেল এক অঘটন। হঠাৎ একদিন কী এক সামান্য কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর অপমানিত হলেন ছাত্রলীগের এক মাস্তানের হাতে। মাস্তানটি নাকি পিস্তল উঁচিয়ে প্রফেসরকে শাসিয়েছিল। প্রতিবাদে বুয়েটব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল চাপা বিক্ষোভ। মনে আছে বিশাল মিছিল করে আমরা গিয়েছিলাম বঙ্গভবনে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে। এর প্রতিকার পেতে। মুজিব বেরিয়ে এলেন। ধৈর্য ধরতে বললেন। বললেন কী জটিল সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে দেশ। চারদিকে অস্ত্রের ছড়াছড়ি। উদ্ধার করব কী করে? অস্ট্রেলিয়ার এবিসি রেডিওর সাংবাদিক আমার দিকে এগিয়ে এল। আমাকে ওই বিক্ষোভ সম্পর্কে কিছু বলতে বলল। সেদিন কী বলেছিলাম তা ঠিক ঠিক মনে আছে। বলেছিলাম এই সরকার মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলছে। সোনার বাংলার কথা বলছে। আসলে তার পক্ষে এসব পূরণ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। দেখি আমার পাশ ঘিরে ক্রোধের একঝাঁক চোখ। ছেলেগুলো ছাত্রলীগের। তাদের দেখেছি বুয়েটের মিছিল-মিটিংয়ে। ভয় পেয়ে গেলাম। আমাদের ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা আমাকে আগলে রাখল। ফিরে এলাম হোস্টেলে হতাশা এবং আশার মিশ্র এক অনুভূতি নিয়ে।

ইতিমধ্যে খবরের কাগজে সোভিয়েত ইউনিয়নে উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৫টি স্কলারশিপের কথা ঘোষণা করেছে। বন্ধুদের অনেকে আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। আমি দিইনি। তার কারণ পরিষ্কার। সরকার আওয়ামী লীগের। আমি বামপন্থী রাজনীতি করি। ফলে অবধারিত ভাগ্য জেনে আবেদন করার তাড়না অনুভব করিনি। আমার এক রুমমেট আশরাফ ভাই। তিনি অবশ্য নাছোড়বান্দা। বললেন, 'তোমার কিছুই করতে হবে না। শুধু এই ফর্মে নাম

স্বাক্ষরটা করো। বাকিটা আমরা করে নেব। রুমের সবাই দরখাস্ত করছে। তুমি করবে না কেন।' যুক্তিটি গ্রহণ না করে পারলাম না। তা ছাড়া সোভিয়েত দেশ দেখা বা সেখানে পড়াশোনা করার সুযোগ আমার কাছে ছিল যথেষ্ট আকর্ষণীয়। সে সঙ্গে আরও ছিল অর্থ সমস্যা। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ভালো করায় সরকার মাসিক ১২০ টাকা বৃত্তি দিয়েছিল দুই বছরের জন্য। প্রথম পাঁচ মাসেই দেখি ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট শূন্য। এই কয় মাসে বৃত্তির সব টাকা খরচ করে ফেলেছি। এদিকে লেখাপড়ার অবস্থাও নয়ছয়। তিন মাস হয়ে গেছে ক্লাস শুরু হয়েছে। একদিন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে ঢুকেই বের হয়ে এলাম। দেখি প্রফেসর ব্ল্যাকবোর্ডে কী সব সংকেত ব্যবহার করে লিখে চলেছেন যার সবটুকুই আমার কাছে দুর্বোধ্য। সে এক দুঃস্বপ্নের মতো আমার অবচেতন মনে স্থান করে নিয়েছিল। আজও অনেক সময় স্বপ্নে দেখি আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরীক্ষা দিইনি। আমাকে পুনরায় পরীক্ষা দিতে হবে। অনেকটা বাধ্য হয়েই দরখাস্ত করার সম্মতি দিতে হলো। এরই মধ্যে তিন মাস কেটে গেল। দরখাস্তের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন দেখি সেক্রেটারিয়েট থেকে একজন পিয়ন আমাকে খুঁজছে। হাতে সরকারি ছাপসহ সিলগালা করা একটি চিঠি। পিয়ন বলল, স্যার সুখবর আছে। খামটি খুলে দেখি সেখানে মস্কোতে আমার স্কলারশিপের খবর।

১০ আগস্ট ১৯৭২ সাল। তেজগাঁও বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে আছে এরোফ্লোটের ইলুশিন ১৮ বিমান। বুয়েটের হোস্টেল থেকে এয়ারপোর্টে এলাম বোনের সঙ্গে। আমাকে বিদায় দিতে এসেছে বুয়েটের আরও কয়েক বন্ধু। লালচে রঙের একটি স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়েছি। সেখানে আমার কিছু কাপড়চোপড়। কয়েকটি বই। মায়ের দেওয়া একটি কাঁথা। মা-বাবা কেউ আসেননি বিদায় দিতে। জানি স্বাধীনতাযুদ্ধের পর রাস্তাঘাটের অবস্থা করুণ। মনে আছে যশোরে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আমাকে আটবার ফেরি পার হতে হয়েছিল। সকালে রওনা দিয়ে সন্ধ্যারাতে পৌঁছেছিলাম যশোর শহরে। ইতিমধ্যে দুই প্রপেলার বিকট শব্দ করে উঠল। ঘড়িতে বাজে সকাল ৯টা ৩০ মিনিট। আমাদের প্লেন উড়ল আকাশে। প্রথমে করাচি, তারপর তাসখন্দ। সেখানে সাময়িক যাত্রাবিরতি। ভোররাতে পৌঁছালাম মস্কোর সেরেমেটিয়েভ বিমানবন্দরে। ১৮ ঘণ্টা বিমানভ্রমণের ক্লান্তি সারা দেহে লেগে আছে। একেবারে নুয়ে পড়ছে দেহ। বিমানবন্দরে রাখা একটি বেঞ্চে গা এলিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। জেগে উঠলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তার ডাকে। দুঃখ প্রকাশ করলেন বিলম্বের জন্য। বললেন, 'চলো। মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছি তোমাদের নিতে।' আমার সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে আরও ছয়জন শিক্ষার্থী। তারাও পড়তে এসেছে মস্কোতে। বাসে উঠলাম। বাস চলছে দ্রুতগতিতে। চারপাশে কল্পনার সেই জগৎ মূর্ত হয়ে উঠছে একের পর

এক। যে দেশকে স্বপ্নে ভেবেছি সে দেশ এখন চোখের সামনে ধরা দিচ্ছে তার দিগন্ত উন্মোচিত করে।

মিকলুকো মাকলায়া স্ট্রিট। মস্কোর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল। সেখানেই মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়। গোটা এলাকাজুড়ে ৮টি হোস্টেল। প্রতিটি পাঁচতলা করে। ৩ নম্বর হোস্টেলের চারতলা নিয়ে তৈরি হয়েছে সাময়িক কোয়ারেন্টাইন। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এসে পৌঁছালাম সেখানে। এখানে থাকতে হবে এক সপ্তাহ। নানা ধরনের মেডিকেল চেকআপ হবে। তারপর পাওয়া যাবে বাইরে যাওয়ার অনুমতি। সন্ধ্যা হয়ে এল। দিনের কাজ শেষ করে সবাই যার যার গৃহে ফিরে গেছে। চারদিক নিশ্চুপ। মস্কোতে আমার প্রথম রাত। চোখে ঘুম নেই। কাচের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি। দেখি টকটকে লাল তারা জ্বলছে ক্রেমলিন টাওয়ারে। পাশে বাঙালি কে একজন বলল, 'ওটা জানো কী? ওটা হচ্ছে কেজিবির কেন্দ্রীয় ভবন।' সেখান থেকে জ্বলছে ওই আলো। ওই আলো এমনি সেমনি আলো নয়। গোয়েন্দা কাজে লাগে।' মস্কোর ক্রেমলিন সম্পর্কে আমার জ্ঞান সীমিত। অগত্যা তার দাবিকে স্বীকার করে নিতে হলো। সেটি যে ভ্রান্ত তা কেবল উদ্ধার হলো এক সপ্তাহ পর। ওই তারার ধারণাটি কিন্তু বহুদিন ধরে আমার কল্পনায় টিকে ছিল। পরে জেনেছি সেটি ছিল ক্রেমলিনের স্পাস্কায়া টাওয়ার, যার মাথায় রয়েছে রুবি পাথরের জ্বলজ্বল করা ওই তারাটি। ১৯৩৭ সালে তারাটি বসানো হয়েছিল টাওয়ারের ওপর।

দেখতে দেখতে কেটে গেল এক সপ্তাহ। নানা ধরনের মেডিকেল চেকআপ হলো। সাদাপোশাকে সোভিয়েত ডাক্তার এবং নার্স নানান সব পরীক্ষা করল। দেখল শরীর স্বাস্থ্য ঠিক আছে কি না। অবশেষে কোয়ারেন্টাইনের বাধাধরা জীবন থেকে মুক্তি পেলাম। দেখি হোস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পাকিস্তান থেকে পড়তে আসা কয়েকজন ছেলেমেয়ে। তারা এসেছে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে। তাদের নেতা শাহেদ ভাই। ভারত থেকে এসেছে দুই মেয়ে—সুনিতা ও রোশনি। দুজনের বাড়ি ভারতের উজ্জয়ন শহরে। তাদের বাবা সেখানকার উঁচু দরের রাজনৈতিক নেতা। উজ্জয়ন দিল্লি থেকে বেশি দূরে নয়। ২০১২ সালে সেখানে গিয়েছিলাম বেড়াতে। আমার বন্ধু বদরুল হাসান ও তার স্ত্রী উমার সঙ্গে দেখা করতে। তারা বলল, রোশনি মারা গেছে বেশ কিছুদিন আগে। দুঃখে বুক ফেটে গেল। মস্কোতে যখন আমি অসহায় তখন তার কৃপায় সিক্ত হয়েছি। আমাকে রান্না করে খাইয়েছে বহুবার। প্রবাসজীবনের প্রাথমিক অসহায়ত্বকে অতিক্রম করার মানসিক শক্তি জুগিয়েছে। অথচ আজ সে নেই। যাই হোক, হোস্টেল থেকে বের হতেই শাহেদ ভাই বললেন, 'চলো আজ মস্কো শহর দেখব। সেখানে ক্রেমলিন, লেনিনের মোসোলিয়াম। আছে আরও কত কিছু দেখার। মিকলুখো মাকলায়া

মেট্রো স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে প্রসপেক্ট ভিরনাদস্কি, লেনিন পাহাড়, ফ্রুঞ্জে, পার্ক কুলতুরি স্টেশন পার হয়ে অবশেষে পৌঁছালাম সেন্ট্রাল স্টেশনে। ট্রেনের ভাড়া মাত্র ৫ কোপেক। মেট্রোরেলের সেবা দেখে তো আমি অবাক। প্রতিটি স্টেশন যেন এক-একটি শিল্পকর্ম। ফ্রেস্কোতে ভরা। ভাবলাম, এই না হলে সমাজতন্ত্র। বুক দুরু দুরু করছে। অবশেষে ক্রেমলিন দেখব, দেখব অক্টোবর বিপ্লবের নেতা লেনিনের মৃতদেহ। দেখব সোভিয়েত ক্ষমতার কেন্দ্রকে।

স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা হাঁটাপথ। পথটি একটু পাহাড়ি। হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল কল্পনার সেই রেড স্কয়ার, যার ছবি দেখেছি কতবার কতভাবে। ছোট ছোট লাল ইট দিয়ে মোড়ানো প্রশস্ত খোলামেলা জায়গা। সামনে ক্রেমলিনে ঢোকার বিশাল গেট। মাঝেমধ্যে দেখি কালো রঙের লিমোজিন দ্রুতগতিতে ক্রেমলিনের ভেতর ঢুকছে, আবার বের হচ্ছে। ক্রেমলিনের উঁচু প্রাচীরটির পাশে রয়েছে সবুজ গাছের মেলা। দেয়ালের ধার ঘেঁষে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের কবর। স্তালিন, ডেরজিন্সকি, কালিনিনসহ আরও অনেকের। আরও আছে ইউরি গ্যাগারিন, জেনারেল জুকভ, আমেরিকান সাংবাদিক জন রিড, যিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন অক্টোবর বিপ্লবের ওপর *টেন ডেজ দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্ল্ড* বইটি লিখে। ক্রেমলিনের দেয়ালের ঠিক মাঝখানে আশ্রয় নিয়ে আছে লেনিনের মোসোলিয়াম। গাঢ় লাল মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি তার চার দেয়াল। গেটের সামনে বন্দুকধারী দুই প্রহরী দাঁড়িয়ে আছেন পাথরের মূর্তির মতো। বোঝার উপায় নেই তারা জীবন্ত মানুষ। প্রতি ঘণ্টা অন্তর বদল হচ্ছে প্রহরী। দেখার মতো এক দৃশ্য বটে। সবকিছু দেখছি আর অভিভূত হচ্ছি। মনের মধ্যে সুকান্ত ভট্টাচার্যের সেই কবিতার লাইন—'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন।' মোসোলিয়ামের সামনে মানুষের লাইন। সেই লাইনে আমাদেরও দাঁড়াতে হলো। এবার এল ঢোকার পালা। ঢুকেই দেখি শায়িত অবস্থায় আছে একটি দেহ। মুখমণ্ডল ঠিক ঠিক মিলে যায় লেনিনের সঙ্গে। পরিধানে কালো স্যুট। দেহটিকে ঘিরে রয়েছে শক্তিশালী আলোর ফোয়ারা। তাতে করে দেহটি দেখায় অনেক বেশি উজ্জ্বল। লেনিনের দেহের বাঁ পাশ দিয়ে অতি ধীরে হেঁটে যাওয়ার নির্দেশ পেলাম। লেনিনের মাথার কাছে এসে ভাবলাম আর একবার ভালো করে দেখে নিই। কিন্তু দণ্ডায়মান কর্মকর্তার কণ্ঠ থেকে এল দ্রুত স্থান ত্যাগের নির্দেশ।

অনেকে বলেন রুশ বিপ্লব কোনো বিপ্লব ছিল না। ছিল একটি অভ্যুত্থান মাত্র। তাদের ভাষায় লেনিন ষড়যন্ত্র করে রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিলেন। এসব অভিযোগ কিন্তু আমি কখনো সঠিক বলে মনে করিনি। বিপ্লব হঠাৎ করে কোথাও ঘটে না। তাকে প্রস্তুত করতে হয়। বিপ্লবের সব পূবশর্ত রাশিয়ায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল বেশ আগে থেকে। আগে বলতে বেশ পেছনে যেতে পারি। ১৭৭৩

সালের কথা। পুগাচভ নামের একজন আর্মি লেফটেন্যান্ট কৃষকদের অধিকার নিয়ে জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সেই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও রাশিয়ার জনগণের মনে পুগাচভ সম্মান পেয়েছিল বীর হিসেবে। জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরও হয়েছে। তার মধ্যে ১৮২৫ সালের সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ অন্যতম। ওই বছর ডিসেম্বর মাসে বেশ কিছু অফিসার জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ইতিহাসে একে ডিসেম্বরিস্টদের আন্দোলন বলা হয়। সে বিদ্রোহও ব্যর্থ হয়েছিল। বেশ কয়েকজন অফিসারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও জারের বিরুদ্ধে আন্দোলন থেমে থাকেনি। তবে সব বিদ্রোহের মধ্যে ১৯০৫ সালে যা ঘটেছিল, সেটি ছিল সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। লেনিন তাকে বলেছিলেন ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের ড্রেস রিহার্সেল। ১৯০৫ সালে শ্রমিকেরা জারের প্রাসাদের দিকে মিছিল করে যাচ্ছিলেন রুটির দাবি নিয়ে। রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার অর্থনীতি ভালো যাচ্ছিল না। নানা কারণে মানুষ কাটাচ্ছিল দুর্বিষহ জীবন। কৃষক শ্রেণির জীবনও ছিল নানাভাবে নিগৃহীত এবং দারিদ্র্যে ভরা। হঠাৎ সেই শান্তিপূর্ণ মিছিলে সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করল। বহু শ্রমিকের মৃত্যু হলো। ১৯০৫ সালের ওই ঘটনার পর রাশিয়ার জার বাধ্য হয়ে হাতে নিলেন কিছু সংস্কারকাজ। কিন্তু সেগুলো যথেষ্ট ছিল না। অসন্তোষের মূল কারণগুলো ঠিকই থেকে গেল রাশিয়ায়।

প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শুরু হলো ওই অসন্তোষ তখন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। জার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক। সাধারণ জনগণ যুদ্ধের বিপক্ষে। যুদ্ধের কারণে লোকালয় ধ্বংস হচ্ছে। শস্যের খেত আগুনে পুড়ে কৃষি উপযোগিতা হারাচ্ছে। মানুষ না খেয়ে মরছে। কৃষিতে বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠছে নানা কারণে। জমির ওপর কৃষকের কোনো অধিকার নেই। রাজতন্ত্রের আশপাশ ঘিরে যে শক্তিশালী অভিজাত শ্রেণি গড়ে উঠেছে, তাদের হাতে রয়েছে অধিকাংশ উর্বর জমির মালিকানা। শ্রমিক শ্রেণি সংখ্যায় যে খুব বড়, তা নয়। কিন্তু সেন্ট পিটার্সবার্গ এবং মস্কোর মতো বড় শহরগুলোতে তাঁদের লক্ষণীয় উপস্থিতি এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। তারাও যুদ্ধের বিরুদ্ধে। বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রের। সেনাবাহিনীর জওয়ানরা যুদ্ধে ক্লান্ত। তাঁরাও ঘরে ফিরতে চায়। অথচ যুদ্ধ শেষ করার কোনো তাগিদ জার অনুভব করেননি। পরিবেশটি এমন হয়ে উঠেছিল যে বিপ্লব বা বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ বেশ অবশ্যম্ভাবী বলেই মনে হচ্ছিল। ঘটল ঠিক তা-ই। জার বেরিয়েছিলেন ট্রেনভ্রমণে। তাঁর ট্রেনকে গন্তব্যস্থানে না পাঠিয়ে রেলশ্রমিকেরা ট্রেনটিকে পাঠালেন অন্য পথে। ট্রেন এসে পৌঁছাল এমন এক প্রত্যন্ত জায়গায় যেখান থেকে ফেরার পথ নেই। ক্ষমতা থেকে জার অপসারিত হলো। ক্ষমতায় এল অন্তর্বর্তীকালীন এক সরকার। সেই সরকার গঠিত হয়েছিল রাশিয়ার ডুমা বা পার্লামেন্টের সদস্যদের নিয়ে। পাঁচমিশালি সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে গড়া ওই সরকারের প্রধান

হলেন কেরেন্সকি। কাজান শহরের যে স্কুলে লেনিন পড়তেন, কেরেন্সকির বাবা ছিলেন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। লেনিনের মতাদর্শে বিশ্বাসী কেউ ওই সরকারে ছিলেন না। কিন্তু লেনিন ওই সরকারের দুর্বলতা ভালোভাবেই বুঝেছিলেন এবং সেটি উন্মোচিত করেছিলেন অত্যন্ত নিপুণ হাতে।

'এপ্রিল থিসিস' নামে লেনিন যে লেখাটি লিখেছিলেন, সেটি বিপ্লবের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেখানেই তিনি বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। থিসিসটি আমি পড়েছি মস্কোতে ছাত্র থাকা অবস্থায়। সেখানে ১০টি নির্দেশনামা ছিল। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে তিনি বুর্জোয়া সরকার হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক থেকে দূরে থাকার। লেনিনের মূল কথা ছিল প্রথম মহাযুদ্ধ বন্ধ করতে হবে যেকোনো মূল্যে। জমি কৃষকদের হাতে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। খাদ্য (রুটি) সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করে সমগ্র ইউরোপে পুঁজিবাদের সংকটকে তীব্র ও গভীর করতে হবে। সেভাবেই তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন বিশ্ব প্রলেতারিয়াত বিপ্লবের। যে অন্তর্বর্তী সরকার বহাল ছিল, সে সরকার অবশ্য রাশিয়ার মানুষের মন বোঝেনি। সরকার জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল রাখল। যুদ্ধকে দেশপ্রেমিক দায়িত্ব বলে ঘোষণা করল। এতে করে মানুষের দুর্দশা বাড়ল। যুদ্ধ আনল আরও ধ্বংস। উদ্ভূত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে লেনিন ভুল করলেন না। থিসিসে তিনি আরও বললেন, রাশিয়ায় যেটি ঘটছে সেটি বিপ্লবের প্রথম ধাপ। পরের ধাপে বুর্জোয়ার হাত থেকে ক্ষমতা নিতে হবে। ক্ষমতা দিতে হবে শ্রমিক ও কৃষকের হাতে। তার নির্দেশ হলো রাশিয়ায় কোনো পার্লামেন্টারি রিপাবলিকের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন সোভিয়েত রিপাবলিকের, যেখানে ক্ষমতা থাকবে সোভিয়েত প্রতিনিধিদের হাতে। ভূমি সংস্কারের কথা ছিল তাঁর ৬ নম্বর থিসিসে। ব্যাংক জাতীয়করণ এবং একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক গড়ে তোলারও নির্দেশ ছিল, যার দায়িত্বে থাকবে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি। সবশেষে ছিল একটি সতকর্বাণী। তিনি বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বলশেভিকদের আশু দায়িত্ব নয়। প্রথমে নিশ্চিত করতে হবে উৎপাদন এবং পণ্য বিতরণের ওপর শ্রমিক ডেপুটিদের নিয়ন্ত্রণ। তারপরই ভাবতে হবে সমাজতন্ত্রের কথা।

অক্টোবর বিপ্লব এবং লেনিন আমাদের মনে প্রায় সমার্থক হয়ে আছেন। এই অর্থে না যে বিপ্লব তাঁর হাতে সফল হয়েছিল। লেনিন ছিলেন রাজনৈতিক দূরদর্শী একজন মানুষ। সেই সঙ্গে তাঁর ছিল আন্দোলন পরিচালনার বুদ্ধিদীপ্ত ক্ষমতা। সেটি কেবল বিপ্লবের বাস্তব দিককে ঘিরে না। তাঁর প্রতিভা কেবল মানুষের মন বুঝে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যেসীমিত ছিল না; আরও ছিল তাত্ত্বিক দিক থেকে রাশিয়াকে সঠিক বিশ্লেষণের ক্ষমতা। বিপ্লবের আদর্শগত প্রস্তুতি তিনি শুরু

করেছিলেন বহু আগে। বস্তুত ১৮৯৩ সাল থেকে। ওই সময় তিনি লিখেছিলেন রাশিয়ার কৃষকদের দুর্দশার কথা। ভূমির ওপর কুলাক শ্রেণির আধিপত্যের বিরুদ্ধে রাগান্বিত বাক্যালাপ করেছেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে। ১৮৯৪ সালে তাঁর লেখার বিষয়বস্তুতে স্থান পেয়েছিল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের অন্তর্দ্বন্দ্ব। 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশে' (১৮৯৯ সাল) সংখ্যাগত তথ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন কীভাবে পুঁজিবাদের সম্ভাবনাগুলো অঙ্কুরিত হচ্ছে রাশিয়ার মাটিতে। 'কী করিতে হইবে' (১৯০২) লেখায় পার্টির উদ্দেশ্য এবং কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের নামটি তিনি নিয়েছিলেন চেরনশেভস্কি নামের রুশ সাহিত্যিকের একই নামে লেখা উপন্যাস থেকে। 'এক পা আগে দুই পা পেছনে' (১৯০৪), 'সামাজিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের দুটি কৌশল' (১৯০৪) ছিল পার্টির তাত্ত্বিক ও বাস্তব কৌশলগত দিকগুলোকে আরও ধারাল করে উপস্থাপন করা। দর্শনের ওপর সমালোচনাধর্মী লেখাগুলো আমাকে পড়তে হয়েছিল ছাত্র থাকা অবস্থায়। 'বস্তুবাদ এবং এম্পিরিও ক্রিটিসিজমে' (১৯০৯) তৎকালীন দার্শনিক মাখকে তিনি দ্বিধাহীনভাবে সমালোচনা করেছিলেন। 'সাম্রাজ্যবাদ: পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ ধাপ' (১৯১৬), 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' (১৯১৭) ছিল অক্টোবর বিপ্লবের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ শহর থেকে লেনিনের পেত্রোগ্রাদ শহরে ফিরে আসা। ওই শহরে তিনি বেশ কিছু সময় রাজনৈতিক নির্বাসনে কাটিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে রাশিয়ায় চলেছে বিপুল পরিবর্তন। জারকে হটানো গেছে। ক্ষমতা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের হাতে। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অকর্মণ্য। রাজনৈতিক শূন্যতা, নেতৃত্বের অভাব, প্রথম মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, কৃষক শ্রেণির পর্যুদস্ত অবস্থা—সব মিলিয়ে বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আকাশে-বাতাসে। মার্চের ৩০ তারিখে লেনিন জুরিখ থেকে ট্রেনে চাপলেন। সঙ্গে ২৬ জন সহকর্মী। রওনা হলেন সেন্ট পিটার্সবার্গের উদ্দেশে। প্রথমে এসে পৌঁছালেন সুইডেনে। সেখান থেকে ফেরি। তারপর ট্রেন। অবশেষে ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকি। হেলসিংকি পৌঁছে শঙ্কায় ভরে উঠল লেনিনের মন। কোনোভাবে তাঁকে কেউ প্রতারিত করছে কি না। গ্রেপ্তারের ভয় ছিল। কিন্তু সব সংশয় কাটিয়ে তিনি পৌঁছালেন জারের রাজধানী সেন্ট পিটার্সবার্গে ১৭ দিন পর। ফিনল্যান্ড রেলস্টেশন। লেনিনের ট্রেন এসে পৌঁছাল অনেক দেরিতে। ট্রেনভ্রমণের সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল জার্মান সরকার। তাদের ধারণা ছিল এই ব্যক্তিটি রাশিয়াকে বাধ্য করতে পারে যুদ্ধ বন্ধে। জার্মানির সঙ্গে অসম চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হলে রাশিয়া দুর্বল হয়ে পড়বে। জার্মানির বিজয় হবে নিশ্চিত। এ কারণে লেনিনকে অনেকে জার্মানির গুপ্তচর হিসেবে সে সময় প্রচার করেছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তারেরও

আদেশ ছিল। এপ্রিলের ১৬ তারিখের কথা। ফিনল্যান্ড স্টেশনে লেনিনকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন মস্কো সোভিয়েতের সদস্যরা। স্টেশনের যে ঘরটি নির্দিষ্ট ছিল জারের বিশ্রামাগার হিসেবে, সেটি ইতিমধ্যে শ্রমিকদের দখলে। ঘরে ঢুকে লেনিন দেখলেন অগণিত শ্রমিক তার আগমন অপেক্ষায় সেখানে সমবেত হয়েছে। মস্কো সোভিয়েতের প্রতিনিধি ছিলেন একজন মেনশেভিক। লেনিনের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। কিন্তু তিনি সাদর অভিনন্দন জানালেন লেনিনকে। বললেন, 'কমরেড লেনিন, আমরা আপনাকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের প্রধান কাজ বিপ্লবকে রক্ষা করা ভেতর ও বাইরের শত্রু থেকে।' লেনিন উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'প্রিয় কমরেড, সৈনিক, নাবিক এবং শ্রমিক ভাইয়েরা। আমি আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আপনারা বিপ্লবকে জয়যুক্ত করেছেন। আপনারা বিশ্ব প্রলেতারিয়াত বাহিনীর সবচেয়ে অগ্রসর বাহিনী। সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের পরিচালিত যুদ্ধ ইউরোপে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বালাবে। উদয় হবে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূর্য। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের পতন আজ অবশ্যম্ভাবী।'

স্টেশনের বিশ্রামঘর থেকে বেরিয়ে লেনিন মুখোমুখি হলেন বিশাল জনতার। অপেক্ষমাণ জনতার উদ্দেশে কিছু বলতেই হয়। মোটর গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে তিনি জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, সেই ভাষণই বদলে দিয়েছিল বিশ্বরাজনীতিকে। লেনিন বড় মাপের কোনো তাত্ত্বিক ছিলেন না। ট্রটস্কি বা অন্যদের মতো মার্ক্সীয় তত্ত্বের বিশুদ্ধতা নিয়ে তিনি নিজেকে ব্যস্ত রাখেননি। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল বিপ্লব এবং বিপ্লব। রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে তিনি কখনো নরম ভাষায় সমালোচনা করেননি। তাঁর যুক্তি ও আক্রমণ ছিল তীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার। তর্ক-বিতর্কের মূল বিষয় ছিল বিপ্লবকেন্দ্রিক। তত্ত্ব নিয়ে নয়; মানুষ বিপ্লব চায়, সেটি তিনি ভালো করেই উপলব্ধি করেছিলেন। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় বিপ্লবের ধারণাটি তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। তাঁর ভাই আলেকজান্ডার জারের হত্যা ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। পরে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। সেটি লেনিনের মনে প্রচণ্ড দাগ কেটেছিল। বিপ্লবের এক শ বছর পর লেনিনের কথা ভাবি। আরও অনেক ভাবনা মনে আসে। ভাবি সে সময়কার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যদি জার্মানির সঙ্গে শান্তিচুক্তি করত, যদি কৃষকের হাতে জমি বিতরণের প্রতি দৃঢ় ভূমিকা নিত, তাহলে লেনিনের পক্ষে কি ওই সরকারকে অপসারণ করা সম্ভব হতো? সে ক্ষেত্রে কি রাশিয়ার ভাগ্য বদলে যেত না? হয়তোবা বিপ্লব এড়িয়ে রাশিয়া অনুসরণ করত পশ্চিমা বিশ্বের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। জানি, ইতিহাস আকস্মিকতায় ভরা। সবকিছু নিয়মমাফিক চলে না। উত্থান-পতনে ভরা মানুষের ইতিহাস। সে কারণে যা ঘটে গেল, সেটিই মেনে নিতে হলো রাশিয়ার মানুষকে।

দুই

পয়লা সেপ্টেম্বর দেখতে দেখতে এসে গেল। ১৯৭২ সাল। রাশিয়ায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ভিন্ন ধাঁচের। তারা আমাদের মতো পয়লা জানুয়ারি থেকে শিক্ষাবর্ষ শুরু করে না। সেখানে পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস। আমার হোস্টেল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস একেবারে নিকটে। যাওয়ার পথে রয়েছে কিছু দোকানপাট। দোকানগুলো থেকে আমি কিনি রুটি, দুধ, মাখন, ডিম বা মুরগি। সোভিয়েত সমাজে পণ্যসম্ভারের দিক থেকে দীনতা সুস্পষ্ট। দোকানগুলোতে নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া যায় কিছু পণ্য। বাদ বাকি সময়ে পণ্যের ভান্ডার খালি। এটি আমার কাছে খুবই অবাক লাগত। আমাদের হোস্টেল থেকে বেশ কিছু দূরে ছিল একটি কাঁচাবাজার। ঘরে উৎপাদিত অল্পস্বল্প শাকসবজি অথবা ফলের আচারজাতীয় পণ্য নিয়ে দেখতাম কোনো বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা বসে আছে। কিন্তু সেসব পণ্যের মূল্য ছিল আমাদের শিক্ষার্থীদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ভাবলাম, বিশাল সোভিয়েত অর্থনীতিতে ব্যক্তি-উদ্যোগ কত ক্ষুদ্র মাপের। মস্কো শহরের একেবারে কেন্দ্রে কেনাকাটা করতে গিয়েছি অনেকবার। সেখানেও লক্ষ করেছি বৈচিত্র্যের দর্শনীয় অভাব। বহু দ্রব্য দোকানে ঝুলছে ঠিকই কিন্তু গুণগত মান ক্রেতাদের মন কাড়তে ব্যর্থ হচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণ, চাহিদার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের দিকটি নিয়ে এখানে কেউ ভেবেছে বলে মনে হয় না। ভাবলেও সেটি বাস্তবে রূপায়ণ হয়নি। পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের চাহিদা তৈরি হয় কখনো কৃত্রিমভাবে, কখনো সত্যিকার চাহিদার কথা ভেবে। সেই চাহিদা পূরণ করে পুঁজি। এখানে সবকিছু জনগণের মালিকানা। কথাটি আমি অবশ্য সোজাভাবে দেখিনি। কাগজ-কলমে মালিকানা নিশ্চিত হলেও প্রকৃত মালিক হচ্ছে পার্টি। গোটা পার্টি না। ক্ষুদ্রসংখ্যক একটি এলিট গ্রুপ। তাদের দায়িত্বে আছে কলকারখানা বা যৌথ খামারের পরিচালনার ভার। সে কারণে তাদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা। ক্ষমতা আরও আছে আমলাতন্ত্রের হাতে। তাদের জীবন শুনেছি খারাপ না। ডিনারের টেবিলে ক্যাভিয়ার সালমন বা আরও দামি খাবারের ঘাটতি নেই। অথচ তাদের বিপরীতে সাধারণ মানুষ যারা সম্পদের আসল মালিক বলে রাজনৈতিক ইশতেহারে উল্লেখ আছে, তারা জীবন কাটায় স্বল্প গুণমানের খাদ্যদ্রব্য বা পরিধানের বস্ত্র নিয়ে। সমাজতন্ত্রের এই দুর্বলতার দিকটি এখানকার টেলিভিশনে তুলে ধরতে দেখেছি, যদিও খুব সূক্ষ্মভাবে। ফলে প্রায়ই মনে হয়েছে, সমাজতন্ত্রের কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং যদি মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে ব্যর্থ হয় তাহলে বিকল্প কোনো দোমিশালি ব্যবস্থা নিয়ে ভাবা হলো না কেন? পণ্যের ঘাটতি বা ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনের প্রতি অবহেলার কোনো সমাধান বের করা হলো না কেন? আইনস্টাইন তাঁর লেখায় বলেছিলেন, পার্টি আর আমলাতন্ত্র যদি একচ্ছত্র

ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহলে জনগণের জন্য সেটি কোনো সুখবর নয়। কথাটি যে কত সত্য, সেটি সোভিয়েত অভিজ্ঞতা থেকে দেখি।

যা-ই হোক, শুরু হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে রুশ ভাষা শেখার ক্লাস। আমাদের ক্লাসটি একতলায়। ঢুকে দেখি ক্লাসভর্তি নানা দেশের ছাত্রছাত্রী চেয়ারে আসন নিয়ে বসে আছে। ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা থেকে আসা সব ছাত্রছাত্রী। সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থায় লেখাপড়া কেমন হবে, তা নিয়ে আমার মনে শঙ্কা ছিল। ক্লাসে গিয়ে বসলাম। একটু পর ক্লাসে ঢুকলেন আমাদের শিক্ষিকা। শুরু হলো শিক্ষাদান। দেখি তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন একটি ক্যাসেট প্লেয়ার। ক্লাস শুরু করলেন রুশ ভাষায় গাওয়া একটি গান দিয়ে। গানটি রাশিয়ার সবচেয়ে বড় নদী ভল্গাকে নিয়ে। গানের কথাগুলো এখনো মনে বাজে। রুশ ভাষা থেকে ভাষান্তর করলে গানটি শোনায় এ রকম : 'হে আমার ভল্গা! কোন সুদূর অজানা দেশ থেকে তুমি বয়ে চলেছ আবহমানকাল ধরে। ভল্গা, তোমার শেষ কোথায় জানি না। গমখেতের সোনালি রং, বরফঢাকা দিগন্তের শুভ্রতার ধার ঘেঁষে তুমি বয়ে চলেছ কতকাল ধরে। অথচ আমার বয়স মাত্র সতেরো। মা বলেছিল, পুত্র, এমন তো হতে পারে, ঘরে ফেরার পথে রাস্তার ক্লান্তি তোমাকে দুর্বল করবে। তখন তুমি ভাসিয়ে দিয়ো তোমার দেহ ওই ভল্গা নদীর জলে। বিধৌত হয়ে পুনরায় জেগে উঠবে পূর্ণ শক্তি নিয়ে...'। গানের কথাগুলো স্বদেশপ্রেমে ভরা। শুনলে এখনো কেন জানি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। ভেবেছিলাম ক্লাস শুরু হবে লেনিন বা মার্ক্সের কোনো বিপ্লবী উদ্ধৃতি দিয়ে। সমাজতন্ত্রের কথা দিয়ে। সমাজতন্ত্রের কোনো নামকরা কবির কথা দিয়ে। কোনোটিই ঠিক হলো না। পরে ঠিক বুঝেছিলাম আমাদের শিক্ষক তাঁর ক্লাস কেন শুরু করেছিলেন ভল্গা নদী দিয়ে। রুশ জাতির দীর্ঘ ইতিহাস, যে বিশাল অঞ্চল নিয়ে রাশিয়ার ভূখণ্ড এবং যার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে এই ভল্গা, তার বুক ভরে আছে হাজার বছরের ইতিহাসে। যেসব উত্থান-পতন রাশিয়ার ভাগ্যে লেখা ছিল তার প্রতিটির সঙ্গে যুক্ত এই ভল্গা নদীর স্রোতোধারা। এই নদী অবলোকন করেছে নানা উত্থান-পতন। উত্তরের শ্বেত সমুদ্র ('হোয়াইট সি') এবং বাল্টিক সাগর থেকে বেরিয়ে ভল্গা পড়েছে কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরে। তার কোনো এক পারে রয়েছে রুশ বিপ্লবের নেতা লেনিনের জন্মস্থান কাজান শহর। আরও রয়েছে ইতিহাস বিখ্যাত নগরী ভল্গাগ্রাদ। ১৯৩৩ সালে স্তালিন ভল্গা নদীর সঙ্গে মস্কো শহরের ক্ষুদ্র নদী মস্কোভাকে সংযুক্ত করেছিলেন জলের সংস্থান করতে। তাতে করে রাজধানী মস্কোর গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল। অন্যথায় মস্কো হয়তো বিচ্ছিন্ন থাকত রাশিয়ার বাকি অঞ্চল থেকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে গেল হঠাৎ করে। সেই ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন, মানব ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল এই ভল্গা নদীর

তীরে। সে এক জীবনমরণ যুদ্ধ, যে যুদ্ধ নির্ধারণ করবে কে জয়ী হবে, কে হবে পরাজিত। ১৯৪২ সালের জুন মাস থেকে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ মাত্র আট মাসের ব্যবধানে ২০ লাখ রুশ ও জার্মান জীবন হারিয়েছিল এই শহরের ওপর দখল প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে। হিটলারের জার্মান বাহিনী ভল্গা নদী দখলে জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছিল কেন, তার কারণ জানি। লক্ষ্য ছিল ককেশীয় অঞ্চলের তেলসমৃদ্ধ এলাকা তাদের দখলে আনতে। সোভিয়েতের লাল আর্মি এবং ভল্গাগ্রাদের মানুষ দাঁড়িয়েছিল তাদের পথ রোধ করে। ভল্গাগ্রাদ মাথা নত করেনি। অনেক ঐতিহাসিকের মতে সেই যুদ্ধই ঘুরিয়ে দিয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোড়। প্রমাণ করেছিল রাশিয়া কী করতে সক্ষম। সেই কালক্ষণ থেকে অনেক সময় কেটে গেছে। রুশ জাতি সেই বিষাদময় ইতিহাসের কথা ভোলেনি। এত বছর পর আজও যাঁরা এই নদীর ওপর দিয়ে জাহাজে ভ্রমণ করেন তাঁদের চোখে পড়ে এক বিশাল মূর্তি। মা রাশিয়ার মূর্তি 'মাতৃভূমি তোমাকে ডাকে'। মায়ের ডাকে উদ্বুদ্ধ হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী সে সময় সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। রক্ষা করেছিল মাতৃভূমিকে। মামায় কুর্বান নামক স্থানে নির্মিত এই মূর্তির দিকে তাকিয়ে রুশ মানুষ নিশ্চুপ হয়ে যায়। যুদ্ধের সময় এই শহর রক্তে স্নাত হয়েছিল। তার নোনতা স্বাদ এখনো হয়তো লেগে আছে ভল্গা নদীর জলে। ১৭ তলা সমান উঁচু এই মূর্তি আজও মানুষের কাছে বেদনা-দুঃখ এবং বিজয়ের প্রতীক হয়ে আছে। রুশ জাতির গৌরবময় বিজয়ের এই নিদর্শন আজও জানিয়ে দিচ্ছে রাশিয়ার শক্তিকে। এ জাতি মাথা নত করে না। ওই মূর্তি হয়তো বলছে, কেউ যদি ভুলক্রমেও রাশিয়াকে আক্রমণ করে তাহলে তার পরিণতি হবে ঠিক হিটলারের মতো।

দেখতে দেখতে প্রথম সেমিস্টার শেষ হয়ে এল। এখন দুই সপ্তাহের বিরতি। জানতে পেলাম বিশ্ববিদ্যালয় সাত দিনের শিক্ষাসফরের আয়োজন করেছে নবাগত শিক্ষার্থীদের জন্য। মস্কো থেকে তাদের নেওয়া হবে লেনিনগ্রাদ শহরে। রুশ বিপ্লবের শহর এই লেনিনগ্রাদ। শহরটি দেখার উত্তেজনা আমাকে গ্রাস করল। সব মিলিয়ে তিরিশ জন ছাত্রছাত্রী। ইতিমধ্যে শীতের আগমনবার্তা শুনতে পাচ্ছি। মস্কোতে বরফ পড়তে শুরু করেছে। গোটা শহর এখন বরফের হাতে জিম্মি। এ বরফ এখনো পেজা পেজা। সবাই বলছে এক সপ্তাহের মধ্যে পুরোদমে শীত নামবে। ভাবছি যাব আরও উত্তরের শহর লেনিনগ্রাদে। সেখানে বাল্টিক সাগরের হিমেল বাতাস। নিশ্চয় ঠান্ডা অনেক বেশি। শীতকে মোকাবিলা করার প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হয়। ছোট্ট একটি সুটকেস গুছিয়ে নিলাম। পুরু কোট, মাথায় পশমের টুপি, হাতে পুরু দস্তানা পরে এলাম লেনিনগ্রাদস্কি ভকজালে। ভকজাল রুশ শব্দ। অর্থ রেলস্টেশন। এখান থেকে সব ট্রেন যায় রাশিয়ার উত্তর-পশ্চিমে। ট্রেনের নাম ক্রাস্নায়া স্ত্রেলা। বাংলায় 'লাল তীর'। একটি কুপেতে চারজন করে যাত্রীর ব্যবস্থা।

রাত ১০টা ৩০ মিনিটে ট্রেন ছাড়ল। ট্রেনের কামরায় সবকিছু গুছিয়ে এবার একটু বসেছি। দেখি ট্রেনের মহিলা অ্যাটেনডেন্ট চা-বিস্কিট এবং দই নিয়ে হাজির। রুশ ভাষায় তাকে কীভাবে ধন্যবাদ জানাতে হয় সেটি অবশ্য শিখে নিয়েছি। ইতিমধ্যে ট্রেন গতি পেয়েছে। জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি ল্যাম্পপোস্টগুলো দ্রুত অপসারিত হচ্ছে আমার দৃষ্টি থেকে। মাঠ ও প্রান্তর সাদা বরফে আবৃত।

লেনিনগ্রাদকে নিয়ে ভাবছি। এই প্রথম দেখব বিপ্লবের সেই তীর্থস্থান। দেখব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শহরটি কী সাহস দেখিয়ে একটানা ৯০০ দিন জার্মান অবরোধের মধ্যে কাটিয়েছিল। মানুষ মরল। না খেয়ে কঙ্কাল হলো। আলো নেই। বোমার আঘাতে রাস্তাঘাটের জরাজীর্ণ অবস্থা। মানুষ মানুষের মাংস খেলো। না খেয়ে কাটাল দিনের পর দিন। শিশুসন্তানকে বিদায় দিল। তবুও দেশপ্রেম জয়ী হলো। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এক দিনের জন্য বন্ধ থাকল না। মাইনাস ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রায়ও জীবন থেমে থাকল না। খুব ভোরে দেখি আমাদের ট্রেন মস্কোভস্কি রেলস্টেশনে প্রবেশ করছে। অবশেষে আমরা এসে পৌঁছালাম লেনিনগ্রাদ শহরে। রেলস্টেশন থেকে হাঁটাপথে হোটেল। কিছুক্ষণ পর প্রাতরাশ। তারপর লেনিনগ্রাদ শহর ঘুরে দেখার পালা। প্রথম গন্তব্যস্থান নিভা নদীর কূলে নোঙর করা যুদ্ধজাহাজ 'অরোরা'। জাহাজটির নির্মাণ তারিখ ১৮৯৭ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে। ১৯০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাহাজটি অংশ নিয়েছিল। ১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবর এই জাহাজের কামান থেকে করা ফাঁকা গুলি ছিল বলশেভিক বিপ্লবের সংকেত। কামানের সেই সংকেত পেয়ে শ্রমিক ও পেত্রগ্রাদের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিপ্লবে। শীতকালীন প্রাসাদে সে সময় অবস্থান করছিল রাশিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। প্রাসাদ দখল করতে কোনো প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়নি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সব মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হলো। পতন হলো রাশিয়ার বুর্জোয়া সরকারের। এভাবে যুদ্ধজাহাজ অরোরা ইতিহাসে রেখে গেল বিশেষ অবদান। বলশেভিক বিপ্লবে তার এই অবদান লিপিবদ্ধ আছে ইতিহাসের পাতায়। সিনেমায় তাকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। জাহাজের ভেতরে ঢুকি। সবই ঝকঝকে পরিষ্কার। আমাদের গাইড বলল, কামানটি নাকি এখনো ঠিক তাক করে আছে শীতকালীন প্রাসাদের দিকে। অনেকে ইতিহাসের এই বর্ণনাকে সত্যি বলে গ্রহণ করেন না। তাঁদের ধারণায়, শ্রমিক ও সৈনিকের বাহিনী ঠিক এভাবে দল বেঁধে অরোরার সঙ্গে সময়কে মিলিয়ে শীতকালীন প্রাসাদ আক্রমণ করেনি। যা-ই হোক, সেটি বড় কথা না। বড় কথা হলো আমার মন তখন চলে গেছে ১৯১৭ সালের সেই উত্তাল তরঙ্গে বাঁধা সময়ে।

পরের দিন লেনিনগ্রাদ শহর ঘুরে দেখার পালা। আমরা এলাম রাশিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় জার পিটারের মূর্তির কাছে। এই মূর্তিকে বলা হয়

মেদনি ভসাদনিক। তার অর্থ ধূসর ঘোড়সওয়ার। পিটার ছিলেন এক অদ্ভুত শাসক। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৬৭২ থেকে ১৭২৫ সাল পর্যন্ত। নেভা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল মূর্তিটি। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে নিয়ে ভাবি। ভাবি রুশ জাতির সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাঁর মতো অন্য কোনো জার অবদান রেখে গেছেন কি না। জারদের মধ্যে একমাত্র তিনিই গণমানুষের ক্রোধের সম্মুখীন হননি। রাশিয়াকে তিনি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করতে চেয়েছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন। রাশিয়ার অর্থনীতি ও প্রযুক্তিগত বিকাশ এবং জাহাজশিল্পের অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ হতে তিনি দ্বিধা করেননি। তাঁর হাতে ঘটেছিল রাশিয়ার সাংস্কৃতিক বিপ্লব। প্রাচীন রুশ জাতির নানা মূল্যবোধকে প্রতিস্থাপিত করে তিনি ইউরোপীয় রেনেসাঁ এবং এনলাইটেনমেন্ট যুগের ভাবধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাশিয়াকে দিয়েছিলেন বদলে। রুশ সেনাবাহিনীর পোশাক জার্মান সেনাবাহিনীর আদলে রাখতে দ্বিধা করেননি। সাধারণ মানুষের ঐতিহ্যবাহী রুশ পোশাকের বদলে ইউরোপীয় ধাঁচের পোশাক পরার আবেদন তার মধ্যে ছিল। যেসব স্বপ্ন তাঁর মনকে বেঁধে রেখেছিল সেগুলোর রূপায়ণে তিনি কুণ্ঠিত হননি। তিনি জানতেন রাশিয়ার কোনো সামুদ্রিক বন্দর নেই। দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর এবং কাস্পিয়ান সাগর অটোমানদের দখলে। উত্তরে বাল্টিক সাগর সুইডেনের প্রভাবে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে রয়েছে কেবল আরখাঙ্গেলস্ক দিয়ে হোয়াইট সাগরে ঢোকার সামান্য ব্যবস্থা। সেটি বুঝে তিনি শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলার কাজে মন দিয়েছিলেন। ১৬৯৮ সালে অটোমানদের পরাজিত করে তাগানরোগে একটি সামুদ্রিক ঘাঁটি এবং বন্দর গড়ে তুলেছিলেন। ছদ্মবেশ নিয়ে গিয়েছিলেন ইউরোপে। হল্যান্ডে পৌঁছে নৌবিদ্যাশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেছিলেন রাশিয়ার জন্য বৃহৎ আকারের জাহাজ নির্মাণের আশা নিয়ে। সেই বিদ্যা তিনি শিখেছিলেন ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহায়তায়। তাঁর সঙ্গে ছিল একদল বিশেষজ্ঞ। তাঁদের নিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। অক্সফোর্ড থেকে শুরু করে নানা জায়গায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করে তবেই ফিরেছিলেন দেশে। সেই জ্ঞান ব্যবহার করেছিলেন রাশিয়ার উন্নয়নের কাজে। ভাবি, একটি দেশকে গড়তে হলে এ ধরনের সুদূরপ্রসারী চিন্তাশীল নেতৃত্বের কত প্রয়োজন। সামন্ততান্ত্রিক রাশিয়াকে বদলে দিয়ে নতুন সমাজ গড়ার আকাঙ্ক্ষা হঠাৎ করে লেনিনের মাথায় আসেনি। পিটার দ্য গ্রেটের মতো ইতিহাসের অনেক ব্যক্তিত্ব সেখানে অবদান রেখে গেছেন কিছুটা হলেও।

এবার পেত্রোভরেস্তে যাওয়ার পালা। লেনিনগ্রাদ থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে। বাসে করে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। সেখানে জার পিটারের আমলের একটি প্রাসাদ রয়েছে। একে অনেকে বলেন পিটারগফ। প্রাসাদটিকে অনেকে

তুলনা করেন ফ্রান্সের ভার্সাই প্রাসাদের সঙ্গে। ফিনল্যান্ড উপসাগরের একেবারে পাশে তার অবস্থান। বতর্মানে ইউনেসকোর সংরক্ষিত একটি নিদর্শন। এই প্রাসাদ থেকে সমুদ্রে যাওয়ার একটি প্রশস্ত খাল খনন করা হয়েছিল। এখানে আছে অজস্র ফোয়ারা, যার মধ্যে সবচেয়ে বড়টি হচ্ছে স্যামসন ফোয়ারা। পাশেই রয়েছে চার্চ। কিন্তু রাজপ্রাসাদকে যে মনোযোগ দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে তার বিন্দুমাত্র দেওয়া হয়নি ওই চার্চের প্রতি। ধর্মের প্রতি এই আচরণ অক্টোবর বিপ্লবের জন্য কালো অধ্যায় হয়ে আছে। অক্টোবর বিপ্লব ধর্মকে একবারে ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখিয়েছিল। রাষ্ট্রের পরিচালনায় এক বিশেষ অভিযান চলেছিল, যে অভিযানে ধর্মকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। উগ্র নাস্তিকতাবাদ কোনো আকস্মিক প্রবণতা বলা ঠিক হবে কি না, জানি না। সেটি কমিউনিস্ট নীতির কেন্দ্রীয় প্রত্যয় কি না, সেটিও সঠিক করে বলা কঠিন। শুনেছি বিপ্লবের পর সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় স্কুলের সিলেবাস থেকে ধর্মকে বাদ দিয়েছিল। ধ্বংস করা হয়েছিল প্রায় সব গির্জা এবং ধর্মমন্দির। তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ছাড়াও হাজার হাজার বিশপ ও ধমর্যাজক প্রাণ হারিয়েছিলেন গোয়েন্দা সংস্থার হাতে। পরবর্তী সময়ে সেগুলোকে নাকি পরিণত করা হয়েছিল গণশৌচাগারে। নানা ধরনের প্রচারধর্মী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'লিগ অব দ্য গডলেস'। চার্চ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হলে মানুষের মনে ধর্মের প্রভাব কমে আসবে—এই ধারণা সোভিয়েত বিপ্লবের পর বেশ জোরদার হয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্র যখন দেখল সেটি বাস্তবে ঘটছে না, তখন রাষ্ট্রের চেষ্টা বাড়ল আরও এক দফা। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে স্তালিন নাকি কয়েক হাজার বিশপকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের একটি পোস্টার আমার মনে পড়ে। পোস্টারটিতে একজন মহাকাশচারী বলছেন, 'আমি তো মহাকাশে ঘুরেছি অনেক। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার সাক্ষাৎ পাইনি।' আজ বিপ্লবের এক শ বছর কেটে গেছে। রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চ ধর্মবিশ্বাসীদের ভিড়ে পরিপূর্ণ। কী কারণে ধর্মের প্রতি মানুষের আকর্ষণ, তার কারণ হয়তো এই যে ধর্মীয় অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা মানুষের প্রকৃতিগত।

লেনিনগ্রাদের হেরমিটেজ জাদুঘর পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তর। সেখানে সংরক্ষিত রয়েছে ৩০ লাখ ঐতিহাসিক চিত্রকলা এবং অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। প্রতিটির সামনে যদি এক মিনিট করেও সময় ব্যয় করি তাহলে পুরো জাদুঘর দেখতে আমার লাগবে এগারো বছর। এগুলো সব রাখা হয়েছে ৩০০টি হলঘরে। জাদুঘরটি জার রোমানভের শীতকালীন প্রাসাদে অবস্থান নিয়ে আছে। এখানে আছে খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর গ্রিক সিন্থিয়ান স্বর্ণের নানা দ্রব্য। আছে পিকাসোর ব্লু পর্যায়ের চিত্রকলা (১৯০১-১৯০৪ সালের শৈল্পিক কাজ যেখানে পিকাসো ব্যবহার

করেছেন নীল ও হালকা সবুজ রং)। আছে রেম্ব্রান্ত টিসিয়ান, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি অথবা মাইকেলেঞ্জেলোর কাজ। আছে ব্রিটিশ শিল্পীদের কাজ। আছে ইমপ্রেশনিস্ট, পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট এবং আধুনিককালীন ধারার শিল্পকর্ম। তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মনে, সিজান, ভ্যান গঘ, গগুইন ও ম্যাতিস। এই সংগ্রহ শুরু হয়েছিল ৩০০ বছর আগে। পিটার দ্য গ্রেট ইউরোপ থেকে নানা ধরনের শিল্পকর্ম নিয়ে এসেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্যাথেরিন দ্য গ্রেট নিজে কিনেছিলেন রেনেসাঁ যুগের নানা কাজ। ১৮৫২ সালে জার প্রথম নিকোলাস এই প্রাসাদকে জাদুঘরের মর্যাদা দিয়েছিলেন। কেবল ১৯১৭ সালের পর জাদুঘরটি রাষ্ট্রের অধীনে আসে এবং সাধারণ মানুষের জন্য তার দরজা খুলে দেওয়া হয়। অনেকে বলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রুশ সেনাবাহিনী অনেক শিল্পকর্ম ড্রেসডেন বা অন্যান্য শহর থেকে নিয়ে এসেছিল, যেগুলো এখন এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে।

জাদুঘর থেকে বেরিয়ে নিয়েভস্কি প্রসপেক্তের দিকে এগোচ্ছি। দৃষ্টিতে ধরা পড়ল প্রশস্ত এক সড়কপথ। দুই ধারে বিলাসী হাতে গড়া নানা ভবন, অট্টালিকা, দোকানপাট। সেখানে কেটে গেল প্রায় অর্ধেক বেলা। রাস্তাটি নেভস্কি নামে এক রুশ যুবরাজের নামে। তিনি ছিলেন নভগোরদের শাসক। সুইডিশ ও জার্মান বাহিনী নভগোরদ রাজতন্ত্রকে বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ করেছে। বিভিন্ন সময়ে ওই রাজতন্ত্র কাটিয়েছিল দুর্যোগময় সময়। কিন্তু যুবরাজ শক্ত হাতে বহিঃশত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রশস্ত সড়কটি লেনিনগ্রাদের সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। রাস্তাটির প্রণেতা ছিলেন পিটার দ্য গ্রেট। এই সড়ক দিয়ে যেতে হয় মস্কো কিংবা নভগোরদ। তার ওপর আছে বিখ্যাত কাজান চার্চ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শপিং মল। জাতীয় গ্রন্থাগার। রুশ সাহিত্যিক নিকলায় গোগোল এই নেভস্কি প্রস্পেক্ত সম্পর্কে গল্প লিখেছিলেন। সেখানে তিনি দক্ষ হাতে তুলে ধরেছিলেন রাশিয়ায় পুঁজিবাদের উত্থানকে। সে সঙ্গে মানুষের জীবনে প্রেম এবং ভালোবাসাকে। দস্তয়েভস্কির *ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট*ও লেখা হয়েছিল এই প্রস্পেক্তকে ঘিরে। ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশ লেখকেরা যে ক্যাফেতে সমবেত হতেন সেটি চালু আছে এখনো। সেন্ট পিটার্সবার্গ ভ্রমণ করে জারের ক্ষমতার নানা নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলাম। সেই সঙ্গে চোখ জুড়িয়ে গেল মানুষের হাতে গড়া বিশাল এক শৈল্পিক ভান্ডার দেখে। সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। অথচ তাদের শ্রমের ফসল দিয়ে জার গড়ে তুলেছিলেন বিপুল ধনসম্পদ এবং নয়নভোলানো রাজপ্রাসাদ। মনোরঞ্জনের জন্য তৈরি করেছিলেন থিয়েটার ও জাদুঘর। সবই রাজতন্ত্র এবং অভিজাত শ্রেণির প্রয়োজনে। সাধারণ রুশ নাগরিকের জীবনকে উপেক্ষা করে।

যে সামাজিক বৈষম্য রুশ সমাজে স্থান করে নিয়েছিল তার প্রতিফলন দেখি

ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যে। কল্পনায় নানা চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে পুশকিন, তলস্তয়, লেরমন্তভ, দস্তয়েভস্কি, চেখভ, তুরগেনিয়েভ, চেরনশেভস্কির মতো মহান কথাশিল্পীরা তাঁদের কারুকার্যময় সাহিত্যকর্মে রেখে গেছেন নানা দিকনির্দেশনা। তাঁদের সাহিত্যকর্মকে যখন বলশেভিক বিপ্লবের পাশে রাখি এবং তুলনা করি বিপ্লবোত্তর রুশ জীবনকে, তখন তার মধ্যে খুঁজে পাই বলশেভিক বিপ্লবের দুর্বল ও সবল দিকগুলো। পুশকিনের কবিতায় দেখি মুক্ত মানুষের নানা আকাঙ্ক্ষা যা জারের রাশিয়ায় প্রায় নিষিদ্ধ ছিল বলা চলে। তাঁর লেখা 'বরিস গদুনভ' ছিল এ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। সেখানে পুশকিন দেখিয়েছেন শাসক এবং সাধারণ মানুষের সম্পর্ক কত নিষ্ঠুর হতে পারে। *ইফগেনি অ্যানেগিন* তাঁরই লেখা একটি কবিতার বই। জীবনে প্রেমের স্থান সেখানে জুড়ে আছে সবটুকু। কিন্তু তার মধ্য দিয়ে পুশকিন এঁকেছেন অত্যাচারী সমাজের চিত্র। সে দিক থেকে ভাবলে পুশকিন ছিলেন একজন বিদ্রোহী কবি। *ক্যাপ্টেনের মেয়ে* তিনি লিখেছিলেন পুগাচভের বিদ্রোহ নিয়ে, যা কিনা রুশ বিপ্লবীদের উৎসাহিত করেছিল। এটি তিনি লেখেন ১৮৩৬ সালে। দ্বিতীয় ক্যাথেরিনের শাসনকালে ১৭৭৩ থেকে ১৭৭৫ সালের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত ইমিলিয়ান পুগাচভের বিদ্রোহ চলেছিল। সে সময় রাশিয়ায় কৃষক অসন্তোষ তুঙ্গে। পাশাপাশি চলছে অটোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সব মিলিয়ে রুশ জীবন সে সময় ছিল বেশ জটিল। ১৮২৫ সালে জারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারী ডিসেম্বরিস্টদের নিয়ে তাঁর একটি লেখা আছে। সেখানে আছে স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের কথা। তিনি নিজে ডিসেম্বরিস্টদের আদর্শের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যের বড় দিক হচ্ছে, দেশটির নানা কোণ থেকে এসেছিলেন রংবেরঙের নানা সাহিত্যিক। হয়তো সে কারণে তাঁদের কাজে লক্ষ করি জীবনকে তুলে ধরার নানা ঢং। তাঁদের লেখনীর বিষয়বস্তু ভিন্ন। প্রত্যেকে জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যকে উন্মোচন করেছেন নানা পথে। রাশিয়ার দক্ষিণ প্রান্তের প্রত্যন্ত শহর তাগানরগে চেখভ এঁকেছেন নানা মানুষের চরিত্র। তুরগেনিয়েভ জীবনের বড় সময় কাটিয়েছেন প্যারিসে। এঁদের শৈল্পিক প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। প্রখ্যাত কবি পুশকিন তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন রাশিয়ার ওই সময়কার জীবন। দস্তয়েভস্কি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জগতের অন্তর্নিহিত প্রবণতা এঁকেছেন নানা মাধ্যম ব্যবহার করে। তলস্তয় ব্যবহার করেছেন বিশাল ক্যানভাসে আঁকা বহু চরিত্রের জীবন থেকে নেওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা। চেখভ এঁকেছেন সাধারণ জীবনের ঘটনাবলি, যার মধ্য দিয়ে উন্মোচন করেছেন জীবনের গভীর সত্যকে। তাঁর গল্পে প্লট মুখ্য নয়। তার চেয়ে তিনি জোর দিয়েছেন ব্যক্তির মেজাজ ও চরিত্রের ওপর। তাঁর গল্পে লক্ষ করি ধনী এবং আপাতদৃষ্টিতে সফল মানুষের ব্যথা, রোগ, শোক এবং জীবনের অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতার কাহিনি। সেখানে

লিপিবদ্ধ আছে কীভাবে সেগুলোর সঙ্গে ওই মানুষগুলো সংগ্রাম করে এবং টিকে থাকে। ট্র্যাজেডি এবং কমেডির সংমিশ্রণে তিনি গড়ে তুলেছেন অপূর্ব সাহিত্যকর্ম। অন্যদিকে তলস্তয়ের লেখায় প্রতিফলিত হতে দেখি তাঁর নিজের পারিপার্শ্বিকতা। গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা। কৃষকের সুখ-দুঃখের কাহিনি।

রাশিয়ার তুলা শহরের পাশেই ইয়াসনায়া পলিনা নামের গ্রাম। সেখানেই তলস্তয়ের আদি গৃহ। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছর শেষ হওয়ার বেশি বাকি নেই। আমাদের ভাষা শিক্ষক শেষ দুই দিন দুটি ট্যুরের ব্যবস্থা করেছিলেন। একটি তলস্তয়ের বাড়িতে, যেটি এখন রাষ্ট্রীয় জাদুঘর। অন্যটি দস্তয়েভস্কির জাদুঘর, যেটি মস্কোতে অবস্থিত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি মস্কো থেকে ২০০ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিয়ে সকাল ১০টার দিকে তলস্তয়ের বাড়িতে পৌঁছাল। হেঁটে চলেছি তলস্তয়ের জমিদারবাড়ির দিকে। দুপাশে বারচের বনরাশি। তার গা ঘেঁষে সবুজ ঘাসের বিস্তীর্ণ মাঠ। হৈমন্তিক শিশিরে ভেজা ওই মাঠের পাশ দিয়ে চলে গেছে আঁকাবাঁকা রাস্তা। বিশ মিনিট হাঁটার পর চোখে পড়ল তলস্তয়ের গৃহ। কী অপূর্ব পরিপাটি করে সাজানো তাঁর নামের এই জাদুঘরটি। তলস্তয়ের স্মৃতি সেখানে মিশে আছে প্রতিটি কোনায়। আমাদের গাইড সবাইকে জড়ো করলেন একটি কক্ষে। সেখানে পরিচিত হলাম তলস্তয়ের জীবনের নানা জানা-অজানা কথার সঙ্গে। এখানেই তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত সব সাহিত্যিক কর্ম *ওয়্যার অ্যান্ড পিস*, *আন্না কারেনিনা* বা *ভক্রিসেনিয়ে*।

তলস্তয়ের এই বইগুলো আমি পড়েছি। প্রতিটির মধ্যে লক্ষ করেছি গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে আঁকা মানুষের সাধারণ জীবনের খুঁটিনাটি দিক তুলে ধরার অপূর্ব কৌশল। ভাবি, নিশ্চয় কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে অধ্যয়নের প্রভাব তাঁর লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে ফরাসি দার্শনিক মন্তেস্কুর আইনতত্ত্বকে তিনি তুলনা করেছিলেন ক্যাথেরিন দ্য গ্রেটের লেখা *নাকাজ* নামের আইনি রচনার সঙ্গে। তার প্রতিফলন লক্ষ করেছি *ভক্রিসেনিয়া* বা 'পুনরুজ্জীবন' নামের সাহিত্যকর্মে। সেখানে নিখলুদভ নামের এক জমিদারপুত্র দরিদ্র এক চাকরানিকে বশীভূত করেছিলেন। অপরাধের শাস্তি হিসেবে মাস্লভা বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। মেয়েটি পরে বেশ্যাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েন। নিখলুদভের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় কোর্টে। সেখানে তিনি জুরির সদস্য, যে জুরি বিচার করবেন মাইস্লভকে অন্য এক অপরাধের জন্য। নিখলুদভের মন অনুশোচনায় ভরে যায়। নিজ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তিনি সিদ্ধান্ত নেন মাইস্লভের সঙ্গে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে যাওয়ার। তলস্তয় এখানে নিপুণ হাতে এঁকেছেন রাশিয়ার বিচারব্যবস্থার অবিশ্বাস্য মিথ্যাচারকে। কারাগারের অবর্ণনীয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। খ্রিষ্টধর্মের অনুশোচনার তত্ত্বকে ব্যবহার করে সামাজিক অসাম্য এবং শোষণের প্রতিকার আশা করেছেন।

কিন্তু একই সঙ্গে অনুভব করেছেন ওই তত্ত্বের অসারতা। রাশিয়ার পর্বতপ্রমাণ সমস্যা সমাধানে সেটি কতটুকু কার্যকর, সেটি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। রচনাটির জনপ্রিয়তা এতই ছিল যে তাঁর বিক্রি *ওয়্যার অ্যান্ড পিস* কিংবা *আন্না কারেনিনা*র বিক্রি মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। *ওয়ার অ্যান্ড পিসে* ভিন্ন দিক থেকে উন্মোচিত হতে দেখি তলস্তয়ের মেধা। সেখানে তিনি তুলে ধরেছেন মানুষের বুদ্ধির সীমাবদ্ধতাকে। যেকোনো যুদ্ধ হচ্ছে তাঁর ধারণায় বিশৃঙ্খলা ছাড়া কিছু না। যত পরিকল্পনা করি না কেন, যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করবে সুযোগের ওপর। এ থেকে তিনি ধারণা করেছিলেন নির্দিষ্ট কোনো মডেল দিয়ে মানুষের জীবনকে আঁকা সম্ভব না। কারণ ইতিহাস কোনো সূত্র মেনে চলে না এবং সে কারণে ইতিহাসে ধারাবাহিকতা বলে কিছু নেই। নেই ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতা বলে কিছু। তাঁর ধারণায় মহান মানুষের চিন্তা দিয়ে নির্মিত হয় ইতিহাস। সাধারণ মানুষও প্রাত্যহিক জীবনে যেসব ক্ষুদ্র সিদ্ধান্ত নেয়, সেটিও সাহায্য করে ইতিহাসের বৃহত্তর ধারার গঠনে। সত্যকে তিনি দেখেছেন একেবারে অসনাতনী দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর মতে, সত্য কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামো থেকে মেলে না। দৈনন্দিন জীবনই বলে দেয় কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা। তলস্তয় বা দস্তয়েভস্কি পড়ে আমার একটিই ধারণা হয়েছে। লেনিন, ট্রটস্কি বা অন্যান্য রুশ বিপ্লবী রুশ সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন ঠিকই। উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেছেন। বিশেষ করে চেরনশেভস্কির *হোয়াট ইজ টু বি ডান?* অথবা তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, চেখভের সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী দিকগুলোকে। ভালোবেসেছেন জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের দেওয়া বক্তব্যকে। জারের বিচার বিভাগের অন্তসারশূন্যতাকে। অথবা ভূমিদাসের অধিকার নিয়ে লেখাগুলোকে। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা উপেক্ষা করেছেন মানুষের মনোজগতের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো, যার প্রতি রুশ বিপ্লব নজর দিতে ভুলে গেছে। অথচ বিপ্লবের সব আয়োজন তো কেবল মানুষের কল্যাণের লক্ষ্য নিয়ে। রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি সেখানে বড় না। দার্শনিক রচনা এবং ইতিহাসের সূত্র অনুসন্ধান করাও তার একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে ভাবা কঠিন। শত সহস্রবার নানা শৈল্পিক মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পরও বলশেভিক বিপ্লবের নেতারা এই দিকটি কেন উপেক্ষা করলেন, তার তাৎক্ষণিক যৌক্তিকতা খুঁজে পাইনি।

এবার মস্কোতে অবস্থিত প্রখ্যাত সাহিত্যিক ফিওদর দস্তয়েভস্কির জাদুঘর দেখার পালা। জাদুঘরটি মস্কোর দস্তয়েভস্কি লেনে। জীবনের বেশির ভাগ সময় তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে কাটালেও দস্তয়েভস্কির জন্ম এই মস্কো শহরে। এর আগে ঘুরে এসেছি লেনিনগ্রাদের কুজনেতস্কি লেনের দস্তয়েভস্কি জাদুঘরটি। যে ফ্ল্যাটে দস্তয়েভস্কি বসবাস করতেন সেটিই আজ এই অত্যন্ত প্রতিভাবান সাহিত্যিকের জাদুঘর হিসেবে পরিচিত। সেখানে তিনি স্ত্রী আন্না স্নিটকিনার সঙ্গে কাটিয়েছিলেন

দীর্ঘকাল। সেখানে আছে নানা সময়ে তোলা দস্তয়েভস্কির ছবি। ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জিনিসপত্র। আমাদের ট্যুর গাইড বললেন, 'ওই দেখো ওখানে এই বাড়ির পাশে একটি মর্গ ছিল। সেখানে লাশ কাটা হতো। আর তার পাশেই ছিল একটি পাগলাগারদ।' মনে পড়ল এই দুই প্রতিষ্ঠানের প্রভাব দস্তয়েভস্কির লেখায় কি সুস্পষ্টভাবেই না প্রতিফলিত হয়েছে। অজান্তেই মনে এল দস্তয়েভস্কির *ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট*, যেখানে রয়েছে চশমখোর বৃদ্ধ এক নারীর হত্যাদৃশ্য। খুনির মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতাগুলোর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। সেই ধারায় সাহিত্য রচনাকে অনেকে অবশ্য পছন্দ করেননি। সামাজিক ইস্যুগুলোকে তিনি উপেক্ষা করছেন। তাঁদের প্রতি যতটুকু গুরুত্ব সমকালীন সাহিত্যিকেরা তাঁর থেকে আশা করেছিলেন সেটুকু তাঁর লেখায় স্থান পাচ্ছে না, এ ধরনের অভিযোগ অনেকেই করেছিলেন। লেখক তুরগেনিয়েভ তাঁর প্রবন্ধে এই অভিযোগ তুলেছিলেন। তৎকালীন সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে প্রথিতযশা বিলিন্সকির লেখায় একই সমালোচনা বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জগতের ওপর দস্তয়েভস্কি কেন গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তার কারণ খুঁজে পাই তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। সেই দৃষ্টিভঙ্গির অনেকটাই তৈরি হয়েছিল তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি বিপ্লবী তৎপরতা থেকে দূরে ছিলেন না, যদিও বুদ্ধিজীবীরা বিপ্লবকে যেভাবে দেখেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁর বিরোধী। বিপ্লবী তৎপরতায় অংশ নেওয়ার অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের দিন ঠিকই তাঁকে নেওয়া হলো ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। গুলির ঠিক আগ মুহূর্তে এল জারের ক্ষমা। জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যে মনস্তাত্ত্বিক ঝড় তাঁর মনের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল, সেটি তাঁর লেখায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন জীবনের জটিল প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে। জীবনের মূল্য কতটুকু, সেটি তিনি বুঝেছিলেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। তাঁর লেখা উপন্যাস *দ্য ইডিয়ট*-এ সেটি লক্ষ করা কঠিন না। সেখানে আমি তলস্তয়ের সঙ্গে তার মনোগত কিছু সাদৃশ্যের দিকও লক্ষ করেছি। বিপ্লবী তত্ত্বের বস্তুবাদী বা ইতিহাসের পূর্বনির্ধারণবাদের বিরুদ্ধে তিনি কেন দাঁড়িয়েছিলেন, সেটি বোঝা কঠিন না। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভেদরেখা তার সীমান্তে এসে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন দৈবক্রমে। সেই শিউরে ওঠা অনুভূতির জাল তাঁকে আবিষ্ট রেখেছিল জীবনের বাকি দিনগুলো।

ফায়ারিং স্কোয়াডের হাত থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু সাইবেরিয়ায় নির্বাসন থেকে রক্ষা পাননি। সেখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি লিখেছিলেন *দ্য হাউস অব দ্য ডেড*। তলস্তয়ের মতো এখানেও তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর জোর দিয়েছেন। তার মধ্যেই দেখেছেন মনুষ্যত্বের প্রকৃত

রূপকে। সেখানে তিনি আরও লিখেছিলেন *দ্য নোটস ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড*। এটিও দস্তয়েভস্কির দার্শনিক মনোজগৎকে বোঝার একটি উপযুক্ত রচনা। সেখানে তিনি বুদ্ধিদীপ্ত আক্রমণ চালিয়েছেন বিপ্লবী ও উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে। লেনিনের মতো বিপ্লবীরাও দাবি করেছেন মানুষ তার ধীশক্তি দিয়ে প্রকৃতি এবং মনোজগতের সবকিছু বুঝতে পারে। সেই আশাবাদ আমি দেখেছি লেনিনের লেখা *মেটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এম্পিরিও ক্রিতিসিজম* নামের দার্শনিক রচনায়। ইতিহাসের অবধারিত রায় সম্পর্কে মানুষ জানতে পারে। ইতিহাসের গতিধারা কী, সেটিও মানুষ তার মেধা দিয়ে নির্দিষ্ট করতে পারে। সেই ধরনের আত্মপ্রত্যয়ী দৃষ্টিভঙ্গি আমি লক্ষ করেছি মার্ক্স বা এঙ্গেলসের রচনায়। রুশ বিপ্লবীরা সেই ধারার পথিকৃৎ ছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, ব্যক্তির মনস্তত্ত্বকে বোঝা কঠিন না। কারণ ব্যক্তির মনোজগৎ বস্তুজগতের নিয়মতান্ত্রিকতার মতো করে চলে নির্দিষ্ট আইনের অধীনে। ইতিহাসও চলে আইন দিয়ে। এই ধারণাই কিন্তু ইউটোপীয় আদর্শভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার ধারণাকে মূর্ত করে তুলেছিল। জাগিয়েছিল সেই আশাবাদ, যা দিয়ে তারা ভেবেছিল ইউটোপীয় কাল্পনিক জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে বিপ্লবীরা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেয়নি। ব্যক্তির সবকিছুই যদি ঐতিহাসিক আইনের আওতায় চলে, তাহলে তার স্বাধীনতার প্রশ্নটিও অবান্তর। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবীদের লেখায় বারবার এই ধারণাই প্রতিধ্বনিত হতে দেখি—সেই আইন জানো যে আইন দিয়ে সমাজ পরিচালিত হয়। যে আইন দিয়ে মানুষের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত দিকগুলো ফুটে ওঠে। অথচ সেটি যে একমাত্র সত্য, তা তো না। যার প্রমাণ তলস্তয় বা দস্তয়েভস্কির লেখা।

দস্তয়েভস্কি তাঁর *ক্রাইম অ্যান্ড প্যানিশমেন্ট*কে নিজের দার্শনিক অবস্থানের একটি বিবৃতি হিসেবে দেখেছিলেন। এই সাহিত্যকর্মে তিনি আক্রমণ করেছেন সব প্রচলিত বিশ্বাসবোধকে। বাতিল করে দিয়েছেন সব প্রত্যয়কে, যে প্রত্যয়গুলো এতকাল ধরে আমরা সভ্যতার মূল ভিত হিসেবে দেখেছি। সেই প্রত্যয়ের দুটি উদাহরণ হতে পারে ভালো ও মন্দের ধারণা। আমরা ধরেই নিয়েছি ভালো বলে একটা কথা আছে। মন্দ বলেও একটা কথা আছে এবং তারা একে অপরের বিপরীত। সেই বিশ্বাস নিয়ে আমরা বলেছি সমাজে কিছু ভালো মানুষ আছে। আছে কিছু মন্দ মানুষ। এই পদ্ধতিকে প্রসারিত করে আরও ভাগ করেছি সমাজ ও জীবনের বাকি সবকিছুকে। আদর্শের দিক থেকে বলেছি, এটি ভালো আদর্শ, ওটি মন্দ আদর্শ। সমাজতন্ত্র ভালো, পুঁজিবাদ ভালো নয়। বৈপরীত্যের যে জগৎ আমরা সৃষ্টি করেছি এবং যার মধ্যে বাস করে গড়ে তুলেছি আমাদের ধ্যানধারণা, আদর্শ ও জীবনধারা দস্তয়েভস্কি তাকে দেখেছেন ধর্মীয় কুসংস্কার হিসেবে। ভালো ও মন্দের ধারণার প্রাচীন উৎস হচ্ছে ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। কিন্তু মানুষের কাজে-কর্মে

এই ভালো-মন্দের ধারণাটি যথেষ্ট আপেক্ষিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। সোভিয়েত অভিজ্ঞতা থেকে আজ যদি বলি সমাজতন্ত্র মন্দ এবং পুঁজিবাদ ভালো তাহলে কি ভুল হবে? আজ যাকে ভালো বলে মনে করি আগামীকাল সেটি মন্দ হয়ে যায় কেন? ভালো-মন্দের ধারণা যদি সত্যি-মিথ্যা হয় তাহলে অপরাধবোধের ধারণাকেও বাতিল করতে হয়। সেভাবেই ভেবেছিলেন দস্তয়েভস্কি এবং বাতিল করতে চেয়েছিলেন মানুষসৃষ্ট এই প্রত্যয়গুলোকে। তার জায়গায় তিনি গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন ব্যক্তির চারিত্রিক গুণাবলির প্রতি। সেই বিশ্বাসবোধকে অনুসরণ করে তিনি মানুষকে দুই গ্রুপে ভাগ করেছিলেন। একটি গ্রুপে তিনি রেখেছিলেন স্বল্পসংখ্যক অসাধারণ কিছু মানুষকে। তার বিপরীতে সাধারণ মানুষের বিশাল বাহিনী। অসাধারণ মানুষ হিসেবে তিনি দেখেছিলেন ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান, রোমান সম্রাট সলোন বা জুলিয়াস সিজারের মতো বীর পুরুষকে। তাঁরা অসাধারণ ব্যক্তিগুণ দিয়ে সমাজপ্রগতিকে এগিয়ে নেন। তাঁদের তুলনায় সাধারণ মানুষের ভূমিকা ইতিহাসে নগণ্য। তাঁদের কাজ মানবপ্রজাতির প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা। এই ধারণাই পরবর্তী সময়ে নিটসের মতো দার্শনিকের জন্ম দিয়েছিল। হিটলারও নিজেকে মহান এবং অসাধারণ ভেবে নিটসের দার্শনিক মতাদর্শকে সমর্থন করেছিলেন।

আরও এক চিন্তার ধারা দস্তয়েভস্কি গড়ে তুলেছিলেন। সেটি মানুষের আত্মহননকে নিয়ে। *দ্য পজেজসড* নামের রচনায় তিনি কেন আত্মহত্যাকে মহিমান্বিত করেছিলেন তার কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখেছিলেন আত্মহত্যার প্রচেষ্টার মধ্যে কোনো ব্যক্তিস্বার্থ নেই। ফলে কাজটি একেবারে বিশুদ্ধ। আত্মধ্বংস মানুষকে মুক্ত করে সব সামাজিক বাধা এবং নিয়মতান্ত্রিকতা থেকে। সেটিই মানুষের সবচেয়ে বড় পাওয়া। ধারণাটি তিনি গড়ে তুলেছিলেন সাইবেরিয়ার নির্বাসন জীবনের দিনগুলোতে, কিন্তু কেন? তিনি কি ব্যক্তিস্বার্থের প্রবল স্রোতোধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেননি? করেছেন। ধারণাটি কি সমাজতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়? ব্যক্তিস্বার্থের কারণে কি কমিউনিস্ট আন্দোলন পথচ্যুত হয়নি। ধারণাটির সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ করেছি শিয়া ইসলামে আত্মত্যাগের ধারণাটির সঙ্গে। মৃত্যুর সময়কে নিজের মতো করে নির্ধারণ করার স্বাধীনতা এবং কাজটির মধ্যে যে স্বার্থহীনতার দিক আছে সেটি দস্তয়েভস্কি লক্ষ করেছিলেন। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোনো ধারণা বা বিশ্বাস-কাঠামোকে তিনি সুস্থ মনে করেননি। কারণ সব পরিকল্পিত ধারণা মানুষের ব্যক্তিত্বকে দমিয়ে রাখে। ধারণাগুলো রাজনীতির অঙ্গনে প্রয়োগ করার সাহস কারও হয়নি। দস্তয়েভস্কির চিন্তার জগতে ভাসমান সব ধারণার কিছু কিছু দিক সমসাময়িক বিপ্লবী যোদ্ধাদের মনে কোনো দাগ কাটেনি বলেই ধারণা করি। বলশেভিক বিপ্লবের

ব্যর্থতার কারণ তার মধ্যে লুকিয়ে আছে কি না জানি না।

তিন

প্রায় এগারো বছর কেটে গেল রাজধানী শহর মস্কোতে। লেখাপড়া শেষ হওয়ার পথে। এই দীর্ঘ সময় আমি উরাল পর্বতমালার পশ্চিম অংশের প্রায় সব শহর এবং রিপাবলিক ঘুরে দেখেছি। দেখেছি ইউক্রেন, বেলারুশিয়া, মলদোভিয়ার নানা শহর। সোভিয়েত রাশিয়ার এই পশ্চিম অংশকে কেবল ইউরোপের অংশ হিসেবে দেখা হয়। বাকিগুলোকে ধরা হয় এশিয়ার অংশ হিসেবে। এই অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটা কিন্তু ছোটখাটো কোনো জিনিস না। ভৌগোলিকভাবে কোন দেশকে কোন অঞ্চলে রাখা হবে বা রাখা হবে না প্রশ্নটি কিন্তু একান্তই রাজনৈতিক। সোভিয়েত ইউনিয়নকে ইউরোপে অন্তর্ভুক্ত না করার প্রধান কারণ হচ্ছে দেশটি সমাজতান্ত্রিক। ইউরোপ নামের যে ভূখণ্ডকে আজ আমরা জানি সেটি কিন্তু ইতিহাসের সব পর্যায়ে ওই নামে ছিল না। তার ভৌগোলিক সীমানাও সর্বক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন থাকেনি। তার নামকরণের সঙ্গে গ্রিক পৌরাণিক বিশ্বাসজগতের সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু তবুও মধ্যযুগে তাকে বলা হতো 'হোলি রোমান এম্পায়ার'। সেই এম্পায়ার ভেঙে পড়ার পর ছোট-বড় নানা দেশ নিয়ে ইউরোপ আত্মপ্রকাশ করল। অনেকেই সে সময় প্রশ্ন তুলেছিল ইতালি ও গ্রিসকে নিয়ে। তাদের ইউরোপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সঠিক মনে করেনি অনেকে। এই দেশগুলোর সঙ্গে মরক্কো, লিবিয়া, লেবানন বা তুরস্ক অর্থাৎ এশিয়া/উত্তর আফ্রিকার জনগোষ্ঠীর বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। আবার অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে তারা মুসলিম সভ্যতারও অংশ। এই বাদ দেওয়া বা অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল রোম সাম্রাজ্য যখন পুব ও পশ্চিমে ভাগ হয়ে গেল তখন থেকে। রোমের পুব অংশ ইউরোপ কি না এ নিয়েও মতভেদ ছিল, যেহেতু তার রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বা আজকের ইস্তাম্বুল। ফলে যা হওয়ার তা-ই হলো। ইউরোপ থেকে বাদ পড়ল তুরস্ক এবং পার্শ্ববর্তী আরও অন্যান্য দেশ।

তবে সে যা-ই হোক, আমার ভ্রমণ তালিকায় বাকি রয়েছে দুটি অঞ্চল। বাল্টিক সাগরের ধার ঘেঁষে তিনটি রিপাবলিক এবং মধ্য এশিয়ার মুসলিম রিপাবলিকগুলো। তিনটি বাল্টিক রিপাবলিকের (এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া) প্রতি আমার আগ্রহের অন্ত নেই। তারা সোভিয়েতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিজিত দেশ হিসেবে। ফলে জানতে চেয়েছিলাম সেখানে জাতিগত অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নের সমাধান হয়েছে কি না এবং সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রতি মানুষের মনোভাব কী। তবে এই তিনটি রিপাবলিককে সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিম অঞ্চল থেকে আমি পৃথক করে ভেবেছি নানা কারণে। লক্ষ করেছি রাশিয়া, ইউক্রেন ও বেলারুশ থেকে বাল্টিক রিপাবলিকগুলোর জাতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বেশ ভিন্নতা রয়েছে। যে ধরনের

ভিন্নতা একজন লক্ষ করবেন স্লাভ জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান বা ফিন জাতি-গোত্রের মধ্যে। তবে ইতিহাসে পড়েছি এস্তোনিয়ার সঙ্গে ফিনদের রয়েছে গভীর জাতিভিত্তিক সম্পর্ক। অন্যদিকে লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া জাতিগতভাবে ভিন্ন ধাঁচের মানুষের দেশ। তাদের বলা হয় বাল্ট (এই শব্দ থেকে বাল্টিক নামটি এসেছে)। ইতিহাসের বিবর্তনে এবং জাতি মিশ্রণের কারণে এসব দেশের মানুষের গায়ের রং বা আদি ডিএনএ বদলে গেছে। স্লাভস সুইডস ভাইকিং রোমা ইহুদি বা বাল্টিক জার্মানদের সঙ্গে মিশে সেখানে এসেছে বিপুল পরিবর্তন। সোভিয়েতের অধীনেও ঘটেছে বাড়তি মিশ্রণ। সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর নানা অজুহাতে বাল্টিক অঞ্চলে রুশ জাতিভুক্ত মানুষের বসতি বৃদ্ধি পায়। ফলে সেখানকার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই আজ রুশ বংশোদ্ভূত। ধারণা করি সেটি ঘটেছিল রুশ আধিপত্যকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে খর্ব করতে।

মস্কো রেলস্টেশন থেকে লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনুসের পথে রওনা হয়েছি। ভিলনুস দেখার পর সেখান থেকে যাব বাকি দুটি রিপাবলিকে। ১৯৭৭ সালের জুন মাস। আমারই এক বন্ধু আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল মস্কোর আন্তর্জাতিক সাহিত্যের লাইব্রেরিতে। সে-ই হোটেলের ব্যবস্থা করেছে। বাল্টিক রিপাবলিকগুলো দেখাবে এই প্রতিজ্ঞা সে অনেকবার করেছিল। অবশেষে সেটি সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। রাতে মস্কো থেকে রওনা হয়ে সকালে ভিলনুসে পৌঁছালাম। নেমেই বুঝতে পারি রাশিয়ার অন্য শহরগুলো থেকে ভিলনুস কত ভিন্ন। কোনো বড় শহর না। মনে হলো পায়ে হেঁটে শহরটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেখা সম্ভব। হোটেলে চেকইন করে বন্ধুর সঙ্গে গেলাম শহর ঘুরতে। নেরিস নদীর ধার দিয়ে চলেছি শহরের পুরোনো অংশের দিকে। সেখানে দেখলাম 'গেট অব ডন'। রাজা মিন্দোগাসের মূর্তি। জেদিমিনাস অ্যাভিনিউ দিয়ে হেঁটে চলেছি। পথে পড়ল মধ্যযুগের কয়েকটি ক্যাসেল। ইতিমধ্যে বিকেল হয়ে এসেছে। বন্ধু বলল, 'চলো আমার বন্ধুদের আখড়ায় তোমাকে নিয়ে যাব।' সেখানে গিয়ে দেখি জনা দশেক আমাদের বয়সী যুবক বসে আছে। দুজন বয়স্ক। পরিচয়ে জানলাম তারা এখানকার কবি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। কিছু মেয়েবন্ধুও আছে তাদের সঙ্গে। আমাকে একটি বিয়ারের বোতল ধরিয়ে দিয়ে সে অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। নানা বিষয় নিয়ে আলাপ হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতি তাদের উৎসাহের অভাব নেই। তাদের উত্তর দিতে দিতে বেশ সময় কেটে গেল। সন্ধে হওয়ার আগে বন্ধু বলল, 'চলো ক্যাফেতে যাই।' সবাই মিলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি। শহরটির রাস্তা সরু। আমাদের পুরান ঢাকার মতো। পিচঢালা রাস্তার বদলে কালো ইটের রাস্তা। পাশে দোকানগুলোও ভিন্ন ধাঁচের। পথে পড়ল বেশ কয়েকটি গির্জা। খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নামে গির্জাগুলোর নামকরণ করা। প্রায় একই

চিত্র চোখে পড়ল পরবর্তী সময়ে যখন এস্তোনিয়ার রাজধানী তালিন এবং লাটভিয়ার রাজধানী রিগাতে গিয়েছিলাম।

ঐতিহাসিক দিক থেকে বাল্টিক রিপাবলিকগুলো অন্য রিপাবলিকগুলো থেকে ভিন্ন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে তারা স্বাধীন দেশ ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক কাঠামোয় তাদের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছিল জার্মান-সোভিয়েত ষড়যন্ত্রের কারণে। ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানি একে অপরের বিরুদ্ধে আগ্রাসন না করার একটি গোপন শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। সেই চুক্তিকে দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নামানুসারে বলা হয় মলোটভ-রিবেনথ্রপ চুক্তি। চুক্তিতে তিনটি বাল্টিক রিপাবলিককে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব-বলয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে পোল্যান্ডের অর্ধেকের ওপর দেওয়া হয়েছিল জার্মান স্বার্থের স্বীকৃতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে জার্মানি কালবিলম্ব না করে পোল্যান্ড দখল করে নেয়। তারপর আক্রমণ করে এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া ও লাটভিয়া। যুদ্ধ যখন শেষের দিকে তখন সোভিয়েত রেড আর্মি ওই তিনটি বাল্টিক দেশ দখল করে নেয়। সেভাবেই তারা সোভিয়েত ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ক্যাফের কাছাকাছি চলে এসেছি। আলাপ চলাকালে বেশ ভালোই বুঝতে পারি তাদের মধ্যে সোভিয়েত বিরোধিতা কত তীব্র ও গভীর। প্রায় প্রত্যেকে সোভিয়েত শাসনকে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ববাদ বলে মনে করে।

বন্ধুদের সঙ্গে আলাপকালে একজন আমাকে ডেকে নিল। বলল, 'চলো একটু দূরে যাই। জানো তো ভিলনুসকে জার্মান কবি গ্যেটে ইতালির শহর ভেনিসের সঙ্গে তুলনা করেছিল। আর নেপোলিয়ন তাকে বলত, "উত্তরের জেরুজালেম"। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে এখানে ইহুদিদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল বলে। কিন্তু শহরটি আগের মতো নেই। আগের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে সোভিয়েত শাসনের কারণে।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, যেটুকু দেখলাম তাতে তো চোখ জুড়িয়ে যায়। এই তোমাদের নদী নেরিস। কি অপূর্বভাবে বয়ে চলেছে একেবারে ভিলনুস শহরের বুক ভেদ করে। আর তোমাদের 'গেট অব ডন'। সেখানে যে চার্চটা একটু আগে ঘুরে এসেছি সেটি তো অপূর্ব এক কীর্তি। তাকে নিয়ে শুনেছি নানা কল্পকাহিনি আছে। শুনেছি ১৭০৩ সালে সুইডেন যখন তোমাদের দেশ আক্রমণ করল তখন নাকি মা মেরির কল্যাণে এই গেট অব ডনের বিশাল গেট ভেঙে পড়েছিল সুইডিশ সৈন্যদের ওপর।

এদিকে বাকি সব বন্ধু আমাদের খোঁজ করছে। দেখি ওদিক তাকিয়ে ব্যাগ থেকে অতি ধীর হাতে সে একটি বড় কাগজ বের করল। বলল, 'দেখো তো কিছু বুঝতে পারো কি না?' কাগজটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছি। দেখি পেনসিলে আঁকা একটি মানুষের মুখ। নানা ধরনের ছোটখাটো আঁচড়। মানুষের চেহারাটা খুব যে বোঝা যায় তা না। কিন্তু যতটুকু বোঝা যায় তাতে দেখি চেহারার ওপর পড়েছে

উদ্বেগ, হিংস্রতা এবং ভীতি। এক জাতীয় ইমপ্রেশনিস্ট ঢঙে আঁকা মানুষের মনের গভীর দিকটি তার আচ্ছাদন থেকে সরিয়ে দেখার প্রয়াস। কিছুক্ষণ ছবির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটি কি বিশেষ কারও ছবি?' বলল, 'না। আমার প্রতিকৃতি। দেখছ না কী ক্লান্তি এই চেহারায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি? সোভিয়েত শাসনে তোমাকে হলফ করে বলতে পারি আমার চেনা অনেকেই এভাবে কষ্ট পাচ্ছে। আমরা আমাদের জাতিপরিচয় হারিয়েছি। আমরা এখন কেউ না।' কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলাম। ইতিহাসের ক্লাসে প্রফেসরের মুখে শুনেছি বাল্টিক অঞ্চলের মানুষেরা কত সুখী। অথচ এখানে এসে শুনি একেবারে ভিন্ন কথা। বিয়ারের বোতল থেকে আর এক ঢোঁক গিলে বন্ধু বলল, 'আমি পালানোর পথ বের করেছি। কোনো দূতাবাসে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইব ভাবছি।' বললাম, 'বিপদ ডেকে এনো না। শেষে জেলে পচতে হবে।' সে কোনো কথা বলল না। বিদায় নেওয়ার সময় ছবিটি আমার হাতে তুলে দিয়ে কেবল বলল, 'এটা তোমাকে দিলাম আমার উপহার হিসেবে।' তার দেওয়া ছবিটি অনেক দিন সঙ্গে রেখেছি। কিন্তু কখন যে সেটি হারিয়ে গেছে জানি না।

ইতিমধ্যে বেশ রাত হয়ে গেছে। বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। ভাবি বাকি দুটো রিপাবলিক ভিলনুস থেকে খুব যে ভিন্ন হবে তা না। মনে হলো সোভিয়েত প্রচার এবং বিপ্লবের মর্মবাণীর মধ্যে কত গভীর বিভেদরেখা। তিনটি বাল্টিক রিপাবলিক কার্যত ছিল সোভিয়েতের উপনিবেশ। বিপ্লবের সমতার বাণী জাতিগত সমতা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। সেটি আর কোনো রাখঢাক ব্যাপার না।

দুই বছর পরের কথা। এবার সাইবেরিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে ভ্রমণে নয়। কাজে। যাকে বলে কায়িক পরিশ্রম। ভাবলাম কাজের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং প্রত্যন্ত সোভিয়েত এলাকা সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার এটি হচ্ছে মোক্ষম সুযোগ। তা ছাড়া রয়েছে বাড়তি উপার্জনের সম্ভাবনা। যে সময়ের কথা বলছি সে সময় সোভিয়েত সরকার বাইকাল-আমুর মূল ট্রেন লাইন নির্মাণের মহা উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিদিন টেলিভিশনের খবরে তার নানা অগ্রগতির বর্ণনা দেখি। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না। সেখানে আমি যাব দুই মাসের জন্য একটি ছাত্র ব্রিগেডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। সোভিয়েত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা গ্রীষ্মের ছুটিতে এ ধরনের কাজে যোগ দেয়। আমাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে সিমিগোরস্ক নামের একটি স্থান। জায়গাটি দক্ষিণ-পূর্ব সাইবেরিয়ার ইরকুটস্ক এলাকার একটু উত্তর-পশ্চিমে। এখানে বয়ে গেছে আঙ্গারা লেনা এবং তুঙ্গুস্কা নামের নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখা। সেখানে পৌঁছাতে গেলে প্রথমে মস্কো থেকে প্লেনে করে যেতে হয় নভোসিবিরস্ক। তারপর ট্রেনে চেপে সিমিগরস্ক। ট্রেনে ২ হাজার কিলোমিটার পথ। অতিক্রম করতে আমাদের সময় লাগল ২৫ ঘণ্টা। সিমিগরস্ক এসে

পৌঁছালাম ভোরে। স্টেশন থেকে বাসে করে দুই কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছালাম গন্তব্যস্থানে।

তুঙ্গুস্কা নদীর একটি শাখা এই শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। তারই ধারে ৪০ সদস্যের ব্রিগেডটির বাসস্থান। বাসস্থান বলতে বিশাল দুটি তাঁবু। প্রতিটিতে ২০ জন করে। টয়লেট আছে। কিন্তু গোসল বা হাত-মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা নদীর জলে। ছাত্র ব্রিগেডের জীবন অনেকটা মিলিটারি ধাঁচের। তারপর দিনের কাজ চলবে সন্ধ্যা পর্যন্ত। মধ্যখানে স্বল্প বিরতি। ফলে খুব ভোরে ওঠার নিয়ম। নদীতে গিয়ে দেখি বরফের আবরণে ঢাকা পড়ে আছে নদীর জল। জলে হাত দিতেই বরফের আবরণ তার অবগুণ্ঠন সরিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। সকালের প্রাতরাশ শেষে কঠোর পরিশ্রমের শুরু। ইস্পাতের পাত তুলে বসাতে হবে স্লিপারের ওপর। সেই সঙ্গে আছে সঠিক মাপজোক রক্ষার ব্যাপার। মোটা মোটা পেরেক গেঁথে রেললাইনের পাতের বাঁধুনিকে শক্ত করার কাজ আমাদের। এই কাজ ধরাবাঁধা নিয়মে চলে। ফলে দেখতে দেখতে কেটে গেল দুই মাস। সাক্ষাৎ হলো বহু মানুষের সঙ্গে, যারা রেললাইন নির্মাণের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছে রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। তবে কাজের ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ করেছি নানা ধরনের অব্যবস্থা। যন্ত্রপাতি নেই। অপেক্ষা করো দিনের পর দিন। ৬০ কিলোমিটার যেয়ে আনতে হবে নানা ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। যেসব স্থানীয় শ্রমিক আমাদের সঙ্গে কাজ করে তারা আসে, মদ্যপান করে। তাদের নিয়ে নানা ঝামেলা। কাজে মন নেই। কোনো রকম সময় কাটিয়ে ঘরে ফেরা। ফলে আমাদের সময় যখন শেষ হলো তখন দেখি কাজ তেমন এগোয়নি। মানুষের মধ্যে লক্ষ করেছি অনুপ্রেরণার অভাববোধ। কাজের ক্ষেত্রেই বলি বা জীবনের অন্য আরও কোনো ক্ষেত্রে। অবশ্য সে সঙ্গে উপভোগ করেছি মানুষের সরলতা। তাদের আতিথেয়তা এবং ন্যূনতম চাহিদা পূরণের তৃপ্তি নিয়ে আনন্দ পাওয়া। আবার দেখেছি পশ্চিমা পণ্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণবোধ, সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রতি ক্ষোভ।

তবে যে বাসনাকে দীর্ঘকাল ধরে আমার প্রবাস-জীবনে আমি লালন করে রেখেছিলাম সেটি বাস্তবে ঘটল ১৯৭৯ সালে। মধ্য এশিয়ার বেশ কয়েকটি রিপাবলিকে পঁচিশ দিনের ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগ। মধ্য এশীয় রিপাবলিকগুলো বহু আগে থেকে রুশ সাম্রাজ্যের অধীনে। সেটি তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার একটি কারণ। অন্যটি হচ্ছে ধর্ম। সোভিয়েত ব্যবস্থায় ইসলাম ধর্মের অবস্থান কী, সেটিও দেখার ইচ্ছা ছিল। প্রায় ১০০ জন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে মিলে আমার যাত্রা শুরু হলো। প্রথমে আজারবাইজানের রাজধানী বাকু শহর। সেখান থেকে চারটি বাসে করে উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, কিরগিজিয়া দেখা। সব শহরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজের হোস্টেলে।

আজারবাইজানে দেখলাম বাকু, সুমগাইট, গাঞ্জা, সাকি শহরগুলো। উজবেকিস্তানে তাসখন্দ ও সমরখন্দ। কাজাখস্তানে বিসকেক, অশ কারাকুল, বেস্টর পাহাড়, খান তেংরি, লেনিন চূড়া আর কিরগিজে ফ্রুঞ্জে শহর। শহর ছাড়াও বেশ কয়েকটি সোভিয়েত স্টাইলের যৌথ খামার প্রকল্প (কালখোজ ও সাবখোজ) দেখা এবং কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া এই সফরে অন্তর্ভুক্ত। বাকুতে পৌঁছে এক সন্ধ্যায় একটি রেস্তোরাঁয় পরিচয় হলো স্থানীয় এক ছাত্রের সঙ্গে। তাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি। দেখি সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপারে সে বেশ খ্যাপা। বলল, 'জানো তো আজারবাইজান তেলের জন্য বিখ্যাত। এই তেলের জন্য এখানে গণহত্যা হয়েছিল। তাকে আমরা বলি মার্চ গণহত্যা। সেটি ঘটেছিল ৩০ মার্চ, ১৯১৮ সালে। সেই সময়ে বারো হাজার আজারবাইজানি মুসলিমের মৃত্যু হয়েছিল। বিপ্লবের পরপরই লেনিন বলেছিল বাকুর তেল ছাড়া সোভিয়েত রাশিয়া টিকবে না। সে কারণে রেড আর্মি আজারবাইজান আক্রমণ করল। রুশ বিপ্লবের ঠিক আগে আজারবাইজান স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও ওই তেলের কারণে লেনিনের নির্দেশে আজারবাইজান আক্রমণ করা হয়েছিল। সে সূত্র ধরেই কিন্তু আমরা ১৯২০ সালে সোভিয়েত ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলাম।' একটু অবাকই হলাম। এ কথা কারও থেকে শুনিনি। ইতিহাসের ক্লাসেও না। আজারবাইজানের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক তো অনেক আগের বলে জানি। ১৮২৬-২৮ সালে পারস্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়া আজারবাইজানের কিছু অংশ দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু সম্পর্কের মূলে যে তেল সেটি এভাবে কখনো জানিনি।

মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক ও ভূকৌশলগত গুরুত্ব কতখানি সে তো জানি। অনেকে মধ্য এশিয়াকে বলতেন বিশ্বরাজনীতির 'রাউন্ড অ্যাবাউট'। অন্য কথায় বিশ্ব যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সিল্ক রুট সেকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সেটি মধ্য এশিয়ার ওপর দিয়ে গেছে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সেখানে বাণিজ্যের বিস্তার ঘটে বিপুল পরিসর নিয়ে। বিশ্বের নানা স্থান থেকে সেখানে এসেছে নানা ধরনের পণ্যসম্ভার নিয়ে ব্যবসায়ীর কারাভান। সম্পদের আকর্ষণে লাখ লাখ মানুষ পতঙ্গের মতো এসেছে নতুন জীবনের সন্ধানে। তারই পরিণতিতে এখানে দেখেছি নানা ধরনের সাম্রাজ্য বা খানাতের জন্ম হতে। পরাক্রমশালী শাসকের হাতে মানুষ এবং লোকালয় নিষ্পেষিত হয়েছে। লাখ লাখ মানুষ চেঙ্গিস খান অথবা তৈমুর লংয়ের মতো দুর্ধর্ষ সেনাপতি এবং রাষ্ট্রনায়কের অধীনে এসেছে। তাদের হাতে জীবন দিয়েছে। সে সময়ের বৃহৎ শক্তি রাশিয়া ও ইংল্যান্ডও জড়িয়ে পড়েছিল মধ্য এশিয়ার রাজনীতিতে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর দিকে রাশিয়ার জার মধ্য এশিয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন তাঁর দেশের তুলার চাহিদা মেটাতে। রাশিয়া মধ্য এশিয়ার কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিতে অটোমান

সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল নানা যুদ্ধে। অবশেষে ওই বিস্তীর্ণ অঞ্চল যেখানে জনসংখ্যার অধিকাংশ মুসলমান এবং জাতিগতভাবে তুর্কি, পশতুন, উজবেক বা তাতার, তারা রুশ সাম্রাজ্যের অধীনে এল।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু আরও বলল, 'বলশেভিক বিপ্লবের পর মধ্য এশিয়াকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রতিটি অঞ্চলকে রিপাবলিকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। আরও বলা হয়েছিল তারা যদি সোভিয়েত ব্যবস্থায় থাকতে না চায় তাহলে স্বাধীন হতে পারবে। কিন্তু এসব ছিল কথার কথা। রাশিয়ার মূল লক্ষ্য ছিল এখানকার তুলা। হয়তো জানো না ১৯২১ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত রাশিয়া নতুন অর্থনৈতিক নীতি চালু করেছিল। তার আওতায় মধ্য এশিয়ায় তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।' একটু থেমে আমার বন্ধু বলল, 'তবে সবচেয়ে বড় আঘাত আসে ১৯৩০ সালে। সে সময় কৃষিতে কালখোজ অথবা সাভখোজ নামের সমষ্টিবদ্ধ চাষব্যবস্থা চালু হয়। এতে করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকের জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। এর বিরুদ্ধে তারা বিক্ষোভ করে। কিন্তু বিক্ষোভ দমন করা হয়েছিল কঠোর হাতে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো রুশ অধিবাসীরা এসে স্থানীয় মানুষের চারণভূমি দখল করে নিয়েছিল। জানোই তো আমাদের মূল পেশা হচ্ছে পশুপালন। ফলে চারণভূমিকে চাষাবাদে এনে আমাদের জীবনে বড় ক্ষতি হয়ে গেল। এর বিরুদ্ধে সে সময় প্রতিবাদ হয়েছিল। কিন্তু রুশরা মধ্য এশিয়ার রিপাবলিকগুলোর কমিউনিস্ট পার্টিতেও পরিবর্তন আনল। নেতৃত্বে বসানো হলো রুশ নাগরিকদের। জীবনের বাকি দিকগুলোতেও রুশিকরণ হয়েছে।' আমি বললাম, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি তোমার নামে। তোমার নাম হচ্ছে করিম। কিন্তু সোভিয়েত ব্যবস্থায় হয়েছে করিমভ, যেটি রুশ নামের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।' বন্ধু একটু হাসল। মধ্য এশিয়ার বাকি রিপাবলিকগুলোতেও রুশ জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এখনো জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশের কাছাকাছি। জানি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পশ্চিম ফ্রন্টের আশপাশ এলাকা থেকে সোভিয়েত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো সরিয়ে আনা হয়েছিল মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন রাজধানীতে। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে দূরে রেখে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে পরিকল্পনাটা সে রকমই ছিল। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আরও এসেছিল বহু রুশ নাগরিক, যারা ওই সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তারা রাশিয়ায় ফিরে যায়নি। নতুন জীবন শুরু করেছে এখানে। ফলে মধ্য এশীয় রিপাবলিকগুলোতে রুশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় অতি দ্রুত। অবশ্য জনসংখ্যার জাতিগত কাঠামো বদলে দেওয়ার প্রচেষ্টা এখানেও সুপরিকল্পিতভাবে নেওয়া হয়েছিল বলে ধারণা করি।

উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে এসে পৌঁছালাম। আমাদের ট্যুর গাইডের নাম সলিমভ। বয়সে একেবারে তরুণ। কেবল মস্কোর ট্যুরিস্ট প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে

পাস করে বেরিয়েছে। হোস্টেলের লাউঞ্জে বসে তার সঙ্গে দু-চারটি কথা বলছি। সে বলল, 'বলশেভিক বিপ্লবের পর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরোধ কিন্তু গড়ে উঠেছিল এই তাসখন্দ শহরে। এখানকার মুসলিম সমাজ ছিল মধ্য এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে রক্ষণশীল।' আমি একটু অবাক হলাম। ভাবলাম, যে দেশে উলুগ বেগের মতো বিজ্ঞানীর জন্ম হয় সেখানে মানুষ রক্ষণশীল হয় কীভাবে! যা-ই হোক, সলিমভ বলল, 'মুসলমানরা বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। বিপ্লবের বিরুদ্ধে তারা গড়ে তুলেছিল সাদা আর্মি। সেটি এখানে 'বাস্মাচি' নামে পরিচিত। বুঝি কেবল উলুগ বেগের দেশ হিসেবে উজবেকিস্তানকে দেখলে ভুল হবে। তাসখন্দ ছিল রাশিয়ার জারের গুপ্তচর কেন্দ্র। মধ্য এশিয়ার ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে যে 'গ্রেট গেম' চলছিল সেই খেলায় গুপ্তচরের প্রধান ঘাঁটি ছিল এই শহরে। ১৯১৭ সালের ১৬-২০ এপ্রিলে এখানে তুর্কিস্তানের মুসলিমদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে মুসলমান সমাজ নামে একটি সংগঠন গড়ে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হয়েছিল। ভাবি ১২১৯ সালে চেঙ্গিস খান এই শহরকে ধ্বংস করেছিল ঠিকই। কিন্তু একইভাবে ১৮৬৫ সালে রুশ জেনারেল মিখায়েল চেমিয়ায়েভ জারের আদেশ অমান্য করে তাসখন্দ আক্রমণ করেছিল এবং শহরটির দখল নিতে হত্যা করেছিল অসংখ্য নারী ও পুরুষকে। সেই দুই দিনের যুদ্ধের পর শহরটি এল রুশদের হাতে। রুশ অর্থোডক্স চার্চের এক ধর্মগুরু যিশুর ক্রস হাতে নিয়ে শহরে ঢুকল। জার চেমিয়ায়েভকে সম্মান করে তার নাম দিল 'তাসখন্দের সিংহ'। কিন্তু উজবেক মুসলিম সমাজ তাকে দেখল একজন গণহত্যাকারী হিসেবে। ভাবি রুশ বিরোধিতার শেকড় এখানে কত গভীরে।

সমরখন্দ শহরে এলাম। শহরটি মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে পুরোনো এবং দুই ভাগে বিভক্ত। পুরোনো শহরে রয়েছে নানা ধরনের মাদ্রাসা। রয়েছে তৈমুর লংয়ের মাজার। নানা ধরনের তুর্কি গোত্র দীর্ঘকাল উজবেকিস্তান শাসন করেছে। শুনেছি খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৩ সালে আলেকজান্ডারও এই শহর আক্রমণ করেছিল। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে এই শহর ছিল তুর্কিদের অধীনে। অষ্টম শতাব্দীতে আরবরা এসে তার দখল নিল। ইরানিরা শাসন করেছিল নবম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত। চেঙ্গিস খানও এই শহর আক্রমণ করেছিল। দেখি পুরোনো শহরের ছয়টি গেট রয়েছে আর সব রাস্তা একটি কেন্দ্রে এসে সংযুক্ত হয়েছে। এখানে দেখতে গেলাম উলুগ বেগের তৈরি জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণকেন্দ্র। এটি তিনি ১৪২০ সালে নির্মাণ করেছিলেন। তৈমুর লংয়ের শাসনকালে উলুগ বেগ এখানে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন। সেই মাদ্রাসা পরবর্তী সময়ে পরিণত হয়েছিল জ্যোতির্বিদ্যার ওপর একটি নামকরা বিদ্যাপীঠে। উলুগ বেগ সেখানে বছর দিনক্ষণকে যেভাবে পরিমাপ করেছিলেন তার সঙ্গে আধুনিককালের হিসাবের তফাত মাত্র এক মিনিট বেশি। আমাদের গাইডকে বললাম, 'সবকিছু তো দেখলাম। কিন্তু

এখানে কি মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের ভিড় হয়?' সলিমভ বলল, 'কাল শুক্রবার। একটি মসজিদে নিয়ে যাব। নিজেই দেখবে।' পরের দিন উজবেকিস্তানে আমাদের সফরের শেষ দিন। দিনটি মুক্ত রাখা হয়েছে। নিজে কিছুদূর হেঁটে গেলাম বিবি খানম মসজিদে। দেখি দুপুর গড়াতেই মানুষের ভিড়। মাথায় টুপি। গায়ে চাদর। অজুর ব্যবস্থা আছে। সবকিছুই পরিপাটি করে সাজানো। মসজিদটি পুরোনো। অনেকটা আজেরি ঢঙে গড়া। আমিও অজু করে ঢুকলাম মসজিদের ভেতর। কয়েক শ মানুষ মওলানা সাহেবের খুতবা শুনছে। রুশ ভাষায় কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সবকিছু ঠিক আছে?' কেউ তেমন কথা বলল না। কেবল খুশি হলো এটুকু শুনে যে আমার দেশ বাংলাদেশ এবং আমি একজন মুসলমান।

চার

আমাদের সফরের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। কিরগিজ রিপাবলিকের রাজধানী ফ্রুঞ্জে শহরটি দেখা বাকি। কিন্তু তার আগে যাব আলা তু পর্বতমালায়। সেখানে থাকব চার দিন। স্থানটি ফ্রুঞ্জে শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে। এটি তিয়ানশান পর্বতমালারই একটি অংশ। সেখানেই রয়েছে বিখ্যাত আলা আরচা ন্যাশনাল পার্ক। ফ্রুঞ্জে শহরের নাম লেনিনের বিশ্বস্ত এক কমরেড মিখায়েল ফ্রুঞ্জের নামানুসারে রাখা হয়েছিল। আমাদের বাস ফ্রুঞ্জে শহর ত্যাগ করে চলেছে ওই পর্বতমালার দিকে। দেখি গ্রীষ্মকাল সত্ত্বেও বেশ শীত। পর্বতের সাদা চূড়ায় বরফ জমা। চূড়ার দিকে যতই এগিয়ে যাই ততই ভাবি অক্টোবর বিপ্লবের কথা। ওই পর্বতশৃঙ্গ কেন জানি আমার কাছে প্রতিভাত হলো রূপক হিসেবে। ভাবি সারা বিশ্বে কী আলোড়ন সৃষ্টিই না করেছিল সেই বিপ্লব। ঠিক ওই পাহাড়ের চূড়ার মতো উঁচু এবং বিশাল মূর্তির গুরুগম্ভীরতা নিয়ে আশান্বিত এক পৃথিবীর জন্ম দিয়েছিল। সব সত্ত্বেও বিশ্বের সাধারণ মানুষ তারই মধ্যে দেখেছিল আশার আলো—শোষণের যুগ শেষ হবে। বুক বেঁধেছিল। জীবন দিয়েছিল। আমার চাচার মতো আরও অনেক বিপ্লবী জীবনের সবকিছু বাজি ধরে দাঁড়িয়েছিল ওই বিপ্লবের পেছনে। জানি সেই বিপ্লবের পথ মসৃণ ছিল না। নানা প্রতিবন্ধকতা এসে দাঁড়িয়েছিল তার পথ আগলে। বিপ্লবের পরপরই পার হতে হয়েছিল পশ্চিমা বিশ্বের প্ররোচিত শ্বেত প্রতিবিপ্লবীদের আগ্রাসন। যেতে হয়েছিল তিরিশের দশকে বিশ্বব্যাপী মন্দার মধ্য দিয়ে। ফ্যাসিবাদের কালো শক্তিকে অসীম সাহসিকতা দেখিয়ে মোকাবিলা করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল তার দুই কোটি সন্তান। সত্তর দশকে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা পার হতে হয়েছিল। সোভিয়েত সমাজকে মুক্ত করেছিল সামন্তবাদী জারতন্ত্রের পশ্চাৎপদতা থেকে। স্বল্প সময়ের মধ্যে শিল্পায়ন এবং আধুনিকায়নের বিপুল সম্ভার সাজিয়ে এগিয়ে গেল দেশটি। নানা ক্ষেত্রে পাল্লা দিয়ে পুঁজিবাদী বিশ্বের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার পশ্চিমা মিত্রদেশগুলোকে

পেছনে ফেলল। মহাকাশ অভিযানে যোগ করল নতুন মাত্রা।

দুঃখজনক হলেও ওই পর্বতশৃঙ্গের মতো রুশ বিপ্লবের দেহে ইতিমধ্যে বরফ জমতে শুরু করেছে। ১৯৮২ সালে সোভিয়েতে লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফিরেছি। দেখতে দেখতে ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাস এসে গেল। বুঝতেই পারি সময়টা সোভিয়েত কমিউনিস্ট সরকারের জন্য ভালো যাচ্ছে না। আফগান যুদ্ধে পরাজিত রুশ সৈন্যরা দেশে ফিরেছে। অর্থনীতি সংকটের মুখে। জনমনে তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ। গণতন্ত্রের আন্দোলন ধীরে হলেও দানা বাঁধছে। মানুষ চায় নির্বাচন। চায় মুক্তবাজার অর্থনীতি। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মিখায়েল গর্বাচভ সেটি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন গ্লাসনস্তের কথা। গণতন্ত্রের কথা। পেরেস্ত্রোইকার কথা। অর্থনীতি পুনর্গঠনের কথা। বোঝাই যাচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির শাসন শেষ হওয়ার পথে। এমন সময় এল এক আকস্মিক ঘোষণা। ৯ নভেম্বর পূর্ব জার্মানির সরকার ঘোষণা করল তাদের নাগরিকদের পশ্চিম জার্মানি যেতে বাধা নেই। ঘোষণার পরপরই শুরু হলো বার্লিন দেয়ালকে ঘিরে মানুষের জমায়েত ও উত্তেজনা। দেয়ালের একদিকে পূর্ব বার্লিনের মানুষ। উল্টোদিকে পশ্চিম বার্লিনের। উভয়ে মিলে ভাঙতে শুরু করল দেয়াল। ১৪০ কিলোমিটার লম্বা দেয়ালের প্রতীকী ধ্বংস সেদিন সমাপ্ত হলো। বাকি থাকল তার বস্তুগত অপসারণ। যে দেয়াল ১৯৬১ সাল থেকে মার্কিন-সোভিয়েত শীতল যুদ্ধের প্রতীক হয়ে ছিল, তার সমাপ্তি এখন কেবল সময়ের ব্যাপার। দেয়াল ভাঙার কাজ শুরু হলো ১৯৯০ সালের ১৩ জুন। শেষ হলো দুই বছর পর, ১৯৯২ সালে। সেই সঙ্গে ধসে পড়ল সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা। শেষ হলো বিশ্ব ইতিহাসে মানবিক সমাজ বিনির্মাণের সবচেয়ে বড় প্রয়াস?

জানি বলশেভিক বিপ্লবের সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা শেষ হয়নি। তার কারণ খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া আজও চলমান। কিন্তু কয়েকটি দিক তো ইতিমধ্যে স্পষ্ট। কমিউনিস্ট পার্টি কীভাবে আমলাতান্ত্রিক এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো সেটি দেখার বিষয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা কেন নিষ্পেষিত হলো ওই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, সেটি নিয়েও ভাবতে হবে। লোভ-লালসা, সম্পদ কুক্ষিগত করার মতো প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিগুলোর সঙ্গে সমষ্টি স্বার্থের সমন্বয় কীভাবে সম্ভব, সেটিও দেখার বিষয়। দেখার বিষয় কমিউনিস্ট আদর্শকে। একই আদর্শের চারপাশে যেসব নক্ষত্রের জন্ম হয়েছিল সেই বৈচিত্র্যময় আদর্শের জায়গায় সংকীর্ণ একপেশে সমাজতত্ত্ব গড়ে উঠল কীভাবে? কেন গ্রামসির তত্ত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা গেল না সমাজতন্ত্রের মূলধারায়? কেন আরও সব বিপ্লবীকে দেখা হলো প্রতিবিপ্লবী হিসেবে? কেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ বিরোধ তীব্র হলো? কেন ধর্মের প্রশ্নে সহনশীল নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব হলো না? এ ধরনের প্রশ্নসহ আরও রয়েছে হাজার প্রশ্ন, যার উত্তর খুঁজতে চাই। কমিউনিস্ট নীতিমালাকে আদর্শ হিসেবেই আমি দেখি।

রাজনীতি ও সাহিত্য

লেনিনের সাহিত্যপ্রেম ও রুশ বিপ্লব

তারিক আলি

সোভিয়েত ইউনিয়নের জনক লেনিনের একটি লাতিন দিকও ছিল। গ্যেটে ছিল তাঁর কাছে পূজনীয়। তাঁর শত্রুদের তিনি উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করতে পছন্দ করতেন।

রাশিয়ার রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর সাহিত্যের প্রভাব ছিল। এর মধ্যেই ভ্লাদিমির ইলিয়াচ লেনিন বেড়ে উঠেছেন। জার শাসনের অধীনে প্রকাশ্য রাজনৈতিক লেখাজোখা প্রকাশ করা কঠিন ছিল। প্রাবন্ধিকদের 'আরোগ্য লাভ' না হওয়া পর্যন্ত আশ্রয়কেন্দ্রে লুকিয়ে থাকতে হতো; অন্যভাবে বলতে গেলে, যতক্ষণ পর্যন্ত জনসমক্ষে তাঁদের মতামত পরিত্যাগ না করা হতো, ততক্ষণ রেহাই ছিল না। তবে এসবের মধ্যেও উপন্যাস ও কবিতা কিছুটা নরম দৃষ্টিতে দেখা হতো, যদিও সব ক্ষেত্রে নয়।

স্বাভাবিকভাবেই মুখ্য সেন্সর ছিল জার। 'জনগণের পিতা' পুশকিনের কবিতা প্রকাশের আগে প্রথম নিকোলাস অনেক কবিতা না পড়ে ছাপতে দেননি। ফলে কিছু কবিতা নিষিদ্ধ হয়েছিল, কিছু বিলম্বিত করা হয়েছিল এবং সবচেয়ে আক্রমনাত্মক কবিতাগুলো ভয়ার্ত লেখক নিজে ধ্বংস করে দেন এই ভয়ে যে তাঁর বাড়িতে আক্রমণ হতে পারে। *ইউজিন ওনেজিন*-এর পুড়িয়ে ফেলা চরণগুলোয় কী ছিল, তা আমরা কখনোই জানতে পারব না।

এতৎসত্ত্বেও, ভিন্ন অর্থে রাজনীতি এবং বিভিন্ন বৈচিত্র্য রাশিয়ার ফিকশনকে এমনভাবে বিহ্বল করেছিল, যা অন্য কোনো ইউরোপীয় দেশের বিচারে ছিল অতুলনীয়। রাজনৈতিক সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনা যতটুকু করা যেত, তাতে রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের জন্য বাছাই করার অনেক বিকল্প ছিল। তাঁরা শক্তিশালী সমালোচক ভিসারিয়ন বেলিনস্কি এবং নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক নিকোলাই গোগোলের

● অনুবাদ : **খলিলউল্লাহ্**

মধ্যকার তিক্ত দ্বন্দ্ব গোগ্রাসে গিলতেন। গোগোলের ১৮৪২ সালের প্রখর বিদ্রূপাত্মক *ডেড সোলস* পুরো দেশকে চাঙা করেছিল। অজ্ঞরজ্ঞানহীনদেরও সশব্দে পড়ে শোনানো হতো।

যা হোক, সাফল্যই গোগোলের সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে একটি লেখায় তিনি দুর্গন্ধপীড়িত কৃষক ও অশিক্ষাকে প্রতিহত করা বিষয়ে লেখা প্রত্যাহার করেছিলেন। *ডেড সোলস*-এর দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'এই বইয়ের অনেক কিছুই ভুল করে লেখা হয়েছে। এগুলো আসলে রাশিয়ায় ঘটছে না। প্রিয় পাঠক, আপনারা আমাকে সংশোধন করে দিন। এই বিষয়টি এড়িয়ে যাবেন না। আমি চাই আপনারা আমাকে সংশোধন করুন।'

ক্ষুব্ধ বেলনস্কি ১৮৪৭ সালে জনসমক্ষে গোগোলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। বেলনস্কির ব্যাপকভাবে প্রচারিত 'লেটার টু গোগোল'-এর গ্রহীতা দীর্ঘ নিদ্রাহীন রাত পার করেছিল :

> রাশিয়ার জনগণ সম্পর্কে আমি খুব কমই জানি। আপনার বই আমাকে আতঙ্কিত করেছে, কারণ এই বই সরকার ও সেন্সরশিপের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা তৈরি করেছে, জনগণের ওপর নয়। সরকার আপনার বই (বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগের নির্বাচিত অনুচ্ছেদগুলো) হাজার হাজার কপি প্রকাশ করবে এবং খুবই কম দামে তা বিক্রি করবে বলে যখন সেন্ট পিটার্সবার্গে গুজব ছড়ানো হয়েছিল, তখন আমার বন্ধুরা হতাশ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমি তাদের তখনই বলেছিলাম যে সবকিছু সত্ত্বেও এই বই সাফল্য পাবে না এবং খুব শিগগির তা বিস্মৃত হবে। বস্তুত, বই সম্পর্কে যেসব নিবন্ধ লেখা হয়েছে তা বইয়ের চেয়ে এখন বেশি স্মরণ করা হয়। হ্যাঁ, যদিও এখনো অপরিণত, তবুও রুশদের সত্যের ব্যাপারে একটি গভীর প্রবৃত্তি রয়েছে।

পরবর্তী সময়ে সমালোচকেরা আরও বেশি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করা শুরু করেছিল। কোনো ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের কাজকে তারা তত বেশি প্রভাবশালী মনে না করলে নিন্দা করতে দ্বিধা করত না।

লেনিন এ রকমই একটা বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। তাঁর বাবা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত সংরক্ষণপ্রবণ ব্যক্তি এবং তাঁর এলাকার বিদ্যালয়গুলোর প্রধান পরিদর্শক। তিনি একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। বাড়িতে রোববার বিকেল করে শেক্সপিয়ার, গ্যেটে, পুশকিনসহ অন্যদের সাহিত্য সশব্দে পড়া হতো। ইউলিয়ানভ পরিবারের (জার গোপন পুলিশের চোখে ধুলা দিতে 'লেনিন' নামটি ছদ্মনাম হিসেবে গ্রহণ করেছিল) জন্য উচ্চ সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকা ছিল অসম্ভব।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসে লেনিন লাতিন ভাষার প্রেমে পড়ে যান। লেনিনের প্রধান শিক্ষকের অনেক উচ্চাশা ছিল যে তিনি একদিন ভাষাবিজ্ঞানী ও লাতিন ভাষার পণ্ডিত হবেন। তবে ইতিহাসের অভিলাষ ছিল ভিন্ন। কিন্তু লাতিনের প্রতি লেনিনের আসক্তি এবং ধ্রুপদির প্রতি অভিরুচি কখনোই তাঁকে ছেড়ে যায়নি। ভার্জিল, ওভিড, হোরাস

ও জুভেনাল তিনি উৎপত্তি ভাষায়ই পড়েছেন। রোমান সিনেটের ভাষণও তিনি পড়েছেন। দুই বছর নির্বাসনে থাকার সময়ে তিনি গ্যেটের সাহিত্য গোগ্রাসে গিলেছেন। *ফস্ট* তিনি বারবার পড়েছেন।

লেনিন এমন সময়ে তাঁর ধ্রুপদি জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করেছেন যখন ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব ধাবমান। সে বছরের এপ্রিল মাসে তিনি রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক অর্থোডক্সির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং এক গাদা চরমভাবাপন্ন তত্ত্ব দিয়ে রাশিয়ায় একটি সামাজিক বিপ্লবের ডাক দেন। লেনিনের নিজের বেশ ঘনিষ্ঠ কিছু কমরেড তাঁর নিন্দা করেন। ক্ষিপ্র প্রত্যাঘাতে লেনিন গ্যেটের শ্রেষ্ঠ কাজ *মিফিস্টোফিলিস* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'হে বন্ধু, তত্ত্ব হলো ধূসর, কিন্তু সবুজ হলো জীবনের শাশ্বত বৃক্ষ।'

ধ্রুপদি রুশ সাহিত্য যে সব সময় রাজনীতির সঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট ছিল তা অন্যদের চেয়ে লেনিন ভালো জানতেন। এমনকি সবচেয়ে 'অরাজনৈতিক' লেখকদের জন্যও দেশের অবস্থার ব্যাপারে ঘৃণা লুকানো কঠিন ছিল। ইভান গঞ্চারভের উপন্যাস *অব্লোমভ* এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ। লেনিন এই উপন্যাসকে ভালোবাসতেন। এখানে বিষয়ী ভদ্র সম্প্রদায়ের নির্জীবতা, শ্রমবিমুখতা ও শূন্যতার চিত্র রয়েছে। এই বইয়ের সাফল্যের কারণে রুশ শব্দকোষে একটি নতুন শব্দ সংযুক্ত হয়: অব্লোমভিজম। স্বৈরতন্ত্রকে যে শ্রেণি এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত টিকে থাকতে সাহায্য করেছে, তাদের নেতিবাচক অর্থে বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহার করা হতো। পরবর্তী সময়ে লেনিন বলেছেন যে এই রোগ শুধু উচ্চশ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং জার আমলাতন্ত্রের একটি বড় অংশকে অব্লোমভিজম আক্রান্ত করেছিল এবং আরও নিচের শ্রেণিতেও ধাবিত হয়েছিল। এমনকি বলশেভিক সদস্যরাও এই রোগ থেকে মুক্ত ছিল না। এই উদাহরণ থেকে দেখা যায় গঞ্চারভ যে দর্পণ উঁচিয়ে ধরেছিলেন তাতে সমাজের বহুলাংশই প্রতিফলিত হয়েছিল। লেনিন তাঁর তর্কে প্রায়ই বিরোধী পক্ষকে আক্রমণ করতেন রাশিয়ার কল্পকাহিনির সর্বদা অখুশি চরিত্র এবং মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করার মাধ্যমে।

শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতা থেকে হটানোর পদ্ধতির ব্যাপারে লেখকদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। মতবিরোধ অবশ্য শুধু লেখকদের মধ্যেই না, অন্যদের মধ্যেও ছিল। প্রথম নিকোলাসের ক্ষমতায় আসীন হওয়ার বিরুদ্ধে ১৮২৫ সালে গড়ে ওঠা ডিসেম্ব্রিস্ট বিদ্রোহকে পুশকিন সমর্থন করেছিলেন। গোগোল সামন্তবাদের অত্যাচারকে বিদ্রূপ করেছিলেন, যদিও পরে দ্রুত পিছু হটেন। তুর্গেনিভ জারদের সম্পর্কে সমালোচনামুখর ছিলেন, কিন্তু সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেওয়া ধ্বংসবাদীদের প্রচণ্ড রকম অপছন্দ করতেন। সেন্ট পিটার্সবার্গে একটি ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নৈরাজ্য-সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে দস্তয়েভস্কির প্রণয় ঠিক বিপরীত রূপে পরিণত হয়েছিল। রুশ স্বৈরতন্ত্রের প্রতি তলস্তয়ের আক্রমণে লেনিন খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অতীন্দ্রিয়বাদী খ্রিষ্টধর্ম ও

শান্তিবাদে লেনিন নিরাসক্ত হয়ে পড়েন। সে জন্য লেনিন প্রশ্ন করেন, কীভাবে এমন একজন প্রতিভাধর লেখক একই সঙ্গে বিপ্লবী আবার প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারেন? লেনিন আধা ডজন নিবন্ধের মাধ্যমে তলস্তয়ের কাজের মধ্যে বিদ্যমান গভীর স্ববিরোধিতা উন্মোচন করেছেন। লেনিন যে তলস্তয়কে চিত্রিত করেছেন, তিনি একটি স্বচ্ছ রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম ছিলেন—তাঁর উপন্যাসে কৃষকদের অর্থনৈতিক শোষণ ও সামষ্টিক ক্ষোভ যেমন স্বীকৃত হয়েছে, তেমনি প্রকাশও পেয়েছে। কিন্তু তিনি রোগ প্রতিকারের কোনো পথ বাতলে দেননি। একটি সঠিক বিপ্লবী ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করে তলস্তয় সান্ত্বনা খুঁজেছেন একটি সরল, খ্রিষ্টীয় অতীতের অবাস্তব ছায়ায়। 'রুশ বিপ্লবের দর্পণ লিও তলস্তয়'-এ লেনিন লিখেছেন, 'তলস্তয়ের মতামত ও মতাদর্শের মধ্যে অসংগতি কোনো দৈবিক ঘটনা নয়, সেগুলো উনিশ শতকের শেষভাগে রুশ জীবনের স্ববিরোধী অবস্থাই প্রকাশ করে।' এভাবেই তলস্তয়ের স্ববিরোধিতা লেনিনের রাজনৈতিক বিশ্লেষণে কার্যকর পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে।

ইতিমধ্যে দস্তয়েভস্কির *কাল্ট অব সাফারিং* লেনিনকে বিরস করে ফেলেছে, যদিও দস্তয়েভস্কির লেখার ক্ষমতা ছিল অনস্বীকার্য। যা হোক, সাহিত্য বিষয়ে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত হয়নি। বিপ্লবের ঠিক এক বছরের কম সময়ের মধ্যে, ১৯১৮ সালের ২ আগস্ট, সংবাদপত্র *ইজভেস্তিয়া* বেশ কিছু ব্যক্তির নামের একটি তালিকা প্রকাশ করে। যাঁদের নামে স্মৃতিস্তম্ভ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল তাঁদের নামের তালিকা ছিল এটা। সেখানে তলস্তয়ের পরেই দস্তয়েভস্কির নাম ছিল। সে বছরের নভেম্বরে প্রতীকীবাদী কবি ভিচেস্লাভ ইভানভের শ্রদ্ধাঞ্জলির মাধ্যমে মস্কো সোভিয়েতের প্রতিনিধি সেই স্মৃতিস্তম্ভ মস্কোয় উন্মোচন করে।

সম্ভবত নিকোলাই চেরনিশেভস্কি লেখক হিসেবে লেনিনের ওপর সবচেয়ে গভীর প্রভাব রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি একটি পুরো বিপ্লবী প্রজন্মের ওপরই প্রভাব রেখেছিলেন। চেরনিশেভস্কির বাবা ছিলেন একজন ধর্মযাজক। এ ছাড়া তিনি একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ও সমাজতান্ত্রিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর কাল্পনিক উপন্যাস *হোয়াট ইজ টু বি ডান?* লিখেছিলেন সেন্ট পিটার্সবার্গের পিটার ও পল দুর্গে। এখানেই তাঁকে রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্য কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। *হোয়াট ইজ টু বি ডান?* একটি নতুন প্রজন্মের বাইবেলে পরিণত হয়েছিল। কারাগার থেকে গোপনে লেখা হয়েছিল বলে এই উপন্যাসের বাড়তি আকর্ষণ ছিল। মার্ক্সের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বহু আগেই চেরনিশেভস্কির এই বই লেনিনকে রাজনৈতিকভাবে চরমপন্থায় উৎসাহিত করেছিল (মার্ক্সের সঙ্গে চেরনিশেভস্কি চিঠি বিনিময় করেছেন)। সাবেক চরমপন্থী জনপ্রিয় লেখকের স্মরণে লেনিন তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কর্মের নাম দিয়েছিলেন *হোয়াট ইজ টু বি ডান?*। তিনি ১৯০২ সালে বইটি লেখেন। একই সালে তা প্রকাশিত হয়েছিল।

চেরনিশেভস্কির উপন্যাসের ব্যাপক সাফল্যে প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিকেরা যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বিশেষ করে তুর্গেনেভ ভয়ংকরভাবে চেরনিশেভস্কির বইকে আক্রমণ করেছিলেন। উগ্র সমালোচক দব্রলিউবভ ও পিছারেভ এই পিত্তজ্বালার জবাব দিয়েছিলেন জ্বলন্ত বিছুটির আঘাতের মাধ্যমে (দব্রলিউবভকে ছাত্ররা সম্বোধন করতেন 'আমাদের দিদেরোত' বলে)। তুর্গেনেভ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। একটি উন্মুক্ত অনুষ্ঠানে তিনি চেরনিশেভস্কির বিরোধিতা করতে গিয়ে চিৎকার করে বলেন, 'তুমি একটা সাপ, আর ওই দব্রলিউবভ একটি র‍্যাটল সাপ।'

যে উপন্যাস বিষয়ে এত বিতর্ক সেটা কী রকম? গত ৫০ বছরে আমি প্রতিটি পাতা পড়ার জন্য তিনবার চেষ্টা করেছি। তিনটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। এটা রুশ সাহিত্যের কোনো ধ্রুপদি নয়। এই উপন্যাস তার নিজের সময়ে ব্যাপ্ত ছিল এবং রুশ বুদ্ধিজীবী-মহলের সন্ত্রাস-পরবর্তী অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নিঃসন্দেহে এটা সব ক্ষেত্রেই খুব চরমভাবাপন্ন, বিশেষ করে লিঙ্গসমতা এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের জায়গায়। এ ছাড়া কীভাবে সংগ্রাম করতে হয়, শত্রুকে চিহ্নিত করা যায় এবং নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বাঁচতে হয়, সে ব্যাপারেও এই উপন্যাস চরমভাবাপন্ন। চেরনিশেভস্কিকে প্রচণ্ড অপছন্দ করতেন ভ্লাদিমির নাবোকভ, কিন্তু উপেক্ষা করতে পারেননি। নাবোকভ তাঁর শেষ রুশ উপন্যাস *দ্য গিফট*-এ ৫০ পাতা ব্যয় করেছিলেন চেরনিশেভস্কি এবং তাঁর পক্ষের ব্যক্তিদের তাচ্ছিল্য ও ব্যঙ্গ করে। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে 'খুব নিশ্চিতভাবেই সমসাময়িক উচ্চশ্রেণির লেখকদের মধ্যে নিম্নজাতের চেরনিশেভস্কির প্রতি শ্রেণিদাম্ভিকতার আভাস ছিল' এবং ব্যক্তিগতভাবে 'তলস্তয় ও তুর্গেনেভ তাকে "ছারপোকার গন্ধমাখা ভদ্রলোক" বলে ডাকতেন...এবং চেরনিশেভস্কিকে তাঁরা সব ধরনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই করেছেন। তাঁদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আংশিক ছিল ঈর্ষা থেকে, কারণ তাঁদের নাক-উঁচু স্বভাব তরুণদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। চেরনিশেভস্কি জমিদারি তালুক ধ্বংস করতে বিপ্লব করতে চেয়েছিলেন এবং সেসব ভূমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করতে চাচ্ছিলেন। তাই গভীর বদ্ধমূল রাজনৈতিক শত্রুতাও একটা কারণ, বিশেষ করে তুর্গেনেভের ক্ষেত্রে।

১৯০৫ থেকে ১৯১৭ সালের এই আন্তবিপ্লবের সময়ে লেনিন যখন নির্বাসনে ছিলেন, তখন তরুণ বলশেভিকরা তাঁকে দেখতে যেত। লেনিন সেসব তরুণের ওপর ক্ষুব্ধ হতেন যখন তারা চেরনিশেভস্কির বইকে বিদ্রূপ করে বলত যে এটা পড়ার উপযুক্ত নয়। লেনিন কড়া জবাবে বলতেন যে এই বইয়ের গভীরতা ও দূরদর্শিতা বোঝার মতো বয়স এদের হয়নি। তাদের উচিত বয়স ৪০ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। তখন তারা বুঝবে যে চেরনিশেভস্কির দর্শনের ভিত্তি খুবই সাদামাটা বিষয়: আমরা আদম-হাওয়া থেকে জন্ম নিইনি। আমরা বনমানুষের বংশধর; জীবন খুবই ছোট সময়ের জৈবিক প্রক্রিয়া, তাই সব মানুষের জন্য সুখ আনয়ন করা প্রয়োজন।

যে পৃথিবী লোভ, ঘৃণা, যুদ্ধ, অহমিকা ও শ্রেণি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেখানে তা কখনোই সম্ভব নয়। সে জন্যই একটা সামাজিক বিপ্লব প্রয়োজন। যে সময়ে তরুণ বলশেভিকরা লেনিনের সঙ্গে সুইস পর্বতমালায় আরোহণ করছিল তখন তাদের বয়স ৪০ ছুঁই-ছুঁই ছিল, তবে বিপ্লব তত দিনে ঘটে গেছে। এখন যেসব ইতিহাসবিদ লেনিনের চিন্তার বিবর্তন নিয়ে গবেষণা করছেন তাঁদেরই বেশি চেরনিশেভস্কি পড়তে হয়। বিজ্ঞ প্রগতিশীল দল খুশিমনে মায়াকোভস্কির প্রতি ঝুঁকেছে। কিন্তু লেনিন তা করেননি।

প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ লেনিনের খুব গভীরে প্রোথিত ছিল। ফলে যেসব উত্তেজনাকর শিল্প-সাহিত্য বিপ্লবের আগে এবং বিপ্লবকালে সৃষ্টি হয়েছিল তা লেনিনের ওপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। রাশিয়া বা অন্য কোথাও আধুনিকতাবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো তাঁর জন্য কঠিন ছিল। শিল্পসম্মত প্রগতির পুরোধা বা আভানগার্দ, যেমন মায়াকোভস্কি ও অন্য কনস্ট্রাক্টিভিস্টদের কাজ লেনিনের কাছে রুচিসম্মত ছিল না।

কবি ও শিল্পীরা নিরর্থক তাঁকে বলেছিলেন যে পুশকিন ও লারমনটোভের ভক্ত হলেও তারা বিপ্লবী। তারা পুরোনো শিল্পকে মানতে নারাজ। তারা এমন ভিন্ন ও নতুন কিছু সৃষ্টি করছে যা বলশেভিজম ও বিপ্লবী যুগের সঙ্গে মানানসই। কিন্তু লেনিন একদমই টলেননি। কবি-শিল্পীরা যা খুশি লিখতে-আঁকতে পারেন। কিন্তু তাকে কেন জোর করে সেসবের প্রশংসা করতে হবে? লেনিনের অনেক সহকর্মী নতুন আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। বুখারিন, লুনাচারস্কি, ক্রুপস্কায়া, কল্লোন্তাই এবং কিছুটা ট্রটস্কিও বুঝতে পেরেছিলেন যে বিপ্লবী স্ফুলিঙ্গ নতুন দৃশ্যের অবতারণা করেছিল। আভানগার্দের মধ্যেও দ্বন্দ্ব, দ্বিধা ও স্ববিরোধিতা ছিল। সরকারের মধ্যে আভানগার্দের সমর্থক ছিলেন আনাতোলি লুনাচারস্কি। তিনি ছিলেন শিক্ষাবিষয়ক গণবিভাগে। এই বিভাগে লেনিনের স্ত্রী নাদিয়া ক্রুপস্কায়াও কাজ করতেন। গৃহযুদ্ধ চলাকালীন কাগজের ঘাটতি ঘটায় তীব্র বাদানুবাদের জন্ম হয়। তাদের কি প্রচারণামূলক লিফলেট ছাপানো উচিত নাকি মায়াকোভস্কির নতুন কবিতা? লেনিন লিফলেট ছাপার পক্ষে ছিলেন। লুনাচারস্কি মনে করতেন মায়াকোভস্কির কবিতা অনেক বেশি কার্যকর হবে। শেষতক কবিতাই ছাপা হয়েছিল।

লেনিন 'প্রলেতেরিয়ান সাহিত্য ও শিল্প' ধারণার প্রতিও বিরূপ ছিলেন। তিনি মনে করতেন, বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে যে দেশে সংস্কৃতির অবস্থা এত নিম্নমানের, সেখানে যান্ত্রিক ও মৃত সূত্র দিয়ে বুর্জোয়া সংস্কৃতি এবং এর প্রাচীন পূর্বসূরির শিখর অতিক্রম করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে কোনো শর্টকাট পদ্ধতি কাজ করবে না। লেনিনের মৃত্যুর পরের খারাপ সময়গুলোতে এটা এক্সক্রিমেন্টাল 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীরা' তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করেছিলেন। সৃজনশীলতাকে অসার করে ফেলা হয়েছিল। প্রয়োজনের রাজ্য পেরিয়ে সবার জীবন যুক্তিবোধ দিয়ে গঠিত হবে—এমন এক মুক্তির রাজ্য সোভিয়েত ইউনিয়নে কখনো তৈরি হয়নি। সে অর্থে বললে, কোথাও তৈরি হয়নি।

রাজনৈতিক ইতিহাস

আমার পিতামহ আন্তোনিও গ্রামসি

আন্তোনিও গ্রামসি জুনিয়র

ভূমিকা

রাশিয়ায় গ্রামসির যে একটি পরিবার ছিল, এটা সবাই জানে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর এত দিন পরেও সেই পরিবারের কী পরিণতি হয়েছিল এবং তাঁর কারাবাসের আগে এবং কারাবাসের সময়ে সেই পরিবারের সঙ্গে কী সম্পর্ক ছিল, সে সম্পর্কে খুবই কম জানা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে সরকারি নথিপত্র আংশিক উন্মুক্ত হয়। এর ফলে গ্রামসির জীবনের এই দিকটির প্রতি আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। তথ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ উৎস হলো তাঁর নাতি আন্তোনিও। তিনি ১৯৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি এই লেখায় বর্ণনা করেছেন কীভাবে ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে ইতালি ভ্রমণের সময় তাঁর দাদার প্রতি তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। মস্কোতে নিজের বাড়ি ফিরে গিয়ে তিনি যে যে দলিল পেয়েছেন, তা সংগ্রহ করেছেন। এখানে মূলত সুগ্‌ত (Schucht) পরিবারের সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। জুলিয়া (১৮৯৬-১৯৮০) ছিলেন নিজে একজন বলশেভিক বিপ্লবী এবং গ্রামসির দুই সন্তানের জননী। তিনি সুগ্‌ত পরিবারের পাঁচ বোনের মধ্যে একজন। তাঁর এক বোন ইউজেনিয়া (১৮৮৯-১৯৭২) ছিলেন আরেক কমিউনিস্ট, যিনি রাশিয়ায় গ্রামসির আবেগে জুলিয়ার চেয়ে কিছু পূর্ববর্তী ছিলেন। আরেক বোন ছিলেন তানিয়া (১৮৮৭-১৯৪০), যিনি ইতালিতে গ্রামসির কারাবাসের সময় নিবেদিত সহায়তাকারী ছিলেন। আন্তোনিও গ্রামসি জুনিয়র তাঁর *লা স্তোরিয়া দি উনা ফ্যামিগলিয়া রিভোলুজিওনারিয়া* (২০১৪) বইয়ে জার শাসনের শেষ সময় থেকে বিখ্যাত সুগ্‌ত পরিবারের ইতিহাস পুনর্নির্মাণ করেছেন। লেনিন

● **অনুবাদক :** গোলাম মুস্তাফা

ছিলেন এই পরিবারের একজন বন্ধু। তিনি স্তালিন-পরবর্তী সময় পর্যন্ত অন্য আরেক বোনের কাছে গডফাদার ছিলেন। সে সময় দলে ইউজেনিয়াকে পুনরায় অন্তর্ভূক্ত করতে জুলিয়া ক্রুশ্চেভের কাছে আবেদন করতে বাধ্য হন। ইউজেনিয়া একসময় ক্রুপস্কায়ার সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সে সময় এই পরিবার অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং সবচেয়ে খারাপ সময় পার করছিল। গ্রামসির ছোট ছেলে জুলিয়ানো (১৯২৬-২০০৭) বলেছেন, সেই 'ট্র্যাজিক অত্যাচার ও স্বাভাবিক অবিশ্বাসের' সময়ও কর্তৃপক্ষ এই পরিবারকে কোনো ঝামেলায় ফেলেনি। এই দয়ার জন্য দলের নেতা তোগলিয়াত্তিকে, তিনি ধন্যবাদ দিতে চান। ইনি সেই একই তোগলিয়াত্তি যাঁর সম্পর্কে জুলিয়া অভিযোগ করেছেন যে এই ব্যক্তি তাঁর স্বামীর নোটবুকগুলোকে দলের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করত। তোগলিয়াত্তি গ্রামসির দুটি ছেলের মধ্যে একজনকে ইতালিতে ফেরত আনার চিন্তা আঁটছিল। এটাকে তোগলিয়াত্তি তাঁর দল এবং গ্রামসির মধ্যে ধারাবাহিকতার জীবন্ত নিদর্শন হিসেবে ধরে নিয়েছিল। গ্রামসির নাতি তাঁর বাবা ও চাচার মধ্যে বিপরীতমুখী চরিত্র ও পেশার ওপর আলোকপাত করেছেন। গ্রামসির এই দুই ছেলে হলেন জুলিয়ানো ও দেলিও (১৯২৪-১৯৮২)। গ্রামসি ও লেনিনের মধ্যে এই পর্যন্ত অপ্রকাশিত সাক্ষাতের বর্ণনা রয়েছে এই লেখায়। এখানে অনেক কিংবদন্তি যাঁরা গ্রামসির শেষ জীবন সম্পর্কে ঝটিকা মন্তব্য করেছেন, তাঁদের যুক্তি তিনি খণ্ডন করেছেন। তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন, এই খণ্ডন তিনি করেছেন শুধুই পরিবারের প্রতি আনুগত্য থেকে নয়, বরং রাজনৈতিক জাগরণ থেকে। এত দিন পর্যন্ত রাজনীতি নিয়ে উদাসীন থাকলেও সোভিয়েত-পরবর্তী ইয়েলৎসিন এবং পুতিনের শাসনামলে, রাশিয়ার বুদ্ধিজীবী ও জনজীবনে দুর্নীতির কারণে তাঁর মধ্যে এই বিরক্তির জন্ম হয়েছে। এসবের বিপরীতে এবং সবকিছুর ফলাফল সত্ত্বেও, তাঁর দাদার কাজ তাঁর জন্য জীবন্ত অনুপ্রেরণা।

আমার পিতামহ

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের আগে পর্যন্ত আমার কাছে আমার দাদা ছিলেন কিংবদন্তির মোড়কে একজন নিষ্প্রভ ব্যক্তি।[১] এর নেপথ্যের নায়ক ছিলেন আমার বাবা। আমার বাবা ছিলেন একজন মহা রোমান্টিক মানুষ। তিনি একাধারে মেধাবী সংগীতবিদ, সুরকার এবং শিল্প-ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন। তাঁর মূল আগ্রহের বিষয় ছিল ইতালীয় রেনেসাঁর শিল্প-ইতিহাস, সাহিত্য ও কবিতা। লিওপার্ডি ছিলেন তাঁর পছন্দের লেখক। মনে হতো আমার বাবা ধ্রুপদি বিষয়গুলোর মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করতেন। এসব বিষয়ের প্রতি তাঁর একধরনের স্বভাবগত টান ছিল; অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতিগুলোও এর একটি কারণ।

বিংশ শতাব্দীর নৃশংসতার তিনি একজন চাক্ষুষ সাক্ষী। এই সময়েই তিনি তাঁর বাবাকে হারান, যাকে তিনি খুব অনুভব করলেও কখনো কাছে পাননি। তাঁর শিক্ষা এবং সন্তানোচিত অভিজ্ঞতার কারণে তিনি রাজনীতি একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'রাজনীতি একেবারে বাজে জিনিস, তার [গ্রামসির] রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? তিনি তাঁর শিক্ষক বার্তোলির উপদেশ মেনে একজন ভাষাতাত্ত্বিক হতে পারতেন, ভাষাতত্ত্বে তো তিনি বেশ দখল দেখিয়েছিলেন।'[২] আমি মজা করে উত্তর দিতাম, 'তিনি [গ্রামসি] তা না করলে তো তুমি এখানে থাকতে না!'

তাঁর বড় ভাই দেলিও [গ্রামসির বড় ছেলে] ছিল একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি নৌবাহিনীর একজন কর্নেল এবং একই সঙ্গে ব্যালিস্টিক ইন্সট্রাক্টর ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্য ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। পারিবারিক চিঠিপত্র থেকে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে দেলিও যুদ্ধের সময় ইতালিতে গিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলনের একজন নেতা হওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন। তিনি ভবিষ্যতে ইতালীয় নৌবাহিনী তৈরিতে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদের পতনের পর ইতালি একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। অর্থাৎ, তাঁর বাবা যে কারণে জীবন দিয়েছেন, দেলিও সে পথে লড়তে চেয়েছিলেন। এই চিন্তাভাবনাগুলোর পেছনে সম্ভবত তোগলিয়াত্তি উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। তোগলিয়াত্তি আমাদের পরিবারকে নিয়মিত সাহায্য-সহযোগিতা করার পাশাপাশি এই সময়ে গ্রামসির বড় ছেলের [দেলিও] সঙ্গে নিয়মিত চিঠি চালাচালি করতেন।[৩] অনেক বছর পর চাচা আমাদের দেখতে আসেন। তখন মাঝে মাঝেই আমার বাবা ও চাচার মধ্যে তীব্র কথা-কাটাকাটি হতো। আমি ছিলাম এসব বাগ্‌বিতণ্ডার অনিচ্ছুক দর্শক। এই দুজন মানুষ পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলেন। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এসব বাগ্‌বিতণ্ডা শুনে আমার প্রায় কোনো লাভই হয়নি। ওই সময় আমার বয়স খুব কম ছিল (১৯৮২ সালে দেলিওর মৃত্যুর সময় আমার বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর)। রাজনীতির প্রতি আমার কোনো আগ্রহ ছিল না।

আমি প্রায়ই আমার মা-বাবার সঙ্গে আমার দাদি জুলিয়া সুগ্‌তকে দেখতে যেতাম। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি মস্কোর বাইরে পেরেদেলকিনোতে ওল্ড বলশেভিকদের জন্য নির্মিত একটি সেনেটোরিয়ামে থাকতেন। বিছানাবন্দী হলেও শেষ পর্যন্ত মানসিকভাবে তিনি বেশ শক্তপোক্ত ছিলেন। তাঁর ভালোবাসার মানুষ ও পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলো সম্পর্কে তিনি বেশ উৎসুক ছিলেন। তবে তিনি নিজ থেকে আমার দাদা সম্পর্কে কোনো কিছু বলেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। ইতালীয় আত্মীয়দের কাছে পাঠানো চিঠি ও সাক্ষাৎকার ব্যতীত তিনি কদাচিৎ

আমার দাদা সম্পর্কে কথা বলতেন। তিনি যখন আমাদের বাসায় থাকতেন, তখন তিনি এবং তাঁর বোন ইউজেনিয়া মিলে গ্রামসির ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী দিয়ে একটি জাদুঘরের মতো বানিয়েছিলেন। চার তাকের একটি বড় কাচের আলমারিতে গ্রামসির নিজের তৈরি একটি সার্দিনিয় ডইলি, কাঠের কটলেরি, একটি সিগারেট হোল্ডার এবং অন্যান্য জিনিস রাখা ছিল। সেসব পুরোনো জিনিসপত্রের কথা আমার মনে আছে। কল্পনাপ্রবণ খেলাধুলার নিরন্তর উৎস হিসেবে ওগুলো আমার কাছে রহস্যাবৃত ছিল। সত্তরের দশকের শেষে ও আশির দশকের প্রথম দিকে আমার পরিবার ওই সব জিনিসপত্রের অধিকাংশই ঘিলারজার কাসা গ্রামসিতে দান করে দেয়। তবে পারিবারিক স্মৃতি হিসেবে কয়েকটি জিনিস আমরা রেখে দিই—একটি ছাইদানি, যা আমার ক্রমাগত-ধূমপায়ী দাদা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নিজের সঙ্গে রেখেছিলেন এবং তাঁর নিজের সংগ্রহে থাকা ম্যাকিয়াভ্যালির *প্রিন্স* বইয়ের একটি কপি। এই বই *প্রিজন নোটবুকস*-এর অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

বিশ বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে—এটি এমন একটি সমাজ ছিল, যা এর সীমাবদ্ধতাগুলো সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের বাস্তবিক স্মারকের প্রতিনিধিত্ব করত এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও পশ্চিমা ধনতন্ত্রের বিরোধগুলোকে বৈধতা দিতে সাহায্য করেছে। এই সময়ে এসে আমার মধ্যে আমার দাদার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। গ্রামসির জন্মশতবর্ষ পালন উপলক্ষে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি এবং ফন্দেজিওন ইন্সতিতো গ্রামসি ইতালিতে আমার ও আমার বাবার জন্য একটি ভ্রমণের আয়োজন করে। আমরা প্রায় ছয় মাস ইতালিতে থেকে সার্দিনিয়া থেকে শুরু করে তুরি পর্যন্ত গ্রামসির জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সব স্থান ঘুরে দেখি (পরিচিতজনদের জন্য তুরির জেলখানায় আমার ও ফ্রান্সেসকা ভ্যাকার আয়োজন করা সংগীতানুষ্ঠানটি আমাদের সফরের সবচেয়ে আবেগঘন অনুষ্ঠান ছিল।) এই মাসগুলো অসাধারণ সব ঘটনায় পরিপূর্ণ ছিল। আমি নিজেকে ইতালীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করাচ্ছিলাম এবং আমার দাদা এর জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে পেরেছিলাম। ফিরে এসে আমি পূর্ণ উদ্যমে নিয়মানুগভাবে ইতালীয় এবং অল্পস্বল্পভাবে রুশ অনুবাদে গ্রামসির যে কাজগুলো ছিল, তা পড়া শুরু করি। তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে আমার দেশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বুঝতে চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামসির চিন্তার প্রতি আমার আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর কাজের মাধ্যমেই আমি আমাদের বুদ্ধিজীবীদের পালন করা ধ্বংসাত্মক ভূমিকা এখন ভালোভাবে বুঝতে পারি। বুদ্ধিজীবীরা নতুন সরকারের সমর্থনে জনমতামত গড়ে তোলে, যা রাশিয়াকে লুটতরাজের পথে নিয়ে যায়। পেরেস্ত্রোইকার বছরগুলোতে এই প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। আমি গ্রামসি বিশেষজ্ঞে পরিণত

হইনি—আমি একজন জীববিজ্ঞানী এবং সংগীতশিল্পী—তবে আমার চিন্তাচেতনা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আমাদের সময়ের কথা বলতে গেলে আমি বলতে পারি এই করাল ঐতিহাসিক সময়ে আন্তোনিও গ্রামসির মতো একজন বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজনীয়তা আমি সত্যিকার অর্থে অনুভব করি, যিনি দ্বিধাবিভক্ত এবং আদর্শিকভাবে নপুংসক বিভিন্ন উপদলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার সামর্থ্য রাখতেন। এই উপদলগুলোকে বিরোধী দলও বলা যায় না। এরা 'ঐতিহাসিক ব্লকে' নিজেদের নিমজ্জিত করে রেখেছে। দুই দশক ধরে রাশিয়াকে শাসন করা দুর্নীতিবাজ ও নৈরাশ্যবাদী নতুন শাসকদের দমনমূলক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি সঠিক কৌশল নির্ধারণ করতে এরা অক্ষম।

গ্রামসিকে আঁকড়ে ধরার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি আমি ২০০০-এর দশকে নিই। এই সময়ে ফন্দেজিওন ইন্সতিতো গ্রামসির সঙ্গে কাজ করার অংশ হিসেবে আমি গ্রামসির রাশিয়ান পরিবারের ইতিহাস নিয়ে কাজ করা শুরু করি। আমি তখনো জানতাম না যে গ্রামসির ইতিহাস পুনর্নির্মাণের এসব মিতাচারী ও অবিন্যস্ত প্রচেষ্টা একটি গোটা গবেষণা প্রকল্পের জন্ম দেবে। এর মাধ্যমে আমার দেশ ও আমার দাদার জীবনের ইতিহাস পুনর্নির্মাণে আমি ক্ষুদ্র অবদান রাখতে পারব বলে আশা করি। জুলিয়া সুগ্‌তের পরিবার উভয় বিষয়ের সঙ্গেই নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল।[৪] রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের একাংশের বেশ চমকপ্রদ ঐতিহাসিক নজির আছে। এরা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের সামাজিক 'পূর্বানুমান' থেকে দূরে থেকে ও রাষ্ট্রের নতুন মূল্যবোধব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করার মাধ্যমে বিপ্লবের নামে নিজেদের শ্রেণির সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। অন্যদিকে সুগ্‌ত পরিবার আমার দাদার জীবনের ওপর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক উভয়ভাবেই গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই অনন্য পরিবারটি গ্রামসি ও বিপ্লবী রাশিয়ার মধ্যে দৃঢ় বন্ধনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেতুবন্ধের কাজ করেছে। অন্যদিকে, আমার মতে, গ্রামসির জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ধোঁয়াশে কিছু ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে রাশিয়া অন্যতম মাধ্যম। এর মধ্যে কয়েকটির কথা আমি বলব।

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে গ্রামসি ও লেনিনের মধ্যকার সম্পর্ক। ১৯৭০-এর দশক থেকেই এটা জানা ছিল যে বলশেভিকদের নেতা এবং ইতালীয় কমিউনিস্টদের ভবিষ্যৎ নেতার মধ্যে প্রথম দেখা হয়েছিল ১৯২২ সালে। সোভিয়েত নথি থেকে আমরা দেখি যে ১৯২২ সালের ২৫ অক্টোবর ক্রেমলিনে লেনিনের অফিসে এই দুই নেতার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ১৯৭২ সালে প্রথম প্রকাশিত *বায়োগ্রাফিক্যাল রেকর্ডস অব লেনিন*-এ দুই নেতার মধ্যে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি তালিকা আছে। সবগুলো বিষয়ই ছিল গুরুত্বপূর্ণ: ইতালির দক্ষিণাঞ্চলের খুঁটিনাটি, ইতালির সমাজতান্ত্রিক দলের অবস্থা এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে এর একীভূত হয়ে যাওয়ার

সম্ভাবনা। রেকর্ডটি তৈরির সময় ইনস্টিটিউট অব মার্ক্সিজম-লেনিনিজম ইতালীয় কমিউনিস্টদের সহযোগিতায় এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ-সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিবেদন খুঁজে দেখার দায়িত্ব আমার বাবাকে দেয়। একমাত্র চিঠিটি আসে ক্যামিলা র‍্যাভিরার কাছ থেকে। গ্রামসি নিজে র‍্যাভিরাকে যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন তার ওপর ভিত্তি করে র‍্যাভিরার দৃঢ় অনুমান হচ্ছে: এই সাক্ষাৎই লেনিনকে অ্যামেদিও বর্দিগার পরিবর্তে আমার দাদাকে ইতালীয় কমিউনিস্টদের নেতা বানাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বর্দিগার অনমনীয় এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব লেনিনকে হতাশ করেছিল।[৫] কিন্তু এর অল্প কয়েক মাস পরেই প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিকথায় র‍্যাভিরা এই কথাগুলো বলেননি কেন? প্রখ্যাত ইয়ুসেপ্পি ফিওরিসহ গ্রামসির সব জীবনীকারেরাই এই বিষয়টি খেয়াল করলেন না কেন?[৬] গ্রামসি নিজে লেনিনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাকারী এবং সুগ্‌ত ও ইলিয়ানভ পরিবারদ্বয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনোই কোনো চিঠি বা প্রবন্ধে কেন এই বিষয়টি উল্লেখ করলেন না? এই আশ্চর্য নীরবতার কারণ হতে পারে বর্দিগার প্রতি আমার দাদার বিনয়। রাজনৈতিক মতভেদ থাকা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও মূল্যবান বন্ধু হিসেবে গ্রামসি বর্দিগাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তবে এই ব্যাখ্যা হয়তো অতটা সোজাসাপ্টাও না।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে গ্রামসিকে কারাগার থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টাগুলো। এ ক্ষেত্রেও, প্রখর মেধাবী বিশেষজ্ঞদের (উল্লেখযোগ্যভাবে অ্যাঞ্জেলো আন্তনিও রোসি এবং ইসেপ্পে ভাস্কা, গ্রামসি *ট্রা মুসোলিনি ই স্টালিন*, ২০০৭) প্রয়াস সত্ত্বেও সত্যটি এখনো দ্বিধান্বিত রয়ে গেছে। আমাদের পারিবারিক নথিপত্র ঘেঁটেও আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু খুঁজে পাইনি। সবচেয়ে সম্ভাব্য পূর্বানুমান হচ্ছে: বন্দী হিসেবে গ্রামসিকে গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগত সহায়তা দিলেও, ফ্যাসিবাদীদের কারাগার থেকে গ্রামসিকে মুক্ত করতে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ ঐকান্তিক কোনো প্রচেষ্টা চালায়নি। তারা কার্যকারিতাহীন লেখালেখি নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন এবং সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবেই তাতিয়ানা সুগ্‌তকেও এই কাজে জড়িয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রেও আমাদের কাছে বিদ্যমান ব্যাখ্যাটি সন্তোষজনক নয়। স্তালিন আর্কাইভনির্ভর কোনো গবেষণা থেকে এই সম্পর্কে উন্নততর ধারণা পাওয়া যেতে পারে, যদিও আজ পর্যন্ত সেখানে কারও প্রবেশাধিকার নেই।

১৯৩৬ সাল থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই কয়েক মাস আমার দাদার জীবনের সবচেয়ে রহস্যাবৃত সময়। এখন পর্যন্ত সম্পাদিত সব গবেষণা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক ও জীবনী-সম্পর্কিত যে সাধারণ প্রশ্নটির সম্পূর্ণ উত্তর আমাদের কাছে নেই তা হলো : কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পর গ্রামসি কী করার পরিকল্পনা করছিলেন? সমসাময়িক বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে একটি মতবাদ হচ্ছে: গ্রামসি

ইতালীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন, যেখানে তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে পুনরায় একত্র হতে পারবেন এবং সম্ভবত তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারবেন। পিয়েরো স্রাফার মতামতের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া এই ধারণা আমার কাছে অতিসরলীকৃত মনে হয়।[৭] আমাদের পারিবারিক আর্কাইভ থেকে আমার সম্প্রতি আবিষ্কার করা তাতিয়ানার সেই সময়কার চিঠিপত্র থেকে এ বিষয়ে আরও নির্মোহ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা যায়। একইভাবে রোমের ফন্দেজিওন গ্রামসির সিলভিও পোনস কর্তৃক ২০০০-এর দশকের শুরুর দিকে রাশিয়ান স্টেট আর্কাইভস থেকে আবিষ্কার করা দলিলাদি আরও জটিল চিত্র হাজির করে। এই দলিলাদি অনুসারে ১৯৩৬-৩৭ সাল নাগাদ সোভিয়েত নিরাপত্তা বাহিনী এনকেভিডির সদস্যরা গ্রামসির কাছ থেকে ইতালীয় ট্রটস্কিপন্থীদের সম্পর্কে তিনি যা জানেন তার সবকিছু জানতে চায়। দুই মাস ধরে তারা চেষ্টা চালিয়ে যায়। গ্রামসির উত্তর ছিল : ইতালীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে তারা তাদের প্রয়োজনীয় সব তথ্য পেয়ে যাবে। গ্রামসি একটি নতুন উসকানির আশঙ্কা করছিলেন। এই বিষয়ে আরও প্রশ্নের উদয় হয় : আনুষ্ঠানিক মর্যাদাসহ বা ব্যতিরেকে মস্কোতে ফেরার প্রতিদান হিসেবে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ কি গ্রামসিকে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার শর্ত দিয়েছিল অথবা, ১৯২৬ সালের অক্টোবরে ট্রটস্কিকে সমর্থন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে গ্রামসির লেখা বিখ্যাত চিঠির কারণে তারা কি পরোক্ষভাবে তাঁকে এটাই বোঝাতে চেয়েছিল যে ট্রটস্কিপন্থীদের প্রতি সহানুভূতির দাগ এখনো তাঁর গায়ে আছে? যা-ই হোক না কেন, গ্রামসির ভাগনি এডমে গ্রামসির মতে, ঠিক এই সময়েই স্যান্টো লুসার্জিতে জরুরি ভিত্তিতে একটি কক্ষ খুঁজে বের করতে সার্দিনিয়াতে তাঁর পরিবারকে একটি চিঠি লিখেছিলেন গ্রামসি। কিন্তু তিনি সার্দিনিয়াতে কী করতে চেয়েছিলেন? ২৪ মার্চ ১৯৩৭ সালে ইউজেনিয়াকে লেখা একটি চিঠিতে তাতিয়ানা লেখেন, 'আন্তোনিও বিশ্বাস করে যে সার্দিনিয়া থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে ইতালি থেকে পালিয়ে যাওয়া অনেক বেশি কষ্টসাধ্য। আমরা এটার উল্লেখ করতে পারছি না পাছে গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়।' এই অংশটিকে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব? ভ্যাকা ঠিকই বলেছেন, পালিয়ে যাওয়ার মতো সামর্থ্য গ্রামসির ছিল না। আমি বিশ্বাস করি, আমার দাদা সোভিয়েত কর্তৃপক্ষকে পরোক্ষভাবে এটাই বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে এর কয়েক বছর আগে বর্দিগা যেমন করেছিলেন, অনুরূপভাবে রাজনৈতিক জীবন থেকে চিরতরে অবসর গ্রহণ করে ইতালিতে থেকে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা তাঁর নেই। এটা হতে পারে যে স্রাফার বক্তব্যও একইরকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। তবে ১৯৩৬ সালে স্রাফা গ্রামসির সঙ্গে দেখা করতে পেরেছিলেন এবং তিনি

গ্রামসিকে মস্কো ট্রায়াল সম্পর্কে সাম্প্রতিক খবরাখবর জানিয়েছিলেন। এই ট্রায়ালটি ছিল ধারাবাহিকভাবে চলমান একাধিক ট্রায়ালের একটি। এর মাধ্যমে লেনিনের নিকটতম সহযোগীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, যাদের মধ্যে কেউ কেউ ট্রটস্কিপন্থী হওয়ার দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। নীরবতা ছিল গ্রামসির প্রতিক্রিয়া, একটি 'অনুচ্চারিত মন্তব্য', যার মধ্যে সম্ভবত আতঙ্ক ও ধিক্কার লুক্কায়িত ছিল। তিনি নিজে বা নিজের পরিবারের জন্য ছাড় না দিয়ে নীরব ছিলেন। তাতিয়ানার চিঠিপত্র (এবং অন্যান্য উৎস থেকে) এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আমার দাদার স্বাস্থ্য খুব ভেঙে পড়েছিল এবং তিনি এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। ফলে এই অবস্থায় তাঁর রাশিয়ায় যাওয়ার কথা না। গ্রামসি চেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পূর্বে জুলিয়া এবং তাঁর সন্তানেরা যেন তাঁকে দেখতে আসেন। এই গোটা বিষয়টি নিয়ে আমার ধারণা হচ্ছে, ১৯৩৬ সালের শুরুর দিকে পর্যন্ত গ্রামসি প্রকৃতপক্ষেই সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা করছিলেন; তবে এই বছরের শেষের দিকে তাঁর নিজের স্বাস্থ্য এবং রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতির (যেমনটি স্রাফা তাঁকে জানিয়েছিলেন এবং এনকেভিডির আচরণে যা তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন) ফলে তিনি তাঁর পরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তন আনেন এবং ফিওরির বিশ্বাসমতে, গ্রামসি স্বদেশেই অবসর গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

আমার দাদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক তাঁর জীবন ও ধারণাগুলোর প্রতি আমার আগ্রহের চেয়েও বেশি কিছু। গ্রামসির নাতি এবং এক প্রকারভাবে তাঁর শিষ্য হওয়ার দরুন তাঁর স্মৃতি এবং যে আদর্শের কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন সেগুলোকে যেকোনো ধরনের স্বার্থসাধন ও সব ধরনের অনুমাননির্ভরতা থেকে মুক্ত করা আমার দায়িত্ব। সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামসিকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপরীতে স্থাপন করার বা তাঁকে কমিউনিজমের শিকার হিসেবে বর্ণনা করার প্রচেষ্টাগুলো বৃদ্ধি পেয়েছে। ম্যাসিমো ক্যাপরারা থেকে শুরু করে ইয়ানকার্লো ল্যাহনার পর্যন্ত অনেক ইতালীয় লেখক এসব বিষয় পক্ষপাতদুষ্ট কথা বলছেন।[৮] যেমন এটা বলা হয়ে থাকে যে সোভিয়েত পার্টি এবং তাঁর রাশিয়ান পরিবার তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল। ল্যাহনারের মতে, ১৯৩৪ সাল থেকে শুরু করে গ্রামসির মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর অত্যন্ত ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচ ইতালির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বহন করেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক উদ্ধার করা গ্রামসির পরিবারকে তাতিয়ানার লেখা চিঠি থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে বিষয়টা এ রকম ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর স্বামীর যত্নের জন্য জুলিয়া নিয়মিতভাবে তাতিয়ানাকে বড় অঙ্কের টাকা পাঠাতেন এবং নিশ্চিতভাবেই এই টাকার মূল জোগানদাতা ছিল সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ।

এত বছর ধরে জমতে থাকা সব আবর্জনা আমি ঘাঁটতে যাব না। যেমন তোগলিয়াত্তির সাবেক সচিব ক্যাপরারা আভাসে-ইঙ্গিতে বলার চেষ্টা করেছেন যে

সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা গ্রামসিকে প্রলুব্ধ করার জন্য জুলিয়া সুগ্‌তকে পাঠিয়েছিল বা একই সংস্থা জুলিয়ার বোন তাতিয়ানাকে গ্রামসির ওপর নজরদারি করার জন্য নিয়োগ দিয়েছিল বা সুগ্‌ত পরিবার গ্রামসির সন্তানদের তাদের বাবার আদর্শ সম্পর্কে কোনো কিছুই জানায়নি ইত্যাদি। এই ছাইপাঁশগুলো এতটাই এগিয়েছিল যে শ্রদ্ধাভাজন লউগি দা ম্যাজিস্ট্রি মৃত্যুশয্যায় গ্রামসির সঙ্গে কথা হয়েছিল বলে দাবি করেন। কুইসিসানা হাসপাতালে একই সময়ে চিকিৎসাধীন এক বৃদ্ধার সাক্ষ্য হাজির করে এও বলা হয় যে আমার দাদা জানালা থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন বা তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল।

আমার দাদা এবং আমাদের পরিবার সম্পর্কে সম্ভবত এগুলোই সর্বশেষ মিথ হলে ভালো হতো, কিন্তু বিধি বাম। সাংস্কৃতিক অধঃপতনের এই অবস্থায় গ্রামসি সম্পর্কে (এবং অন্যদের সম্পর্কে) কল্পকাহিনি তৈরি চলমান আছে। গণমাধ্যম দ্বারা মানুষের চৈতন্যকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে তা আরও ঘনীভূত হচ্ছে। হারম্যান হেস তাঁর উপন্যাস *দ্য গ্লাস বেড গেম*-এ যেমনটা চিহ্নিত করেছেন যে এই যুগটা হচ্ছে 'হাস্যরসময় প্রবন্ধের যুগ', এমন একটি অদ্ভুত সময় যখন পারস্পরিক উদ্ধৃতায়নের মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও সত্যিকার গবেষণা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, আমরা যদি 'এই মহান এবং একই সঙ্গে ভয়ানক পৃথিবীতে' মানবিক মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে চাই তবে একজন কর্মী, বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী এবং একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে এই বিদ্বেষপ্রবণ প্রবণতাগুলোর বিরোধিতা করা আমাদের দায়িত্ব।

টীকা

১. লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় অ্যাংলিও ডি'ওরসি সম্পাদিত *ইনচিয়েস্তা সু গ্রামসি*তে ২০১৪ সালে। ২০১২ সালের ২০ জানুয়ারি তুরিনের তিয়াত্রো ভিত্তোরিয়াকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে লেখা।

২. মাত্তিও বার্তোলি (১৮৭৩-১৯৪৬) একজন ডায়ালেক্টোলজিস্ট। তিনি বহু বছর তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন।

৩. পালমিরো তোগলিয়াত্তি (১৮৯৩-১৯৬৪) গ্রামসির পরে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন। তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

৪. জুলিয়ার বাবা অ্যাপোলন (১৮৬১-১৯৩৩) ছিলেন স্যাক্সন বংশের জার জেনারেলের পুত্র। তাঁর সম্মানিত চাকরির স্বীকৃতির কারণে তিনি খুবই মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ইউক্রেনের একজন সম্মানিত ইহুদি আইনজীবীর মেয়ে জুলিয়া হার্শফেল্ডকে বিয়ে করেন। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই জনতুষ্টিবাদী ছিলেন। সেনাবাহিনীর মধ্যে গোপন বিপ্লবী দল চালানোর দায়ে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। লেনিনের ভাই আলেক্সান্ডারের সঙ্গে একই সময়ে তাঁকে ১৮৯৭ সালে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পশ্চিম সাইবেরিয়ার তমস্কে নির্বাসনে পাঠানো হয়। পরে তাঁকে সামারায় নির্বাসিত করা হয়। প্রায় ছয় বছর পর পিটার্সবার্গে ফিরে এসে

অ্যাপোলন দ্রুত তাঁর পরিবারকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে সুইজারল্যান্ডে এবং পরে ফ্রান্স ও ইতালিতে। সেখানে তিনি ১৯১৬ সাল পর্যন্ত বসবাস করেন। পিটার্সবার্গে ফিরে এসে তিনি ১৯১৭ সালের শুরুতে বলশেভিক বিপ্লবে অংশ নেন। ইউজেনিয়া তখন সেখানেই ছিলেন এবং জুলিয়া তাঁর পথ অনুসরণ করে চলে আসেন। দুই বোনই একই বছরের সেপ্টেম্বরে দলে যোগদান করেন। তাঁদের মতো অ্যাপোলনও নতুন রাষ্ট্রে বেতনভুক্ত পদবি নেন। ১৯২২ সালে প্রথম গ্রামসির সঙ্গে এই বোনদের দেখা হয়।

৫. ক্যামিলা র‍্যাভেরা (১৮৮৯-১৯৮৮) ছিলেন রাজনীতিবিদ এবং ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। অ্যামেদিও বর্দিগা (১৮৮৯-১৯৭০) দলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম নেতা।

৬. ইয়ুসেপ্পি ফিওরি, *আন্তোনিও গ্রামসি : লাইফ অব আ রেভল্যুশনারি (১৯৬৬)*, লন্ডন, ১৯৭১।

৭. পিয়েরো স্রাফা (১৮৯৮-১৯৮৩) ছিলেন একজন নব্য-রিকার্ডিও অর্থনীতিবিদ ও গ্রামসির ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

৮. ম্যাসিমো কাপরার (১৯২২-২০০৯) ছিলেন ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং কার্যনির্বাহক। ২০ বছর তোগলিয়াত্তির ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পরে ম্যানিফেস্টো দলের সঙ্গে যুক্ত হন। তারপর তিনি ক্যাথলিকতাবাদে মগ্ন হন এবং তাঁর কমিউনিস্ট অতীতকে অস্বীকার করেন। তিনি মধ্য-দক্ষিণপন্থীদের একজন প্রচারক বনে যান। গিয়ানকার্লো ল্যাহনার (১৯৪৩-) দক্ষিণপন্থীদের একজন ব্যাপক প্রচারক এবং মারাত্মকভাবে কমিউনিস্টবিরোধী। তিনি সিলভিও বের্লুসকুনির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। এর তথ্য নির্দেশ হলো তাঁর *লা ফ্যামিগলিয়া গ্রামসি ইন রাশিয়া*, মিলান ২০০৮।

মূল প্রবন্ধের উৎস : *নিউ লেফট রিভিউ* ১০২, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ৬৯-৭৫।

দলিলপত্র

১৯২৬-২৭ সময়কালে 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি'র গঠনতন্ত্র, ইতিহাস ও কার্যক্রম

গোলাম আম্বিয়া খান লুহানী

[গোলাম আম্বিয়া খান লুহানী যৌবনে ভারতের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনে উৎসাহী ছিলেন। অক্টোবর বিপ্লব সংঘটনের সময় তিনি ছিলেন লন্ডনে। সেখানে তিনি সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯২১ সালে তিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের তৃতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে সোভিয়েত রাশিয়ায় যান। ১৯২৫ সালে তিনি প্যারিসে বিপ্লবী এম এন রায়ের স্ত্রীর সঙ্গে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের একটি সংবাদপত্র এবং ভারতে বিপ্লব সংঘটনের জন্য কাজ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে থেকে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালসহ অন্যান্য সংগঠনের কাজ করেছেন। তিনি কমিন্টার্নের ষষ্ঠ সম্মেলনে অংশ নেন। ১৯৩৭ সালে স্তালিনের শাসনামলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সাজাপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। অনেক কাজের মধ্যে তিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের হয়ে অনেক প্রতিবেদন করে গেছেন। সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে *প্রথম আলো* ও *প্রতিচিন্তা*র সম্পাদক মতিউর রহমান তাঁর গবেষণার প্রয়োজনে রাশিয়ার আর্কাইভ থেকে লুহানী-সংক্রান্ত নানা দলিলপত্র সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সেই সংগৃহীত দলিলপত্র থেকে লুহানীর করা দুটি প্রতিবেদন অনুবাদ করে ছাপা হলো।]

১৯২৭ সালের ৪ জুলাইয়ের প্রতিবেদনে ভারতে একটি কমিউনিস্ট পার্টির আইনি উপস্থিতির তথ্য দিয়েছিলাম। ২১ মে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত পার্টির বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো আমরা বিস্তারিত উল্লেখ করেছিলাম। এ ছাড়া আমরা দলের সভাপতিমণ্ডলী, নির্বাহী কমিটি ও অন্য পদাধিকারী সদস্যদের তালিকা তাঁদের কারও কারও বৈশিষ্ট্যসহ দিয়েছিলাম।

দলের অঙ্গসংগঠনের মধ্যে মস্কোর পূর্বাঞ্চলীয় টয়লারের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের (কেইউটিভি) সাবেক কিছু ছাত্র রয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু

● অনুবাদ : **খলিলউল্লাহ্**

কমিন্টার্নের সঙ্গে সম্ভাব্য সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে পার্টির ধরন যাচাই করার জন্য সব প্রয়োজনীয় তথ্য এখনো আমাদের হাতে নেই।

যা হোক, এই মুহূর্তে আগের দেওয়া প্রতিবেদনের তথ্যের সঙ্গে আরও যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য যোগ করা সম্ভব। যেমন বোম্বে বৈঠকে গৃহীত পার্টির বার্ষিক প্রতিবেদন আমাদের কাছে আছে। প্রতিবেদনটি ছোট পুস্তিকা আকারে বৈধভাবে প্রকাশিত। আমরা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্তগুলো ও পদাধিকারী সদস্যদের যে তালিকা দিয়েছি, তা ছাড়া প্রতিবেদনে রয়েছে (ক) 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্র', (খ) একটি 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' এবং (গ) ১৯২৬-২৭ সময়কালের দলীয় কার্যক্রমের বর্ণনা।

সিপিআইয়ের (ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি) গঠনতন্ত্র

নিচে আমরা গঠনতন্ত্রের ধারাগুলো উল্লেখ করলাম :

১. নাম : দলের নাম হবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি।

২. সদস্যতা : যারা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নির্ধারিত কর্মসূচিতে সম্মত, শুধু তারাই সদস্যতার জন্য যোগ্য হবে।

৩. চাঁদা : প্রত্যেক সদস্যের বছরে চাঁদার পরিমাণ ১২ রুপির কম হবে না এবং তা চারটি কিস্তিতে দিতে হবে। নির্বাহী কমিটি এটা নির্ধারণ করবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে তা সদস্যতা বাতিলের শামিল হবে।

৪. ভর্তি ফি : সদস্যতা ফরমে স্বাক্ষর করতে ১ রুপি দিতে হবে। সদস্যতার জন্য প্রত্যেক আবেদনকারীকে অন্তত দুজন পার্টির নির্বাহী সদস্য কর্তৃক তার ফরম প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হবে।

৫. বার্ষিক সভা : ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সব সদস্যকে নিয়ে একটি বার্ষিক সভা করবে। অবসরে যাওয়া নির্বাহী, কংগ্রেস ও ট্রেড ইউনিয়ন দলগুলোর প্রতিবেদন সম্পর্কে আলোচনা ও তা গ্রহণের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হবে এই সভা এবং একইভাবে আসন্ন বছরের জন্য কর্মসূচি নির্ধারণ করবে। বার্ষিক সভার মূল কাজ হবে পদাধিকারী সদস্য ও একজন কেন্দ্রীয় নির্বাহী নির্বাচিত করা, এবং হিসাবের নিরীক্ষিত বিবৃতি ও আলোচ্যসূচির অন্যান্য সিদ্ধান্তের ওপর আলোচনা করা।

৬. প্রশাসনের দায়িত্ব : যখন সভা চলবে না, তখন পার্টির বিষয়াবলি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাহী পরিষদের ওপর ন্যস্ত থাকবে। এই পরিষদ নির্বাচিত হবে কেন্দ্রীয়করণ নীতির ভিত্তিতে, আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে নয়। পরিষদ নির্বাচন করা হবে সমগ্র পার্টি সদস্যদের মধ্য থেকে এবং তা কোনোক্রমেই পার্টির সিদ্ধান্তের সঙ্গে অসামঞ্জস্য কোনো কাজ করবে না।

৭. নিম্নোক্ত নির্বাহী কার্যালয়গুলো পার্টির থাকবে : পাঁচ সদস্যের সভাপতিমণ্ডলী, একজন সাধারণ সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ। পার্টির কোনো সভাপতি থাকবে না। প্রতিটি সভায় সভা চলাকালীন ওই সভার সভাপতি নির্বাচিত করা হবে।

৮. কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি : পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাহী গঠিত হবে সভাপতিমণ্ডলীর পাঁচজন সদস্য, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, এবং পার্টি দ্বারা নির্বাচিত আরও আটজন সদস্য নিয়ে। নির্বাহী কমিটি বছরে সাধারণত তিনবার বৈঠক করবে। সাধারণ সম্পাদক সভাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে পরামর্শ করে বৈঠকের সময় ও স্থান ঠিক করবে।

৯. কেন্দ্রীয় নির্বাহীর জন্য বিজ্ঞপ্তি : সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির জন্য আলোচ্যসূচি প্রকাশ করবে, যেখানে বৈঠকের তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করা থাকবে। বৈঠকের পরিপূর্ণ ২০ দিন আগে এটা প্রকাশ করতে হবে।

১০. যখন কেন্দ্রীয় নির্বাহীর কোনো বৈঠক থাকবে না, তখন জরুরি বিষয়ে সাধারণ সম্পাদক সভাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে সদস্যদের মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান করবে। বেশির ভাগ সদস্যের মতামত, কেন্দ্রীয় নির্বাহীর বৈঠকে সিদ্ধান্ত পাস করানোর মতোই কার্যকরী হবে।

১১. সভাপতিমণ্ডলী : নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে পার্টি একটি সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত করবে : (ক) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কর্তৃক নির্দেশিত অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা এবং তা সমাধানে সুপারিশ করা, (খ) দলের অন্য অঙ্গসংগঠন কর্তৃক ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অভিযোগ তদন্ত করা এবং সে বিষয়ে তাদের মতামত কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দিষ্ট পদক্ষেপের জন্য প্রেরণ করা, (গ) ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও জাতীয় কংগ্রেসের মতো অন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় ছোট দলীয় গোষ্ঠীগুলোকে তত্ত্বাবধান এবং সংগঠিত করা, (ঘ) বিভিন্ন রাজনৈতিক শাখায় কাজ করছে এমন গোষ্ঠীগুলোর নেতাদের প্রতিবেদন গ্রহণ করা এবং তা নির্বাহী সদস্যদের মধ্যে প্রচার করা, (ঙ) নির্বাহীর অনুমতিতে সব বৈদেশিক বিষয় দেখাশোনা করা।

১২. সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যপদের প্রার্থীদের অবশ্যই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের পার্টি সদস্য হতে হবে। তাদের অবশ্যই রাজনৈতিক অঙ্গনে অন্তত পাঁচ বছরের জন্য সক্রিয় কর্মী হিসেবে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে।

১৩. বৈদেশিক দপ্তর : কেন্দ্রীয় নির্বাহীর অনুমতিক্রমে সভাপতিমণ্ডলী একটি বৈদেশিক দপ্তর পরিচালনা করবে, যা হবে মতাদর্শগত কেন্দ্র। এটা গঠিত হবে সেসব কমরেডকে নিয়ে, যারা দেশের ভেতরে কাজ করার মতো অবস্থায় নেই। বৈদেশিক দপ্তর কেন্দ্রীয় নির্বাহীর প্রতিনিধিত্ব করবে এবং এমন অঙ্গসংগঠন হিসেবে কাজ করবে, যা পার্টির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা করবে।

কিন্তু এই দপ্তর কোনোভাবেই পার্টির কর্মসূচি ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে অসামঞ্জস্য কিছু করবে না। বৈদেশিক দপ্তর তাদের সুবিধামতো জায়গায় নিয়মিত অফিস করবে এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী ও কমিন্টার্নের সবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে। এ ছাড়া ভারতীয় বিষয়গুলোর প্রচার বাড়াবে।

১৪. দলীয় শৃঙ্খলা : পার্টির সব সদস্য ও সংগঠনের কাছ থেকে যথাযথ শৃঙ্খলা কাম্য। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে না, ততক্ষণ সব প্রশ্ন আলোচনার জন্য সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত থাকবে। যখনই কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে, তখন সব সদস্য ও সংগঠন তা দ্রুততার সঙ্গে কার্যকর করবে।

১৫. দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত দলীয় সংগঠন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তার মধ্যে রয়েছে সংগঠনের ভর্ৎসনা করা, স্থগিত করা, এমনকি বাতিলকরণের মাধ্যমে নতুন করে সদস্যতা নিবন্ধন করা। ব্যক্তির সদস্যতার বিরুদ্ধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তার মধ্যে রয়েছে ভর্ৎসনা, কার্যালয় থেকে অপসারণ বা বিতাড়ন। জরুরি বিষয়ের ক্ষেত্রে সভাপতিমণ্ডলী ব্যবস্থা নিতে পারবে এবং পার্টির নির্বাহীর কাছে আপিল করা যাবে।

১৬. উপদল : যেকোনো শ্রমিক শ্রেণি, রাজনৈতিক ও জাতীয় সংগঠনে যদি দুই বা ততোধিক কমিউনিস্ট থাকে তাহলে পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি ও এর নীতি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে একটি উপদল অবশ্যই সংগঠিত করতে হবে। এই উপদলগুলো স্বাধীন হবে না। এগুলো পার্টির শৃঙ্খলা ও কর্মসূচির অধীনে থাকবে।

১৭. জাতীয় কংগ্রেস নির্বাহীর মতো সব সংগঠন, যেমন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নির্বাহীর মতো পার্টি উপদল গঠন করবে, যেগুলো সভাপতিমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকবে। এ ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত উপদলের নেতারা তাঁদের সম্পাদিত কাজের প্রতিবেদন স্ব স্ব সংগঠনে জমা দেবেন। যেকোনো বিষয়ে যদি উপদলের সদস্যদের মতপার্থক্য হয়, তাহলে নির্বাহী কমিটির বৈঠক না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সভাপতিমণ্ডলীর মাধ্যমে পরিচালিত হবেন।

১৮. উপদলের কাজের সংগঠন বা শাখা দ্বারা নির্ধারিত প্রতিটি প্রশ্ন উপদলের বৈঠকে আগে আলোচনা করে নিতে হবে এবং তাদের সিদ্ধান্তের একটি প্রতিবেদন সাধারণ সম্পাদককে পাঠাতে হবে, যিনি এটা সভাপতিমণ্ডলীদের কাছে প্রচার করবেন। যেকোনো প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে উপদলের সদস্যরা একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করবেন এবং ওই সংগঠনের বৈঠকে দৃঢ়ভাবে ভোট দেবেন। এটা করতে ব্যর্থ হলে তা দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের শামিল হবে।

১৯. ন্যূনতম কর্মসূচি : ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তার বার্ষিক সভায় নিয়মিত কর্মসূচি ও নীতি প্রণয়ন করবে যা জাতীয় কংগ্রেস ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মাধ্যমে

কার্যকর করা হবে এবং কমরেডদের উপদল নামে দলীয় গোষ্ঠী গঠন করবে, যা পার্টির পক্ষে সেখানে কাজ করবে। এ ছাড়া পার্টি ন্যূনতম কর্মসূচি তৈরি করবে, যার ভিত্তিতে বিদ্যমান শ্রমিক ও রাজনৈতিক দলগুলোর সহায়তা চাইবে।

২০. অন্য রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোতে কমিউনিস্ট পরিচালনার জন্য আইন তৈরি করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির থাকবে। কিন্তু সেগুলো এই গঠনতন্ত্রের দ্বারা নির্ধারিত আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না।

২১. কেন্দ্রীয় কার্যালয় : কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের স্থান নির্ধারিত হবে নির্বাহী কমিটি দ্বারা। এই কার্যালয়ে পার্টির নথিপত্র থাকবে এবং এখান থেকে প্রকাশনা বের করা হবে।

সিপিআইয়ের ইতিহাস

'কেন্দ্রীয় নির্বাহী' স্বাক্ষরিত বার্ষিক প্রতিবেদনে বর্তমান পার্টির ভিত্তির ব্যাপারে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো ছিল :

'আমাদের মতামত হলো, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আপনাদের জানানো প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, এর ফলে আমাদের মধ্যে যাদের এ ব্যাপারে ভুল ধারণা আছে, তা স্পষ্ট হবে। আপনারা জানেন যে আমাদের আন্দোলন যেমন বিদেশ থেকে আমদানি করা নয়, তেমনি ভারতে প্রচারণা চালানোর জন্যও রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত কোনো গোষ্ঠী নয়। কায়েমি স্বার্থবাদীরা ভারতে সোভিয়েতকে অপ্রিয় করতে এসব বলে থাকে। সত্যি বলতে, সামাজিক শক্তির ক্রমবিকাশই আমাদের সবাইকে একত্র করেছে এবং এই পার্টি গঠনে সাহায্য করেছে। কয়েক বছর ধরে ভারত তার রাজনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। যুদ্ধের ফলে চারদিকে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে এবং সবখানেই আমজনতা বিপ্লবী মেজাজে রয়েছে। কিন্তু দৃঢ় নেতৃত্বের অভাবে তারা চূড়ান্ত কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছে না। এই সন্ধিক্ষণেই জনাব গান্ধী তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের ধারণা নিয়ে হাজির হন এবং আমজনতা ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে এই আন্দোলনে শামিল হয়। এর ফলে গান্ধী বারদোলিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছে পরাজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ভারত ব্যাপক এক রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের দোরগোড়ায় এসে পৌঁছায়। তারপর থেকেই মতপার্থক্যের কারণে অসহযোগ আন্দোলনের ফৌজ কমে আসছিল। এদিকে এই আন্দোলনের নেতৃত্বকে কেউ চ্যালেঞ্জ করেনি এবং এখনো ভাসা-ভাসা রয়ে গেছে। নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আন্দোলনকে অর্ধেক শেষ করে দেয় সরকারের নির্যাতন, আর বাকিটা করে যারা অনীহাসহকারে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল তারা এবং যারা তাদের নিজেদের খেল

খেলার সুযোগ পেয়েছিল। সংসদীয় প্রতিরোধের স্লোগান নিয়ে স্বরাজ পার্টির আবির্ভাব ঘটে এবং তারা শেষ পর্যন্ত কানপুরে কংগ্রেসকে দখল করার আগ পর্যন্ত কংগ্রেসের মধ্যে মতদ্বৈধতা সৃষ্টি করছিল। এরই মধ্যে গান্ধী বন্দীদশা থেকে ছাড়া পেলেও বিরোধীদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। এর ফলে অসহযোগ আন্দোলন শুরুর সময় যে অবস্থা ছিল, তার চেয়ে ভালো কোনো অবস্থা তৈরি হয়নি। অবস্থা স্থির থাকেনি। স্বরাজ পার্টির মধ্যেই ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়। আরও একটি দল গঠিত হয়েছিল, যা স্বরাজি কর্মসূচি থেকে ভিন্ন ছিল না।

কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্বের জন্য এ রকম দ্বন্দ্ব যখন চলছিল, তখন তরুণ শক্তি অতিষ্ঠ হয়ে নিজেদের পথ খোঁজার চেষ্টা করছিল। এর একটি অংশ গিয়ে যোগ দেয় ব্যর্থ সন্ত্রাসী দলে, আর অন্যরা বিক্ষিপ্তভাবে ছোট দল গঠন করে, যেমন "তরুণদের সংগঠন" (ইয়ং ম্যান'স অ্যাসোসিয়েশন) ইত্যাদি। এ সময়ই ভারতে প্রথম কমিউনিজমের নাম শোনা গেল। হিজরত আন্দোলনে (ভারতের বাইরে মুসলিম দেশগুলোয় জাতীয়-বিপ্লব সংগ্রামে সংহতি জানানোর রাজনৈতিক-ধর্মীয় আন্দোলন) যোগ দিতে যেসব তরুণ ভারত ছেড়েছিল এবং যারা পরে তাসখন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিবাসন নিয়েছিল, তারা ১৯২৮ সালে তাসখন্দ থেকে নতুন রাজনৈতিক চিন্তা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে আফগানিস্তান হয়ে ভারতে ফিরে আসে। দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড দেওয়া হয়। যারা তখনো বাইরে ছিল যেমন কমরেড এস. উসমানি ও নালিনি ভুষনদাস গুপ্ত, তারা একটি গণদল সংগঠিত করার দায়িত্ব নেন এবং কংগ্রেস ও খেলাফত কর্মীদের সঙ্গে কাজ করা শুরু করেন। অ্যাংলো-ভারতীয় পেনাল কোডের ১২১ ধারায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কমরেড এম আহমেদ এবং এস এ দাঙ্গেসহ তাঁরাও গ্রেপ্তার হন। এই মামলা ব্যাপক প্রচারণা পায় এবং কমিউনিজমের একটি অস্পষ্ট ধারণার জন্ম হয়। এর ফলে জাতীয় বিপ্লবের একটি ধারণা সৃষ্টি হয়, যা ভারতের বিশ্বমানের বিপ্লবী নেতারা প্রস্তাব করেন। কানপুরেই কমিউনিস্টদের বিচার ও সাজা দেওয়া হয়। তাই আদালতে যে কর্মসূচি নিয়ে অভিযোগ এসেছে তার সিলমোহর (কানপুরে) অন্য যেকোনো স্থানের চেয়ে বেশি ছিল। জনাব সত্যভক্ত এই সুযোগ গ্রহণ করেন এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি নাম ও চরিত্র নিয়ে কানপুরে একটি পার্টি শুরু করেন। এই পার্টি বেশ কিছু লোককে আকৃষ্ট করে এবং তারা পার্টির সদস্য হিসেবে নাম লেখান। এই দলের আদর্শ হিসেবে স্বাধীনতার দাবি ছিল সবার আগে। দলের নাম জনপ্রিয় করতে বেশ কিছু প্রচারণা তৈরি করা হয়। কিন্তু দেখা গেল, এত কিছুর পরও সেসব কাজে অন্তর্নিহিত মার্ক্সীয় কিছু ছিল না। উল্টো এমন কিছু কাজ করা হয়েছিল, যা এখানে উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয়, সেগুলো ভারতের মতো স্বল্প কমিউনিজম জানাশোনা দেশে কমিউনিজম দর্শনেরই দুর্নাম কুড়িয়েছিল।

দুই বছর টিকে থাকার পর কানপুরে ভারতীয় কমিউনিস্টদের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এটাকে প্রথম কমিউনিস্ট সম্মেলন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কয়েকজন কমরেড পার্টি দখলের সিদ্ধান্ত নেন, যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০-২০৬। সঠিক সংখ্যা বলা যাচ্ছে না, কারণ জনাব সত্যভক্তের কাছে যে রেকর্ড ছিল তা তিনি আমাদের কাছে হস্তান্তর করেননি। এমনকি যে তহবিল তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, তারও কোনো হিসাব বিবৃতি দেননি। যদিও আমরা সংগঠনটি দখল করতে সক্ষম হয়েছিলাম, কিন্তু পার্টি ছিল একটি শর্তাধীন অবস্থায়। পার্টির কোনো গঠনতন্ত্র যেমন ছিল না, তেমনি কোনো কর্মসূচিও ছিল না। বিভিন্ন মানুষকে সংগঠিত করতে নির্বাহী চারজন আঞ্চলিক সংগঠককে নিয়োগ দেয়, যার উদ্দেশ্য ছিল এই বিষয়ে তাদের মতামত লিপিবদ্ধ করা।'

২১ মে, ১৯২৭ সালের বোম্বে বৈঠক আয়োজন করতে, ক্রমান্বয়ে নেওয়া পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করে বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে :

'কানপুর থেকে আসার পরপরই কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ কলকাতায় সব আঞ্চলিক সংগঠকদের নিয়ে একটি বৈঠক ডাকেন। কানপুরে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বোম্বেতে পার্টির সদর দপ্তর রাখা কঠিন হয়ে পড়ায় তা সরিয়ে দিল্লিতে নেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এই বৈঠক আহ্বান করা হয়। একই সময়ে তখনকার হিন্দু-মুসলিম উত্তপ্ত সমস্যা নিয়ে একটি ইশতেহার জারি করা হয়। ইশতেহারে বলা হয়, একমাত্র অর্থনৈতিক কর্মসূচিভিত্তিক কোনো গণসংগঠনের পক্ষেই বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একটি একক মঞ্চে একত্র করা সম্ভব। পরবর্তী সময় বার্মিজ ও কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক সরকার ইশতেহারটি নিষিদ্ধ করে দেয়। প্রায় ৭০০ রুপি প্রতিশ্রুত ছিল, যার মধ্যে ৬০০ রুপি সংগ্রহ করা হয়েছিল।'

'পরবর্তী সময় দিল্লিতে একটি নিয়মিত কার্যালয় চালু হয়, যার দায়িত্বে ছিলেন কমরেড বাগেরহট্টা। তার সঙ্গে পরে যুক্ত হন কমরেড ঘাটে। সেই সঙ্গে সংগঠনের কাজও শুরু হয়।

তখন নভেম্বরের শেষে দিল্লিতে একটি প্রচারণা সম্মেলন আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়। সাধারণ সম্পাদকেরা দেশব্যাপী একটি প্রচারণা ভ্রমণে বের হন, কিন্তু অভ্যর্থনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড এইচ এ নাসিমের কার্যালয়ে আকস্মিক হামলার ফলে সম্মেলন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। বিদেশি সংগঠনসহ আমাদের অন্যান্য যোগাযোগ বৈধ বলে স্বরাষ্ট্র সদস্য আশ্বস্ত করলেও এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে আমাদের যোগাযোগে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল। এর ফলে নবীন দলটি বেশ শক্ত একটি ধাক্কা খায়, যা সারাতে আরও দুই-তিন মাস সময় লেগেছিল।'

'এই সময়ের মধ্যে লাহোর দল ফেব্রুয়ারির শেষে একটি সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়। একটি অভ্যর্থনা কমিটিও গঠন করা হয়। যোগাযোগ

কর্মকর্তা (আরও) কমরেড সাক্লাতভালাকে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার নিমন্ত্রণ জানান এবং লাহোরে থাকা কমরেড মুজাফ্ফর সাক্লাতভালা পৌঁছালে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বোম্বেতে ছুটে যান। কমরেড সাক্লাতভালা নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে আমরা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের (থার্ড ইন্টারন্যাশনাল) সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো নিয়মিত কমিউনিস্ট পার্টি নই এবং তিনি যে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করেন, সেখানে তার নিজের কাজ আছে। গণমাধ্যমে সেই চিঠির যে কপি তিনি প্রকাশ করেন, তা পার্টির প্রতি সহানুভূতিহীন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। শেষতক, সম্মেলন করার পরিকল্পনা বাদ দিতে হয়েছিল। কারণ পার্টির ক্রমবিকাশের এই পর্যায়ে বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়াই কাম্য ছিল।

'পরবর্তী সময় কমরেড সাক্লাতভালা আমাদের সবাইকে দিল্লিতে ডেকেছিলেন। তত দিনে তার দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই বদলে ছিলেন। দিল্লিতে সাক্লাতভালার সঙ্গে ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করা হয়। তিনি ভারতে একটি কমিউনিস্ট পার্টি থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে একমত হন।

'সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দিল্লিতে বৈঠক করি এবং একটি গঠনতন্ত্র ও একজন নির্বাহী নির্বাচিত করতে ২৯ মে বোম্বেতে একটি সাধারণ বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিই।'

সিপিআইয়ের কার্যক্রম

বার্ষিক প্রতিবেদনে বিভিন্ন অঞ্চলে কাজের নিম্নোক্ত রেকর্ড পাওয়া যায়:

বাংলা: বিভিন্ন প্রদেশে শুরু হওয়া শ্রমিক ও কৃষক পার্টি গঠন ও বিকাশে পার্টির সদস্যরা সাহায্য করেছেন। বাংলায় আমাদের কমরেডদের কাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তারা এই প্রদেশে বিদ্যমান কৃষক ও শ্রমিক পার্টি পুনর্নির্মাণ করেছেন এবং এটাকে একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করেছেন। নগণ্য অর্থায়ন ও কমরেড মুজাফ্ফরের ভগ্ন স্বাস্থ্য থাকা সত্ত্বেও 'লাঙল' যা করেছে তা এই প্রদেশে প্রলেতারিয়েত উদ্দেশ্য সাধনে অনেক অবদান রাখবে (*গণবাণী* [কৃষক-শ্রমিক পার্টির আনুষ্ঠানিক মুখপত্র]-এর সঙ্গে 'লাঙল'-কে গুলিয়ে ফেলা যাবে না)।

লাহোর: কমরেড দরবেশী, মজিদ, রেমোহান্দার ও হাসান শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে একটি নিয়মিত সংগঠন শুরু করতে বারবার চেষ্টা করেছেন। তারা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কার্যক্রমে সফলতার সঙ্গে সুস্পষ্ট অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রায় আধা ডজন ইউনিয়ন সংগঠিত করেছেন। তারা জাতীয় কংগ্রেসেও ভালো কাজ দেখিয়েছেন এবং আরও ভালো ফলাফলের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। সম্প্রতি, *উইকলি মেহনাতকাশ* নামে তারা একটি উর্দু সাপ্তাহিক বের করছেন। এটা উর্দু জানা জেলাগুলোয় মানুষকে শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে চমৎকার কাজ করছে।

বোম্বে : বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এখানে একটি শক্তিশালী বামপন্থী সংগঠন প্রয়োজন ছিল। আমাদের কমরেডরা সফলভাবে ডব্লিউঅ্যান্ডপি (ওয়ার্কারস অ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টি) সংগঠন তৈরি করেছে, যা ইতিমধ্যে তাদের নিজস্ব মুখপত্র *ক্রান্তি*-এর মাধ্যমে শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে কাজ শুরু করেছে। বেশ কিছু ট্রেড ইউনিয়নও গঠন করা হয়েছে। এসব ইউনিয়ন সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এআইটিইউসি (সর্ব-ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে)-এ প্রভাবশালী অবস্থান নিতে পেরেছে। অন্যান্য প্রদেশ থেকে ফিরে আসা কমরেডদের সহায়তায় তারা কমরেড থেংগি ও ঘাটেকে যথাক্রমে প্রশাসনিক ও সহকারী সচিব হিসেবে এবং কমরেড জগলেকারকে আলোচনা কমিটিতে নিযুক্ত করতে পেরেছে। কংগ্রেস সংগঠনেও বোম্বে দলটি সক্রিয়, কমরেড জগলেকার আবার যার যুগ্ম সচিব। এআইসিসিতে (সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি) তারা সফলভাবে কমরেড নিম্বকার ও জগলেকারকে ফিরিয়ে এনেছেন, যারা গুয়াহাটিতে আমাদের কর্মসূচির জন্য এবং বোম্বেতে অনুষ্ঠিত এআইসিসির বৈঠকে যথেষ্ট সংগ্রাম করেছেন।

রাজপুতনা : রাজপুতনা প্রদেশে সাধারণ সম্পাদক কমরেড বাগেরহট্টা পণ্ডিত অর্জুনলাল শেঠির সাহায্যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে কার্যকর সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির জন্য বরাদ্দকৃত ৭টি আসনের মধ্যে ২ জন সদস্য, ২ জন প্রজাতন্ত্রীকে ফিরিয়ে এনেছে। ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম শুরু করা যাচ্ছিল না, কারণ কমরেড বাগেরহট্টা আমাদের পার্টির সর্ব-ভারতীয় সংগঠনের জন্য তার সময় ও শক্তির বহুলাংশ ব্যয় করছিলেন। সম্প্রতি ডব্লিউঅ্যান্ডপি (ওয়ার্কারস অ্যান্ড পিজ্যান্টস) শুরু করা হয়েছে এবং শিল্প শ্রমিকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মাদ্রাজ : কমরেড সিঙ্গারাভেলু চমৎকার প্রচারণার কাজ করছেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটসংক্রান্ত কাজে তার বেশির ভাগ সময় ব্যয় করছেন। শ্রমিক ও কিষান পার্টি ছাড়া সেখানে আর কোনো সংগঠন নেই। পৌরসভার সদস্য হিসেবে কমরেড সিঙ্গারাভেলু সেখানে প্রচারণার কাজ করছেন।

সংযুক্ত প্রদেশ ও অন্যান্য প্রদেশ : অন্যান্য প্রদেশে কাজ সংঘটিত করতে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, কিন্তু পর্যাপ্ত আর্থিক সম্পদের অভাবে আমরা কার্যকরী বাম দল সংগঠিত করতে পারিনি, যদিও নির্দিষ্ট প্রদেশে কিছু কমিউনিস্ট আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সংযুক্ত প্রদেশে বিশেষ করে কমরেড আসাদ সোবহানি শ্রমিক কার্যক্রমের একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা আশা করি তরুণেরা সামনে এগিয়ে আসবেন এবং দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

দেশে পার্টির সাধারণ অবস্থান সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি ছিল :

'পার্টি গঠনের সময় আমরা যেমন সমর্থন আশা করছিলাম, তা পেতে সক্ষম হইনি। ছাত্র ও তরুণ বুদ্ধিজীবী, যারা আমাদের পার্টির জন্য কিছু সচেতন শ্রমিক দিতে পারত, তাদের মধ্যে প্রচারণা চালাতে এবং এই পর্যায়ে পার্টির কর্মসূচি বাড়ানোর জন্য সব শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের কাছে পৌঁছাতে আমাদের মূল সমস্যা ছিল অর্থের অভাব। আমাদের কমরেডরা যেন বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থা মূল্যায়নের জন্য সব গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্রে যেতে পারে এবং প্রলেতারিয়েতদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে, সে জন্য অন্তত অল্প পরিমাণে হলেও তহবিল সংগ্রহে শক্তি ব্যয় করা অপরিহার্য। এটা করতে পারলে আমরা পার্টির কর্মসূচি বাড়াতে পারব এবং আমাদের নিজেদের পার্টি সম্পর্কে জনগণকে একটি সঠিক ধারণা দিতে পারব। পার্টির একটি কেন্দ্রীয় মুখপত্র চালু করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের কমরেডদের কাছ থেকে সামান্য সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও একটি পার্টি মুখপত্র চালু করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। কারণ নিজস্ব ছাপাখানা ছাড়া এটা সম্ভব নয়, যেহেতু যখন প্রয়োজন হতো, তখন কোনো ছাপাখানাই দুর্ভোগ পোহাতে চাইত না।'

সিপিআই সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি দিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন শেষ করা হয়েছে :

'যদিও শাসকেরা কোনোভাবেই আমাদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে জড়ায়নি এবং এখনো পর্যন্ত আমাদের সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে কিছুই বলা যাচ্ছে না, তবুও আমাদের যোগাযোগ বাধাগ্রস্ত করা এবং আমাদের কলকাতা ইশতেহার ও গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিস্ট পার্টির অন্যান্য প্রকাশনা এবং সম্প্রতি অন্য সব কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদিসহ তৃতীয় আন্তর্জাতিক ও অন্যান্য নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত হয় যে, সরকার আমাদের প্রচারণা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করতে চায়। গত বছর সরকার আমাদের যোগাযোগকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু বাস্তবে সেটা তারা স্বীকার করেনি। কারণ আমরা ভয় পাচ্ছি যে আমাদের উদ্দেশে পাঠানো অনেক চিঠি কখনোই আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশে আমাদের কমরেডদের অনেক ঝামেলার মধ্যে ফেলা হয়েছে। তিন বছরের সাজা থেকে ছাড়া পাওয়ার পরপরই কমরেড শাফিগুয়ার মৃত্যুর কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। কমরেড জি আর দরবেশী রাষ্ট্রীয় নজরদারির আওতায় রয়েছেন। তিনি যত জায়গায় যান, তাকে জানাতে হয়। সীমান্ত সরকার এ ধরনের স্বেচ্ছাচারপূর্ণতার কোনো কারণ দেখায়নি। কমরেড উসমানি এখনো জেলে আছেন এবং তিনি যক্ষ্মা ও রক্তশূন্যতায় ভোগা সত্ত্বেও তাকে সঠিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে না।'

দলিলপত্র

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া

গোলাম আম্বিয়া খান লুহানী

'১৯ সেঞ্চুরি অ্যান্ড আফটার' (১৯ শতক ও তারপর) শিরোনামে ১৯২৭ সালের জুলাই সংখ্যায় *লন্ডন জার্নাল*-এ একটি নিবন্ধ ছাপা হয়। এই নিবন্ধ কিছুটা মনোযোগ দাবি করে। ভারতের অবস্থার পরিবর্তন নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কী ভাবছে তা এই নিবন্ধে বেশ ভালোভাবে বোঝা যায়। এ পর্যন্ত যেসব লক্ষণ দেখা গেছে তাতে বোঝা যায় ভারতের পরিস্থিতি বিপ্লবী ঝোঁকের দিকে মোড় নিয়েছে। এসব লক্ষণের মানে হলো নিষ্ক্রিয়তার সমাপ্তি এবং জাতীয় বিপ্লবী সংগ্রামের একটি সক্রিয় সময়কাল। এমন একটি সাম্প্রতিকতম লক্ষণ হচ্ছে ভারতে একটি কমিউনিস্ট পার্টির বৈধ উপস্থিতি, যার কথা আমরা সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলেছি।

ভারতে উচ্চতর ব্রিটিশ প্রশাসনিক ক্যাডারের একজন অবসরপ্রাপ্ত সদস্য স্ট্যানলি রাইস 'কমিউনিজম ইন ইন্ডিয়া' (ভারতে কমিউনিজম) শিরোনামে *লন্ডন জার্নাল*-এ প্রকাশিত নিবন্ধটির লেখক। বর্তমানে তিনি লন্ডনের 'ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন'-এর সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই আধা সরকারি সংগঠনটি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণার জন্য বিশেষায়িত। তিনি লন্ডনের *এশিয়াটিক রিভিউ*-এর সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। এটা ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিক রাজনীতির ওপর একটি নির্ভরযোগ্য জার্নাল। সব প্রমাণ থেকে দেখা যায়, স্ট্যানলি রাইস ভারতবিষয়ক ব্রিটিশ মন্ত্রণালয়ের বেশ কাছের মানুষ। সে জন্য তার মতামতকে আধা সরকারি ভাষ্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

● অনুবাদ : **খলিলউল্লাহ্**

নিবন্ধটি শুরু হয়েছে এশিয়ায় ইউএসএসআরের (সোভিয়েত ইউনিয়ন) নীতি বিষয়ে ব্রিটিশ প্রচারণার সাংবাদিকতাসুলভ বর্ণনা দিয়ে। 'সমগ্র প্রাচ্য রাজনীতির ওপর গ্রাস শক্তিশালীকরণে' এবং 'এশিয়া মহাদেশকে বলশেভিক আধিপত্যের আওতায় আনতে', 'প্রাচ্যের প্রভুত্ব' অর্জনে 'রাশিয়ান' পরিকল্পনার মতো গতানুগতিক কথাবার্তা আমরা বলে থাকি। এসব কিছুর 'মূল লক্ষ্য' হলো 'ইংল্যান্ডের ধ্বংসের দিকনির্ণয় করা'।

যাহোক, নিবন্ধের আসল প্রস্থানবিন্দু হলো লেখকের বিশ্বাস, যাকে তিনি বর্ণনা করেছেন 'চীনা উদ্যোগ' হিসেবে, সেই উদ্যোগের 'পরাজয়'। 'পশ্চিম সীমান্তে একটি পার্শ্ব আক্রমণ' হিসেবে এই উদ্যোগ নিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। তাঁর মতে, 'নিশ্চিতভাবেই বলশেভিক মতবাদ তার পরাজয় নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। এটা তার স্বভাব নয়—এক দিকে ব্যর্থ হওয়ার মানেই অন্য দিকে প্রচেষ্টা জোরদার করার লক্ষণ। এশিয়া মহাদেশব্যাপী খুঁজলে ভারতের মতো এমন লাভজনক আর কোনো ক্ষেত্র নেই।'

'ভারত কেন এত লাভজনক ক্ষেত্র', সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এ ক্ষেত্রে অনেকগুলো কারণ রয়েছে।' যেমন 'যদিও ইরাক ও ফিলিস্তিনে ইংল্যান্ড আক্রমণের শিকার হতে পারে, কিন্তু এগুলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ নয় : যদিও পারস্যে তার স্বার্থ রয়েছে এবং আরবে প্রভাব রয়েছে, তাই সেখানে সোভিয়েত আক্রমণ ক্ষতি করতে পারবে কিন্তু গুরুতর ধ্বংস সাধন করতে পারবে না। ইন্দো-চীনে ফরাসিরা জাতীয়তাবাদ বা অন্য যেকোনো ধরনের স্বশাসন থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাদের ওপর কোনো আক্রমণকে গ্রেট ব্রিটেনের ওপর আরও গুরুতর আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবেই দেখতে হবে। বাস্তব উদ্দেশ্য বিবেচনায় আফগানিস্তানে তেমন বড় কোনো হিসাবনিকাশ নেই; সেখানে যা-ই অর্জন হোক না কেন, তা ভারতে সক্রিয় হওয়ার পথ করে দেবে। সবশেষে, এই সবগুলো জায়গায় জনসংখ্যা খুবই কম এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল সৃষ্টির বিবেচনায় তাদের সংগঠন খুবই প্রাচীন। ভারত ও চীনের জনসংখ্যা এশিয়ার মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ। যদি এই অংশকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহলে অবশ্যই সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্ষেত্রটিও হবে সামান্য ক্ষুদ্রতর অংশ।'

যাহোক, নিবন্ধের লেখক কেন ভাবছেন যে 'বলশেভিকরা' তাদের কার্যক্রম চীন থেকে ভারতে স্থানান্তর করবে, তার সবগুলো কারণ ওপরের উক্তিতে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয় না। এ ছাড়া অন্যান্য কারণ রয়েছে। এটা বোঝা যায় যে 'বলশেভিকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চীনের চেয়ে ভারতে তাদের বেশি ভালো নজির রয়েছে। যদিও ভারতীয় জনতার প্রকৃত দারিদ্র্য চীনের দুঃখের গভীরতায় পৌঁছাতে পারে না, তবু আমাদের ক্রমাগত বলা হয়েছে, লাখ লাখ মানুষ সব সময় ক্ষুধার্ত থাকে এবং এ

ছাড়া, সেখানে পঞ্চাশ মিলিয়ন আউটকাস্ট রয়েছে।'

লেখকের মতে, 'কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে শুধু ব্রিটিশ হওয়ার বিরাট সুবিধা ভারতের রয়েছে। ফলে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব। চীনে ব্রিটেনই একমাত্র অগ্রগামী শক্তি এবং অন্যান্য শক্তির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঝামেলায় জড়ানো থেকে বিরত রাখতে খুবই সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা দরকার, বিশেষ করে জাপানের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন এখনো প্রস্তুত নয়। সবশেষে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। সেটা রাজনৈতিক কারণে হোক বা অন্য কোনো কারণে; তারা যেকোনো সময়ে যেকোনো জায়গায় সম্মুখ সংঘাতে জড়াতে পারে। তাদের দ্বন্দ্ব যতই রাজনৈতিক হবে ততই মঙ্গল; ব্রিটিশদের আরও বেশি দিন টিকিয়ে রাখতে এই একটি পথই আছে।'

কিন্তু ভারতে 'রাশিয়ান' প্রভাব বৃদ্ধির প্রধান উপাদান 'এসব বর্ণনারও আওতার বাইরে'। স্ট্যানলি রাইস মনে করেন এই উপাদান হলো 'জাতীয়তাবাদের নীতি, যা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সব শ্রেণিকে পাকড়াও করেছে।' প্রাচ্য দেশগুলোর জাতীয়তাবাদের বিশ্লেষণই এখানে অনুসরণ করা হয়। 'প্রাচ্যে, যেকোনো মূল্যে' জাতীয়তাবাদ তাদের মধ্যে একটি প্রপঞ্চ হিসেবে বিবেচিত হয়, 'সেসব মানুষের উদ্দেশ্য বা পদ্ধতি যা-ই হোক না কেন, তারা বিদেশি নিয়ন্ত্রণ থেকে তাদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে।' 'বলশেভিকদের জন্য এটাই যথেষ্ট।' আমরা নিশ্চিত, 'বলশেভিকদের কাজ হচ্ছে জাতীয়তাবাদের এই স্ফুরণকে উসকে দেওয়া এবং এর মধ্যে অন্তর্নিহিত হীনতার অনুভূতি থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায় করা।'

স্ট্যানলি রাইসের মনে জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞায় যে সামাজিক শ্রেণি রয়েছে তা মূলত বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যারা বিশেষভাবে 'হীনম্মন্যতার অনুভূতিতে' ভোগে। তাদের বৈরিতা কমাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সুবিধাদান নীতি অনুসরণ করছে। যেমন স্ট্যানলি রাইস লিখেছেন, 'সরকারি চাকরির উচ্চতর পর্যায়ে ভারতীয়দের উন্মুক্ত নিয়োগ এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলিতে বেসরকারি উপাদান সংশ্লেষ করার মাধ্যমে হীনম্মন্যতার অনুভূতি ক্রমান্বয়ে দূর করা হচ্ছে।...যাহোক, এ ছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো ধীরে ধীরে নতুন পেশা চালু করা হচ্ছে। যেমন এত দিন পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থায়ন, বাণিজ্য ও চিকিৎসা পেশায় চাকরি না থাকায় ব্যাপক অসন্তোষ ছিল।'

নিবন্ধের লেখক মনে করেন সুবিধাদানের নীতি 'জাতীয়তাবাদ হটাতে' পারবে না। কারণ হিসেবে তিনি যোগ করেন, জাতীয়তাবাদ 'রাজনৈতিক নীতি হিসেবে সব রাজনৈতিক দলের স্থির বিশ্বাসে পরিণত হওয়ার আগ পর্যন্ত তার ভিত্তিকে বিস্তৃত করেছে'। এমন অবস্থা বলশেভিকদের হস্তক্ষেপের জন্য একটি প্রত্যক্ষ

প্রণোদনা এবং 'নির্যাতিত বা দাসত্বে পরিণত জাতিকে মুক্ত' করার নামে তারা 'বিশ্ব বিপ্লব প্রতিষ্ঠায় প্রথম পদক্ষেপ' নেবে, যা 'নিঃসন্দেহে মস্কোর নির্দেশে ও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের আওতায় জনতাকে ক্ষমতা' প্রদান করবে। ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংকট এমন এক তীব্র পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে 'স্পষ্টভাবেই, একটা এসপার-ওসপার হবে। জাতীয়তাবাদী দুর্দশাকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে; আবেগপূর্ণ ও অপক্ব তরুণদের অবশ্যই পক্ষভুক্ত করতে হবে এবং এই দেশের ভেতরে মস্কোর দৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত করতে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এসব তরুণকে বলিদানও দিতে হবে। যদি আগুন নিভে করুণ জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হয়, তাহলে আর দ্বিতীয় সুযোগ পাওয়া যাবে না।'

সে জন্যই স্ট্যানলি রাইস আশা করছেন 'ভারতে একটি ব্যাপক অভিযান ঘটবে, সেটা হতে পারে চীনে রাশিয়ার সম্পূর্ণ সাফল্য বা সম্পূর্ণ ব্যর্থতার মাধ্যমে অভিযানের সমাপ্তির পরে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ব্যর্থতার কারণেই হবে, কারণ অন্যথায় রাশিয়া ক্ষমতা দৃঢ় করতে এবং পরবর্তী ধাপের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত থাকবে।'

কিন্তু এই 'অভিযানের' ফলাফলকে সাম্রাজ্যবাদী লেখক আশাবাদ হিসেবে দেখেন, কারণ 'যদিও রাশিয়া আফগানিস্তানে তার ভিত্তি প্রস্তুত করছে এবং অনেকাংশেই ভারতীয় সরকারের নজরদারি এড়িয়ে যেতে পারবে, কিন্তু ভারতীয় চৌকস নেতাদের পটানো তার জন্য সহজ হবে না। ভেবেছিল তার জোয়াল ব্রিটিশদের ওপর চাপিয়ে দেবে; কিন্তু এমন গ্রিক উপহার বহনকারী ত্রাণকর্তার চেয়ে ভারতীয় নেতারা নিজেদের মুক্তি নিজেরা সম্পন্ন করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। যদি কোনো অদ্ভুত কারণে কমিউনিজম আরও সাফল্য অর্জনে উৎসাহিত করার আশায় পর্যাপ্ত ভিত্তি তৈরি করতে চায়—আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে পাঞ্জাব আফগানিস্তানের পাশেই অবস্থিত—সে ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের সিগফ্রেড লাইন উড়িয়ে দিতে হবে, কিন্তু তবু তাদের এ দেশের ধর্ম, জাতপাত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আরও ভয়ানক হিন্ডেনবার্গ লাইন মোকাবিলা করতে হবে।'

ওপরের উক্তিতে আমরা সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণা সম্পর্কে দুটি গুরুত্বপূর্ণ লাইনের নির্দেশ পাই, যেগুলো ভারতের বিপ্লবী অবস্থার ভীতি এবং ব্রিটিশ বিশ্বরাজনীতির প্রয়োজনীয়তা মেটাতে এখন শুরু করা হবে। প্রথমেই আমরা দেখি যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে সে ভারতের ওপর তার 'জোয়াল' চাপিয়ে দিতে চায়। দ্বিতীয়ত 'দেশের ধর্ম, জাতপাত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে' এটা পরিপূর্ণ কাজে লাগাতে চায়। অন্যভাবে বললে, জনতার বিপ্লবী চেতনা দমনে ভারতীয় মতাদর্শ ও সামাজিক সংবিধানের যা কিছু সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল তা কাজে লাগানো।

কিন্তু স্ট্যানলি রাইসের অন্তরে একটা অস্বস্তি কাজ করছে। কারণ তাঁর 'ধর্ম ও জাতপাতের হিন্ডেনবার্গ লাইন', যার আড়ালে তিনি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সুরক্ষা করতে চান, তা খুব ভালো অবস্থায় নেই। ভারতীয় জনতা যে তাদের 'দেবতাদের' ওপর আস্থা হারাচ্ছে সে ব্যাপারে স্ট্যানলি রাইস তাঁর সন্দেহ লুকাতে পারেননি। দেশে ঘটে চলা শিল্পবিপ্লবের সময়ে 'নিজেদের ধর্মের প্রতি মনেপ্রাণে অনুরক্ত থাকা' ভারতীয় জনগণের জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে স্ট্যানলি রাইস স্পষ্টতই উদ্বিগ্ন। তিনি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছেন যে ভারত 'বিশ্বের অন্যতম শিল্পভিত্তিক দেশে পরিণত হয়েছে এবং তার শিল্পগুলো ব্যাপকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।' একইভাবে তিনি অদ্ভুতভাবে ব্যক্ত প্রত্যাশায় ডুবে আছেন যে 'শিল্প ভারতের হৃৎপিণ্ড নয়, এবং'—তিনি প্রচণ্ড ভক্তি ও জোরের সঙ্গে বলেন—'যদি সৃষ্টিকর্তা দয়ালু হন তবে কখনোই শিল্প ভারতের হৃৎপিণ্ড হবে না।'

এ রকম ভাষা থেকেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই লেখকের মতো ইংল্যান্ডে রক্ষণশীলদের একটি অংশ সব উপনিবেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ক্রমবর্ধমান হুমকিতে আতঙ্কিত। এর ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার নিরাপত্তায় উপনিবেশ দেশগুলোর ধর্মীয় মানসিকতার ওপরই তাঁরা ভরসা রাখছেন।

মূলত 'হিন্দু সমাজের পুরো কাঠামো যে দার্শনিক মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত' তা হলো মৃত্যুর পরে মুক্তি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই সমর্থনকারী আশা করেন যে 'ভারতে কমিউনিজম ব্যাপক পরিসরে আস্তানা গাড়ার সম্ভাবনা খুবই কম' এবং 'যেকোনো দেশের তুলনায় সম্ভবত ভারতে কমিউনিস্টদের বিপ্লবী মতবাদ গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম।'

যাহোক, এটাই সম্পূর্ণ প্রশ্নের সমাপ্তি নয়। এটা বোঝা যায় যে ভারতে কমিউনিজমের অসম্ভবতা নিয়ে জনাব রাইস যে উপসংহারে পৌঁছেছেন তা 'মস্কোর উৎসাহীদের তাদের প্রচেষ্টা থেকে বিরত করবে না'। 'এই উৎসাহীরা' 'দারিদ্র্য নিরসন, জাতপাত বৈষম্যের বিলোপসাধন, একটি পার্থিব স্বর্গের প্রতিশ্রুতি, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের ধ্বংসের নামে' 'সারা ভারতব্যাপী' 'সহিংসতা ও বিপ্লব' ছড়িয়ে দেবে। এটাও সব নয়, 'চীনের ঘটনাগুলো ভারতে অলক্ষিত থাকছে না।' 'রাশিয়ান বলশেভিজম যে বিদেশিকে চীনাদের ধ্বংসকারী ও নির্যাতনকারী হিসেবে অভিশপ্ত করেছে, সেই বিদেশির প্রতিপত্তি কমেছে এবং তার অনেক চেষ্টার পরও জাতীয়তাবাদী শক্তি ক্ষমতায় এসেছে এবং ধীরে ধীরে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করছে।'

এর সর্বমোট ফলাফল হলো 'ভারতে কমিউনিস্ট কার্যক্রমকে হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে'। তাদের জন্য ব্রিটিশ সরকারি নথিপত্র এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এটা বলা হয় যে '(কমিউনিস্ট) পার্টির তেমন কোনো সাফল্য নেই।' কিন্তু 'এটা

অতিরিক্ত আশাবাদের কোনো কারণ নয়'—স্ট্যানলি রাইস তাঁর পাঠকদের মনে করিয়ে দেন। কারণ, তিনি বিরাট কিছু আবিষ্কার করেছেন এমন সুরে বলেন যে 'নীতির দিক থেকে কমিউনিজম বিপ্লবী এবং বিপ্লবের জন্য কাজ করা কোনো ছোট দল তাদের কার্যবিবরণী প্রচার করে বেড়ায় না এবং বাড়ির ছাদ থেকে তাদের কার্যক্রম ঘোষণা করে না।'

ব্যাপক আশঙ্কার সঙ্গে স্ট্যানলি রাইস মনে করিয়ে দেন যে ভারতে তাঁর ভ্রমণের সময়ে কমরেড সাক্লাতভালার 'উন্মুক্ত সমাবেশে বিশাল জনগোষ্ঠী উপস্থিত হয়েছিল।' 'শ্রমিকদের বিশাল সমাবেশে কমিউনিজম প্রচার করা হয়' এবং 'মিল, বন্দর, রেলওয়েতে ধর্মঘট যে আন্দোলনেরই ফসল, তা প্রমাণ করে'। আমাদের বলা হয়েছিল যে 'রাজনৈতিক দাবিদাওয়া, সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও শ্রম অসন্তোষের কারণে সৃষ্ট অস্থিরতাকে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যবহার করতে পারে এবং সম্ভবত করবে, এবং রাশিয়ানরা কাজে লাগাবে।'

সে জন্যই স্ট্যানলি রাইস ঘোষণা করছেন যে 'যদি এসব চলতে দেওয়া হয়, তাহলে কমিউনিজম মাথাচাড়া দেবে।' পুরো নিবন্ধের উপসংহারটি এমন যে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যথাসময়ে ব্রিটিশ সরকারের উচিত এর প্রতি নজর দেওয়া এবং তা দমনে ব্যবস্থা নেওয়া। ঘটনাক্রমে নিবন্ধের লেখক উপসংহার টেনেছেন যে আন্দোলন দমন শুরু করার 'এখনই সময়'। ভারতে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করার দুটি বাস্তবসম্মত পদ্ধতি সুপারিশ করা হয়েছে। একটি পদ্ধতি হচ্ছে মিথ্যা ও অপবাদের মাধ্যমে প্রচারণা চালানো। যেমন নিবন্ধে দাবি করা হয়েছে 'ভারতকে জানতে দিন কমিউনিজম কী, রাশিয়ার জন্য এর মানে কী, চীনে কী, এমনকি ইংল্যান্ডেই বা কী। এটা ব্যাখ্যা করুন সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার শব্দগুলো বলতে কী বোঝায়। এগুলো এখন তোতা পাখির মতো বলা হয় এবং বেশির ভাগ মানুষের কাছেই বোধগম্য নয়। কিন্তু তবু এই শব্দগুলো তাদের উৎসাহ জাগায় এবং আবেগ উসকে দেয়।' অন্যটি হলো পুলিশি সন্ত্রাসের মাধ্যমে দমনের প্রত্যক্ষ পদ্ধতি। তিনি লেখেন, 'যে কমিউনিস্ট সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট করছে তার পেশা বন্ধ করে দিন। ভারতীয় সরকার এটা দেখাক যে সে দায়িত্বহীন বক্তা ও লেখকদের চিত্তবিকার সহ্য করবে না। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং জনগণের কাছে এর যা মানে, তা বাক্‌স্বাধীনতার আবেগপ্রবণ অনুভূতির চেয়ে নিশ্চিতভাবেই বেশি মূল্যবান—শত্রুকে হেলাফেলা করা অনেকটা দুর্যোগকে শাস্তি প্রদান করার মতো বিষয়।'

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি দর্শন

নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস

সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আন্তর্জাতিক ভাষণগুলোর নির্মোহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বিনির্মাণে এর ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক নেতৃত্ব অবিসংবাদিত—বাংলাদেশের মানুষের স্বশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি কান্ডারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে শুধু যে অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবিলা করার মধ্য দিয়ে তাঁর নেতৃত্বের মহিমা প্রকাশিত হয়েছিল তা নয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাঁর সুযোগ্য দিকনির্দেশনা বাংলাদেশকে এক অনন্যসাধারণ উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় এই বিষয় নিয়ে গবেষণালব্ধ লেখনীর সংখ্যা অপ্রতুল। এই প্রবন্ধটি তাই মার্গারেট জি হারম্যানের বিষয়বস্তু (কন্টেন্ট) বিশ্লেষণ কাঠামোটি ব্যবহার করে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ এবং ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা—তিনটি আন্তর্জাতিক ভাষণ বিশ্লেষণ করে পররাষ্ট্রনীতি সিদ্ধান্ত প্রণয়নপ্রক্রিয়ায় তাঁর অবদান এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনপ্রক্রিয়ার সূত্রপাত সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। পরিশেষে এই আধেয় বিশ্লেষণের দ্বারা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের বিশেষ কিছু গুণের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে, যা বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও বিশ্ববীক্ষা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকের আসনে অধিষ্ঠিত করে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

বঙ্গবন্ধু, পররাষ্ট্রনীতি, জাতিসংঘ, বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ভাষণ।

ভূমিকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেওয়া বিভিন্ন বক্তৃতার জটিল ও গবেষণাভিত্তিক বিশ্লেষণের একটি একাডেমিক

প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এই প্রবন্ধে। একটি স্বাধীন ভূখণ্ডে বাঙালি জাতিসত্তার স্বশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু একজন সুদক্ষ কান্ডারি হিসেবে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বিনির্মাণে প্রধান নেতৃত্ব পালন করে গেছেন। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে গিয়ে এবং এ দেশের আপামর জনসাধারণের পরিচয় ও অধিকারের বিষয়টি বহির্বিশ্বে তুলে ধরার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশ্ববীক্ষার তথা পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি স্থাপনের কাজটি স্বমহিমায় খুবই দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য নেতৃত্ব শুধু বাংলাদেশের রাষ্ট্র বিনির্মাণ তথা অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও বহুপক্ষীয় বিভিন্ন পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের জোট নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক অবস্থান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে বঙ্গবন্ধু এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। কাজটি কি আদৌ খুব সহজ ছিল? বিশেষত স্নায়ুযুদ্ধকালীন বাংলাদেশকে যে মাত্রায় আন্তর্জাতিক বৈরিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, সেই প্রতিকূল ও এক রাজনৈতিক চরমভাবাপন্ন পরিবেশে বাংলাদেশকে একটি বাস্তবধর্মী পররাষ্ট্রনীতির ভিত গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা কতখানি সহায়তা করেছিল? এই বিষয়টি নিয়ে জ্ঞানপ্রসূত আলোচনার তাগিদে এই প্রবন্ধটিতে মার্গারেট জি হারম্যানের (১৯৭০) বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ বা কন্টেন্ট অ্যানালাইসিসের কাঠামোটি ব্যবহার করা হয়েছে।[১] স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে মূলত তিনটি বহুপক্ষীয়/আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে (জাতিসংঘ, জোট-নিরপেক্ষ ও ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা) বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতাগুলোর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাঁর অবদান এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির গঠন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ার যে দিকগুলো নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, তা হলো: (১) বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে কী প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ সামলে দেশকে বিশ্ব পরিমণ্ডলে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, (২) নতুন তথ্যের ব্যবহার কতখানি বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রণয়নে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে; এবং (৩) আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলো তাঁর রাষ্ট্রনীতিকে কতখানি প্রভাবিত করেছে। এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় মার্গারেট জি হারম্যানের রোল থিওরি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বা বিশ্ববীক্ষা নির্মাণে একজন নেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর রেখাপাত করা হয়েছে (পররাষ্ট্রনীতি তত্ত্বের ভাষায় একজন কর্মক বা এজেন্টের ভূমিকা)। পরিশেষে এটা বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের যে বিশেষ গুণগুলো তাঁর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে আলোকছটা লাভ করে, তা হলো সহজাত দক্ষতা (charishmatic), নির্দেশিকা নেতৃত্ব (directive) এবং

সমন্বয়মূলক নেতৃত্বের (accommodative) এক অনন্যসাধারণ মিশ্রণ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথনশৈলী : একটি প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর কথনশৈলী তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এক অনন্যসাধারণ গুণ। এই গুণাবলির প্রভাব দেখা যায় বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের প্রতিটি আন্দোলনে। তাঁর বক্তৃতা বিপুল সমারোহে আপামর জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেছে। একটি স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন সবার মধ্যে প্রথিত করতে সক্ষম হয়েছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ছেষট্টির ছয় দফার দাবি আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-আন্দোলন, সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মহানায়কোচিত ভূমিকা—এই সবকিছুই বাঙালির রাজনৈতিক জীবনাদর্শনকে একটি পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজচিন্তকদের মতে, তাঁর এই অবদান তাঁকে যথার্থই স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির জনকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।[২]

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রাজনৈতিক বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর কথনশৈলী উপমহাদেশীয় ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তাঁর বিশাল অভিজ্ঞতার এক প্রকৃষ্ট প্রতিফলন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি পর্যালোচনা করলে এর তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। এই ভাষণ সম্পর্কে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এক বর্ষীয়ান নেতা জনাব তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ একটি নিরস্ত্র জাতিকে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৪ মিনিটের ওই ভাষণ ছিল অলিখিত। তিনি সারা জীবন যা বিশ্বাস করতেন, সেই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই ওই ভাষণ দিয়েছিলেন।'[৩] ৭ মার্চের এই ভাষণের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল এক ধারাবাহিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকায়। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টো একজোট হয়ে অন্যায়ভাবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফল উপেক্ষা করে। তারা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করতে উদ্যত হয়। এ রকম পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টনে ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের সভায় প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু দৃঢ়কণ্ঠে বলেন :

> আমি থাকি আর না থাকি, বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন যেন থেমে না থাকে। বাঙালির রক্ত যেন বৃথা না যায়। আমি না থাকলে আমার সহকর্মীরা নেতৃত্ব দিবেন। তাঁদেরও যদি হত্যা করা হয়, যিনি জীবিত থাকবেন, তিনিই নেতৃত্ব দিবেন। যেকোনো মূল্যে আন্দোলন চালাইয়া যেতে হবে—অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[৪]

নেতৃত্ব বা ক্ষমতার মোহ নয়, একটি স্বাধীন দেশ ও তার মানুষের অধিকার স্থাপনের সংকল্প বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনকে প্রভাবিত করে। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা দেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার

সংগ্রাম।'[৫] সেদিনের সেই ১৮ মিনিটের অলিখিত ভাষণে ১৯৪৭-পরবর্তী পাকিস্তান সরকারের নয়া ঔপনিবেশবাদী চরিত্রের এক অনন্যসাধারণ সুরতহাল লক্ষ লক্ষ জনগণের সামনে উপস্থাপন করেন। রাজনীতির মারপ্যাঁচের কঠিন ঘটনাবলি ভাষাগত সাবলীলতায় আর আবেগমিশ্রিত উপস্থাপনে এর প্রতিটি শব্দ একেকটি স্লোগানে রূপান্তরিত হয়। পুরো ভাষণে বঙ্গবন্ধু দায়িত্ব নিয়ে তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করেন এবং তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি হওয়া আর সেগুলো অকার্যকর ও ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার ঘটনাগুলো সবার সামনে উপস্থিত করেন। রাজনৈতিক বৈরী পরিবেশ তৈরি হওয়ার পটভূমি সবার সামনে তুলে ধরে তিনি উপস্থিত জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। এগুলো উপস্থাপনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেন। গণতন্ত্রের প্রতি তার সংকল্পকে পুনর্ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণে রাজনৈতিক দিকনির্দেশনার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দুটি পর্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি কৌশলগত নির্দেশনা দিয়েছেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমি এ দেশের মানুষের অধিকার চাই।' আরও বলা হয়েছে, 'আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকেদের ওপর হত্যা করা হয়। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।' একই সঙ্গে এই বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু নিয়তকরণীয় ছোট ছোট বিষয় সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বললেন, 'দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না।' অর্থাৎ, বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র পরিসরের সব বিষয় সম্পর্কে তিনি একটি সম্যক দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন তাঁর ভাষণে, যা আপামর বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে। এই ভাষণ এত বছর পরও বাংলাদেশের সব নাগরিকের রাজনৈতিক চেতনার ও অনুপ্রেরণার উৎস। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সগৌরবে বয়ে নিয়ে চলার জন্য জাতীয় প্রচেষ্টার সঙ্গে রয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ২০১৭ সালে ইউনেসকো ৭ মার্চে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণটিকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।[৬] এই স্বীকৃতি শুধু একটি কথনশৈলীর নয়, এর মাধ্যমে একজন জাতীয় নেতার নেতৃত্বের কৃতিত্ব এবং এর ব্যাপ্তি বা পরিধি সেই দেশের স্বাধীনতা ও মানুষের অধিকার নিশ্চিত করেছে। বিষয়টিকে আবার আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল এ বিষয়ে মন্তব্য করেন, 'বলা হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ অন্তর্ভুক্ত করে ইউনেসকো জাতির জনককে সম্মানিত করেছে। আমি বলব, ঐতিহাসিক এই ভাষণ অন্তর্ভুক্ত করে বরং ইউনেসকো সম্মানিত হয়েছে।'[৭] ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে মহাকাব্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো

বলেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখেছি।' অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর কথনশৈলীর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত। এরপর আমরা বিশ্লেষণ করব বহুপক্ষীয় সংগঠনগুলোয় তাঁর কথনশৈলীর উপস্থাপনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলির প্রকাশ এবং তা কীভাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি স্থাপনের প্রক্রিয়া উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। সেই আলোচনা করার আগে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণের কিছু প্রাসঙ্গিক তত্ত্বীয় আলোচনা করা প্রয়োজন। এই আলোচনা একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতার অবদানকে চিরস্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়।

নেতৃত্ব, জন-কথনশৈলী ও পররাষ্ট্রনীতির একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

পররাষ্ট্রনীতির তাত্ত্বিক প্রকরণে (conceptual discourse) একজন নেতার জন-কথনশৈলী, তাঁর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সে দেশের পররাষ্ট্রনীতির ওপর এর প্রভাব পর্যালোচনা করার প্রয়াস তৈরি হয়। এটা ঘটে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের (মূলত পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ) কর্মক (agency) বনাম কাঠামো (structure) বিতর্কের অবতারণার মাধ্যমে।[৮] আন্তর্জাতিক কাঠামো বিশ্লেষণের মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতির উদ্ভাবন, প্রচলন ও প্রতিপালনবিষয়ক গবেষণা পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণের সাব-ডিসিপ্লিনে বেশ স্বীকৃত। এই ধারণাটি সাধারণত পররাষ্ট্রনীতি যে প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় এবং রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাঠামোগত বিষয়গুলো এই প্রক্রিয়াকে যেভাবে প্রভাবিত করে, তার এক সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে। অপর দিকে এজেন্সি বা কর্মকের ধারণা প্রক্রিয়ার পরিবর্তে নীতির ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে রাষ্ট্র নিজে কোনো এজেন্ট বা কর্মক নয়। রাষ্ট্র মূলত বিভিন্ন এজেন্টের কর্মযজ্ঞের এক সামষ্টিক প্রতিফলন। তাই এজেন্সির ধারণায় প্রভাবিত বিশেষজ্ঞরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন নেতার ভূমিকার ওপর ও ভূমিকাপ্রসূত নীতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। একজন জাতীয় নেতার ভূমিকা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অপরিসীম। বিভিন্নভাবে তা উপলব্ধি করা সম্ভব। জনগণের সামনে তাঁর বক্তৃতা সেই নেতার কৃতিত্বকে যেমন জাহির করে, তেমনি এর মাধ্যমে আমরা নেতার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর কার্য বাস্তবায়নের দক্ষতার ছাপ ও দূরদর্শিতা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হই।

সুতরাং, যে প্রশ্নগুলো এজেন্সি ঘরানার আলোচনায় প্রাধান্য পায় তা হলো : (ক) একজন নেতার ভূমিকা কী? (খ) কখন নেতাকে ভূমিকা পালন করতে হয়, এবং (গ) নেতার ভূমিকা কী ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এই আলোচনায় নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত পর্যায়ের একজনের ভূমিকাকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও কাঠামোর প্রভাবকে একেবারে অবহেলা করা হয় না। অর্থাৎ, এজেন্সি ও কাঠামোর আলোচনা পরস্পরবিরোধী নয়। এরা একে অপরের সম্পূরক হিসেবে বিশ্লেষিত হওয়ার মাধ্যমে

যেকোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন-প্রক্রিয়া ও তার প্রভাব সম্পর্কে বিশদ ধারণা দিতে সক্ষম হয়।

তদুপরি পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ (Foreign Policy Analysis, FPA) একাডেমিক বিষয় হিসেবে আরও বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধ্রুপদি তত্ত্বসমূহ, তথা নিওরিয়েলিজম ও কনস্ট্রাকটিভিজমের ধারণার বিপরীতে একজন ব্যক্তির ভূমিকার গুরুত্বকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আলোচনা করার প্রয়াস চালানোর মাধ্যমে।[৯] ভ্যালেরি এম হাডসন তাঁর পররাষ্ট্রনীতির বইতে এটি উল্লেখ করেছেন যে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণায় পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো, ধারণা বা কাঠামো শুধু নয়, একজন ব্যক্তি পররাষ্ট্রনীতির একটি কর্মক।'[১০] নিওরিয়েলিজমে কেনেথ ওয়াল্টজ ও কনস্ট্রাকটিভিজমে আলেক্সান্ডার ওয়েন্ডটের মতো বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা যেভাবে মূলত কাঠামোকে গুরুত্ব দিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি আলোচনা করেছেন এবং ব্যক্তি পর্যায়ের ভূমিকাকে অবহেলা করেছেন, তা ভ্যালেরি এম হাডসনের মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে মানবতা-বিবর্জিত একটি একাডেমিক চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। তিনি আরও বলেন, শুধু কাঠামো বিশ্লেষণ করে একটি পররাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক সিদ্ধান্তের সামাজিক-জাতীয় পরিচয় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় বা এর পরিচয় তৈরি হওয়ার যে প্রক্রিয়া, তা পুরোপুরি বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। তাই মার্গারেট জি হারম্যান (১৯৭০) বা পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণের অন্যান্য গবেষক এজেন্সি বা ব্যক্তি কর্মকের গুরুত্ব প্রতিস্থাপন করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন।

এই প্রবন্ধটি মার্গারেট জি হারম্যানের পররাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত।[১১] মার্গারেট তাঁর গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অবদান এবং তাঁদের সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন। এটা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নকারী ব্যক্তির মানসিক অবস্থা অলিখিত ফলকের মতো নয় অথবা একেবারে শূন্য অবস্থা নয়, যা থেকে নতুন সব সিদ্ধান্ত প্রণয়ন হতে থাকবে। বরং পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নকারী একজন রাজনৈতিক নেতার অথবা একজন পররাষ্ট্রবিশেষজ্ঞ আমলার জটিলতর তথ্য বিশ্লেষণের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, যা তাঁর এবং তাঁর আশপাশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ব্যবহার, সংস্কৃতি, ইতিহাস, রাজনৈতিক সংস্কার এবং আরও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এসব ধারণা থেকে যে সামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়, তা পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্তের ক্ষেত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিয়ে থাকে। মার্গারেট তাঁর গবেষণাগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন নেতার কথাবার্তা, ভাষণ বা বক্তৃতার আধেয় বিশ্লেষণ করে তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্রের এক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এর মাধ্যমে মূলত পররাষ্ট্রনীতির ওপর তাঁর প্রভাব আলোচনা করেছেন।

এই প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ভাষণের কঠোর ও যথাযথ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, তা হলো : (ক) আন্তর্জাতিক বৈরী পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু বাধাগুলোকে কীভাবে মোকাবিলা করেছেন, (খ) নতুন তথ্যের ব্যবহার কতখানি বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রণয়নে ভালো প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে, এবং (৩) অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি দ্বারা তাঁর রাষ্ট্রনীতি কতখানি প্রভাবিত হয়েছে। এই বিষয়গুলো একজন নেতার যেসব চরিত্রের দিকে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে, তা নিচের সারণির মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো :

সারণি-১

নির্দেশক (Indicators)	বিশ্লেষণীয় বিষয়াবলি	নেতৃত্বের পররাষ্ট্রনীতির গুণাবলি
বাধাগুলোকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে বৈরী অবস্থার প্রতি কতখানি পজিটিভ ছিলেন, নাকি তা উপেক্ষা করেছেন?	১। বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ-পরবর্তী সম্পর্ক ২। আরব দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ৩। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ৪। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে ভূমিকা ৫। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক	● সহজাত দক্ষতা (charishmatic) ● নির্দেশিকা নেতৃত্ব (directive) এবং ● সমন্বয়মূলক নেতৃত্ব (accommodative)
নতুন তথ্যের ব্যবহার পররাষ্ট্রনীতি-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রণয়নে কী ধরনের প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে? অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি দ্বারা তাঁর রাষ্ট্রনীতি কতখানি প্রভাবিত হয়েছে?		
অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি দ্বারা তাঁর রাষ্ট্রনীতি কতখানি প্রভাবিত হয়েছে?		

তথ্যসূত্র : লেখকের নিজের বিশ্লেষণ এবং Hermann (১৯৭০) 'Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders.' *International Studies Quarterly*, no. 24, 7~46.

পরিশেষে এই আলোচনার ওপর ভিত্তি করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের যে গুণগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা হলো তাঁর সহজাত দক্ষতা (charishmatic), নির্দেশিকা নেতৃত্ব (directive) এবং সমন্বয়মূলক নেতৃত্ব (accommodative)। এই আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রসারে এবং

পররাষ্ট্রনীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর বিশ্বদর্শন সম্পর্কে ধারণা লাভ সম্ভব এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের মুখ্য স্থপতির জায়গায় তাঁর অবস্থানকে একটি অপ্রতিম একাডেমিক ভিত্তি প্রদান করা যেতে পারে। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে জাতিসংঘে ও অন্যান্য বহুপক্ষীয় সংগঠনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এবং ১৯৭১-পরবর্তী বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

১২ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করার বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর সামনে একটি বড় দায়িত্ব হিসেবে আবির্ভূত হয়। স্নায়ুযুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি বাংলাদেশের স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয়টি অনেক জটিল একটি প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত করেছিল। এ বিষয়ে সাবেক কূটনীতিক মহিউদ্দীন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম দিকে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যগুলো অর্জনে যে সাফল্য দেখায়, তা বঙ্গবন্ধু সম্যক উপলব্ধি করতেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্যগুলো ছিল : ১. বাংলাদেশের পক্ষে বেশিসংখ্যক দেশের স্বীকৃতি আদায় এবং ২. দুনিয়ার বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ লাভ। আর (৩) ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি), জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন (ন্যাম), কমনওয়েলথ, জাতিসংঘসহ সব আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করা।[১২]

ইমতিয়াজ আহমেদ ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সময়টিকে 'স্বীকৃতির কূটনীতি' অধ্যায় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১৩] এ বিষয়টি অনস্বীকার্য যে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ একটি মুখ্য দায়িত্ব হিসেবে স্থাপিত হয়। বিশেষত যে দেশগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা করেছিল, তাদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া বাংলাদেশের তৎকালীন সরকারের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। একই সঙ্গে বন্ধুপ্রতিম ভারতের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও মানবিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করা বাংলাদেশের জন্য একটি বাস্তবধর্মী ও প্রায়োগিক পররাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক সিদ্ধান্ত। বঙ্গবন্ধু এ সময় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে কোনো আপস যাতে না করতে হয়, প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে এ রকম একটি শক্তিশালী বন্ধুত্বের ভিত রচনা করেন।[১৪] তাই শুধু স্বীকৃতির কূটনীতিই মুখ্য নয়, এ সময় দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় বিভিন্ন আলোচনায় বাংলাদেশ তার রাজনৈতিক মূল্যবোধ শক্ত অবস্থানে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুকে বাংলা ভাষায় রাষ্ট্রপ্রধানের ভাষণ দিতে

শুনতে পাই। এই ভাষণের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের আগে জাতিসংঘের স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনার দাবি রাখে।

১৯৭১-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক রাজনীতি ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া আরও তিনটি ফ্রন্টে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ছিল। এর মধ্যে চীন, পাকিস্তান ও পাকিস্তানকেন্দ্রিক আরব বিশ্ব এবং যুক্তরাষ্ট্রকে ঘিরে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক কূটকৌশল নির্মিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন স্বাধীনতার অব্যবহিত পরপরই দৃশ্যমান হয়। ১৯৭২ সালের এপ্রিলে স্বীকৃতি প্রদান করার মাধ্যমে আমেরিকা মানবিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এবং দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের ইঙ্গিত প্রদান করে। তাই স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটির বাংলাদেশবিরোধী যে ভূমিকা, তা কিছুটা প্রশমিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু এ বিষয়টি আসলে আলোচনার দাবি রাখে যে আমেরিকা কতখানি বন্ধুত্বপূর্ণ সহমর্মিতা প্রকাশ অব্যাহত রেখেছিল।

অপর দিকে ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে দুবার চীন জাতিসংঘে ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করার মাধ্যমে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তীকরণ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য প্রথম দরখাস্ত করেছিল ১৯৭২ সালের ৮ আগস্ট। নিরাপত্তা পরিষদে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও যুগোস্লাভিয়ার উত্থাপিত প্রস্তাবে ২৫ আগস্ট ভেটো দেয় চীন। পাকিস্তানের রাজনৈতিক কূটকৌশল এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল এবং চীন পাকিস্তানের সঙ্গে তার ঐতিহাসিক সম্পর্কের সঙ্গে কোনো আপস করেনি। চীনের ভূমিকা নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধুকে বিচলিত করে থাকতে পারে কিন্তু এর বহিঃপ্রকাশ চীনের সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্ক স্থাপন করে চলার লক্ষণ দেখা যায়নি। চীনের কার্যক্রমের ফলে বরং এই উপলব্ধি হয় যে বাংলাদেশ যত দিন পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বাভাবিক না করতে পারছে, তত দিন পর্যন্ত চীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অগ্রযাত্রায় একটি বড় বাধা হিসেবে আবির্ভূত হতে থাকবে। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেন এই বিষয় মাথায় রেখে তাঁদের পদক্ষেপসমূহ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তার মধ্যে একদিকে ছিল বিভিন্ন উপায়ে চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো এবং পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে নেওয়ার মাধ্যমে আরব বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ত্বরান্বিত করা।[১৫]

১৯৭৪ সালটি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এই বছরে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) লাহোর সভা আয়োজন বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আরব বিশ্বের মধ্যে সম্পর্কের এক নতুন মাত্রা যুক্ত করে। সংস্থাটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বছরের শুরু থেকেই বাংলাদেশে এসে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে বাংলাদেশের সম্মতি আদায়ের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন। কুয়েতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ওআইসির মহাসচিবের নেতৃত্বে একটি

উচ্চপর্যায়ের দল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রথম প্রশ্ন ছিল, 'লাহোরের মাটিতে কেন হতে হবে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার সভা? আর কোনো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে হওয়ার সম্ভাবনা কি ছিল না?' তিনি দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দেন, 'পাকিস্তানের মাটিতে যাওয়া এ অবস্থায় সম্ভব নয়।'[১৬] ওআইসির নেতারা যখন বিভিন্ন তথ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছিলেন, তিনি ধৈর্যসহকারে তাঁদের বক্তব্য শুনছিলেন এবং তিনি আলোচনার পথ অবরুদ্ধ করেননি। মূল আলোচনা যখন ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার দাবিতে এসে অচলাবস্থায় ধাবিত হতে থাকে, বঙ্গবন্ধুকে তখন এ বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নিতে দেখা যায়। এ বিষয়টি যে একান্ত দ্বিপক্ষীয় নয়, এ আলোচনা ভারত ও পাকিস্তানের উপস্থিতিতে হওয়া প্রয়োজন, তাই বারবার স্মরণ করিয়ে দেন। তদুপরি বঙ্গবন্ধু আলোচনায় পাকিস্তানের স্বীকৃতির বিষয়টির ওপর বেশ জোর দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু ওআইসির সদস্যদের মনে করিয়ে দেন, 'আমরা শান্তি ও সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাই। আমরা সকল বিষয়ের সমাধান করতে চাই, কিন্তু যত দিন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়া হবে, তত দিন পর্যন্ত কোনো আলোচনা চলবে না।'[১৭] এই দলটির বাংলাদেশ ত্যাগের ২৪ ঘণ্টার মাথায় পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং তার প্রতি-উত্তরে বাংলাদেশ পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দেয় ও লাহোর সভায় অংশগ্রহণ করার সম্মতি জ্ঞাপন করে। এ বিষয়ে বিশিষ্ট কূটনীতিক ফকরুদ্দীন আহমেদ তাঁর *ক্রিটিক্যাল টাইমস : মেমোয়ারস অব আ সাউথ এশিয়ান ডিপ্লোম্যাট* বইয়ে বলেন, এই আলোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়াটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মুহূর্ত, যা বাংলাদেশের স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। কারণ এই আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর বঙ্গবন্ধু তা ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অবহিত করেন।[১৮] এই নীতির ফলে আমরা দেখতে পাই তুরস্ক, ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। একমাত্র সৌদি আরব ছাড়া আরব বিশ্বের মোটামুটি সব দেশের সমর্থন আদায় করা সম্ভব হয়।

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের এই আপাত-উন্নয়ন চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের আগের অবস্থানের একটি পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির আবেদন নিয়ে চীনের সঙ্গে ১৯৭৪ সালে নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কূটনীতিক পর্যায়ে বিশদ আলোচনা হয়। যদিও পাকিস্তানের একটি প্ররোচনা ছিল, পাকিস্তানি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর নির্ধারিত বাংলাদেশ সফরের আগে বাংলাদেশ যেন জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির আবেদন না করে। চীন বিষয়টি বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনায় উত্থাপন করেছিল, কিন্তু বাংলাদেশি কূটনীতিকদের যুক্তিসংগত অবস্থানের কারণে

বিষয়টি আর কোনো অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি।[১৯] তদুপরি আরেক বিশিষ্ট সাবেক কূটনীতিক এস এ করিম (২০১৪) তাঁর *শেখ মুজিব: ট্রাইয়াম্ফ অ্যান্ড ট্র্যাজেডি* বইয়ে আলোচনা করেছেন: বাংলাদেশ যেভাবে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ৯৩ হাজার বন্দী বিনিময় ও যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ের বিষয়টি সমাধান করতে পেরেছিল, এরপর আসলে চীনের বিরোধিতা করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ অবশিষ্ট ছিল না।[২০] তাই আমরা দেখতে পাই, চীন ১৯৭৪ সালে নিরাপত্তা পরিষদের সভায় বাংলাদেশের সদস্যপদ বিষয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপন করেনি। এভাবে ১৯৭৪ সালের ১০ জুন নিরাপত্তা পরিষদের এক নির্ধারিত সভায় সব সদস্যদেশ অবিসংবাদিতভাবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রদানের সুপারিশ সাধারণ পরিষদে পাঠায়। এভাবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের বাৎসরিক অধিবেশনে ভাষণ দিতে সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে যাত্রা করেন।

জাতিসংঘে ভাষণের সারবত্তা বিশ্লেষণ

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে দেওয়া ভাষণটি সেই আসরে কোনো রাষ্ট্রনায়কের বাংলায় দেওয়া প্রথম কোনো ভাষণ। বঙ্গবন্ধু শুরু করেন:

> আজ এই মহান পরিষদে আপনাদের সামনে দুটো কথা বলার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। মানব জাতির এই মহান পার্লামেন্টে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রতিনিধিত্ব লাভ করায় আপনাদের মধ্যে যে সন্তোষের ভাব লক্ষ করেছি, আমিও তার অংশীদার। বাঙালি জাতির জন্য এটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। কারণ তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম আজ বিরাট সাফল্যে চিহ্নিত।[২১]

১০ মিনিটের কিছু কম সময়ের এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দৃঢ় আস্থার পরিচয় দিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রদান করে গেছেন। চিরসবুজ বাগ্মিতার পরিচায়ক যে বঙ্গবন্ধুকে বাঙালি জাতি চেনে, এ যেন তারই এক পুনরাবৃত্তি ঘটল। একটি বারের জন্য মনে হয়নি নিউইয়র্কের এই মঞ্চটি তাঁর জন্য নতুন বা এই অভিজ্ঞতা তাঁর জন্য প্রথম। জাতিসংঘের সনদের রেফারেন্স থেকে শুরু করে তাঁর বক্তৃতা জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ার জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা ও চরম মুক্তির জন্য চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জুগিয়েছে এবং একটি ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতি আন্তর্জাতিক নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ বাংলাদেশের তৎকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে বৈশ্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার যে সামঞ্জস্য রয়েছে, সে সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে। তিনি বলেন:

> সাম্প্রতিককালে গোটা বিশ্বে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে আমাদের

> আরও ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এ বছরের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত এই পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে বিশ্বের বর্তমান গুরুতর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আমি এমন একটি দেশের পক্ষ থেকে কথা বলছি, যে দেশটি বর্তমানে অর্থনৈতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকার শীর্ষস্থানে রয়েছে।...যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের ওপরই বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। তারপর থেকে আমরা একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি। সর্বশেষ এবারের নজিরবিহীন বন্যা। সাম্প্রতিক বন্যা বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমরা জাতিসংঘ, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ ও সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে কৃতজ্ঞ।[২২]

একই সঙ্গে তিনি তাঁর বক্তৃতায় সমাধানের পথের ওপর আলোকপাত করেন এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন :

> এই চ্যালেঞ্জ হচ্ছে একটা ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যুক্তির শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা। এই ব্যবস্থায় থাকবে নিজের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর প্রতিটি দেশের সার্বভৌম অধিকারের নিশ্চয়তা। এই ব্যবস্থা গড়ে তুলবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বাস্তব কাঠামো, যার ভিত্তি হবে স্থিতিশীল ন্যায়সংগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বের সকল দেশের সাধারণ স্বার্থের স্বীকৃতি...আন্তর্জাতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সমঝোতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশই যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করতে সক্ষম, সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, বর্তমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাস করা সম্ভব হলে অর্থনৈতিক সংকট দূর করার পরিবেশই শুধু গড়ে উঠবে না, এই প্রতিযোগিতায় যে বিপুল সম্পদ অপচয় হচ্ছে, তা মানবজাতির সাধারণ কল্যাণে নিয়োগ করা সম্ভব হবে।[২৩]

তিনি একটি সামষ্টিক দায়িত্বশীলতার উপলব্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তব্যটি শেষ করেন। তিনি উল্লেখ করেন :

> সর্বশেষে আমি মানবের অসাধ্য সাধন ও দুরূহ বাধা অতিক্রমের অদম্য শক্তির প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থার কথা আবার ঘোষণা করতে চাই। আমাদের মতো দেশসমূহ, যাদের অভ্যুদয় সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে, এই আদর্শে বিশ্বাসই তাদের বাঁচিয়ে রাখবে। আমাদের কষ্ট স্বীকার করতে হতে পারে, কিন্তু আমাদের ধ্বংস নাই। এই জীবনযুদ্ধের মোকাবেলায় জনগণের প্রতিরোধক্ষমতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাই শেষ কথা। আত্মনির্ভরশীলতাই আমাদের লক্ষ্য। জনগণের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগই আমাদের নির্ধারিত কর্মধারা।[২৪]

বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের মূল শক্তিটি ছিল তাঁর কথনশৈলী, যেখানে কৃত্রিমতার আবেশ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তিনি শুরু করেছেন 'আমিও তার অংশীদার' দিয়ে, অর্থাৎ এখানে 'আমি'র ব্যবহার রয়েছে। এর দ্বারা একজন নেতার কাছ থেকে নিজ দায়িত্বের দায়ভার গ্রহণ করে তা প্রকাশ করার প্রত্যয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের ওপর বিশ্বাস ও আত্মসম্মানের থেকে 'আমি'র ব্যবহার এ ধরনের ভাষণে করা হয়ে থাকে। কিন্তু তার অব্যবহিত পরেই আমরা শুনতে পাই, বঙ্গবন্ধু বলছেন,

'জাতিসংঘ সনদে যে মহান আদর্শের কথা বলা হয়েছে, তা আমাদের জনগণের আদর্শ এবং এই আদর্শের জন্য তারা চরম ত্যাগ স্বীকার করেছে। এমন এক বিশ্বব্যবস্থা গঠনে বাঙালি জাতি উৎসর্গীকৃত, যে ব্যবস্থায় মানুষের শান্তি ও ন্যায়বিচার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে এবং আমি জানি আমাদের এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণের মধ্যে আমাদের লাখো শহীদের বিদেহী আত্মার স্মৃতি নিহিত রয়েছে।' এই জায়গায় 'আমাদের'-এর ব্যবহার সামষ্টিক ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং বঙ্গবন্ধু যে একজন জনমানুষের নেতা, তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই সেই প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে, যেখানে মানুষের শান্তি ও ন্যায়বিচার লাভের জন্য সামষ্টিক প্রতিজ্ঞার প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

স্বশাসনের অধিকার যে বৈশ্বিক এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের যৌক্তিকতা যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়, তা প্রতীয়মান হয়। বঙ্গবন্ধুর পুরো ভাষণে বিষয়টি বারবার ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, বাঙালির 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম আজ বিরাট সাফল্যে চিহ্নিত। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে মুক্ত ও সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকারের জন্য বাঙালি জাতি বহু শতাব্দী ধরে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। তারা চেয়েছে বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করতে।' তিনি বাংলাদেশের জয়কে আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম ও গিনি বিসাউয়ের জয়যাত্রার সঙ্গে আলোচনা করে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের স্বাধিকারের প্রসঙ্গটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই জয় দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে ইতিহাস জনগণের পক্ষে এবং ন্যায়ের চূড়ান্ত বিজয় অবধারিত।

বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে তাঁর ভাষণে দেশ পরিচালনায় তাঁর প্রতি যে চ্যালেঞ্জগুলো এসেছে এবং তা মোকাবিলায় তাঁর পদক্ষেপগুলো তিনি সবাইকে অবহিত করেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার নিমিত্তে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের গুরুত্ব উপস্থিত সভাসদের কাছে তুলে ধরেন। তিনি বলেন :

> ১৯৫ জন যুদ্ধ-অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করে এই উপমহাদেশে শান্তি ও সহযোগিতার নতুন ইতিহাস রচনার কাজে আমরা আমাদের আন্তরিকতার প্রমাণ দিয়েছি। এই ১৯৫ জন যুদ্ধ-অপরাধীর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে লিপ্ত থাকার অসংখ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল, তবু সকল অপরাধ ভুলে গিয়ে আমরা ক্ষমার এমন উদাহরণ সৃষ্টি করতে চেয়েছি, যা এই উপমহাদেশে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সহযোগিতার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। উপমহাদেশের শান্তি নিশ্চিত করার কাজে আমরা কোনো পূর্বশর্ত দিই নাই কিংবা দরকষাকষি করি নাই। বরং জনগণের জন্য আমরা এক সুকুমার ভবিষ্যৎ প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবান্বিত হয়েছি। অন্যান্য বড় বিরোধ নিষ্পত্তির কাজেও আমরা ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক সমঝোতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছি।

এই অবস্থানের পেছনের রাজনীতি এই প্রবন্ধে কিছুটা আলোচিত হয়েছে, যেখানে

আমরা বঙ্গবন্ধুকে ওআইসির দলের সঙ্গে আলোচনারত অবস্থায় পাকিস্তানের কিছু দাবি নিয়ে একটি প্রগতিশীল অবস্থান থেকে তাঁর কূটনীতি পরিচালনা করার প্রচেষ্টা দেখতে পাই।[২৫] এই পর্যায়ে এসে বলা যায়, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের যে চ্যালেঞ্জ ছিল, বঙ্গবন্ধু তাকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তা নিবারণে বৈরিতার বদলে সংস্কারমুক্ত হয়ে খোলা মনে সমস্যাগুলো নিবারণের পথে অগ্রসর হয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণে তথ্যের বহু ব্যবহার দেখা গেছে। তিনি দেশের তৎকালীন অর্থনৈতিক দুরবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ এক বর্ণনা উপস্থাপন করেন। এখানে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভাব ও তার ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দরুন আমাদের মতো একটি দেশের জন্য দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকার ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে। জনসাধারণের জীবনধারণের মান নিছক বেঁচে থাকার পর্যায় থেকেও নিচে নেমে গেছে। মাথাপিছু যাদের বার্ষিক আয় ১০০ ডলারেরও কম, তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বেঁচে থাকার জন্য যে ন্যূনতম খাদ্য প্রয়োজন, তার থেকে কম খাদ্য খেয়ে যারা বেঁচে ছিল, তারা সম্পূর্ণ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।'[২৬] অর্থাৎ, বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্ব অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বব্যবস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান যে বিচ্ছিন্ন নয়, তা-ই সবার সামনে তুলে ধরেন।

জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের কথা বারবার উত্থাপিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার এলাকারূপে ঘোষণার অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছি। আমাদের বিশ্বাস, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বিশ্বের যে উদীয়মান জাতিসমূহ একত্রিত হয়েছিলেন, তাঁরা শান্তির পক্ষে শক্তিশালী সমর্থন জুগিয়েছেন। তাঁরা বিশ্বের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অভিন্ন প্রতিজ্ঞার কথাই আবার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণার লক্ষ্য জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।'[২৭] শান্তি ও স্বশাসন রক্ষা করার যে অঙ্গীকার বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জনগণের কাছে সব সময় করে গেছেন, তার প্রতিফলন আমরা এই ভাষণে দেখতে পাই বঙ্গবন্ধুর আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা রয়েছে তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তা ছাড়া এ ধরনের অবস্থানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতিসমূহের মধ্যে যে জটিল মাত্রার সংলগ্নতা ও সংযোগ রয়েছে, তা-ই পুনরায় প্রতীয়মান হয়।

ওআইসি সম্মেলন (১৯৭৪) এবং জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে (১৯৭৩) বঙ্গবন্ধুর ভাষণগুলোর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে ওআইসির সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। তিনি ওআইসির মহাসচিবকে সম্মেলনটির সংগঠক হিসেবে ধন্যবাদ

দেওয়া ছাড়াও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। এ বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে তিনি উদ্ধৃত করেন, 'এভাবে [এ সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ করার মাধ্যমে] দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। দেশগুলোর সার্বভৌমত্বকে বজায় রেখে আলোচনার পথ প্রশস্ত করার যে দ্বার উন্মুক্ত হলো, তা দক্ষিণ এশিয়া তথা সারা বিশ্বে শান্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'[২৮] এ ক্ষেত্রে পুনরায় প্রতীয়মান হয় যে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বঙ্গবন্ধু প্রত্যাখ্যানের মনোভাব না রেখে সেগুলোকে যথাযথ স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে তা সমাধান করতে সচেষ্ট ছিলেন। অর্থাৎ, এক পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মধ্যে প্রথিত ছিল।

আরব বিশ্ব ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধনকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যদিও তিনি অবগত, সৌদি আরবের মতো ক্ষমতাশালী দেশ তখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। তদুপরি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি জামায়াতে ইসলামী ও পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সৌদি আরব তার বাংলাদেশনীতি নির্ধারণ করে থাকে। এই চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও তিনি যে আশার বাণী দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেন, তা হলো :

> It is important for us to emphasize that this conference can be useful not only to consolidate our unity in support of the cause of Arab Brethren but we can at the same time declare our solidarity with the forces of peace and progress throughout the world with the non-aligned nations; with the oppressed people of the world struggling against colonialism, imperialism and racism and all those people who are struggling against domination and exploitation of all forms. The historic injustices which have been inflicted on our brethren must be redressed.[২৯]

তিনি ফিলিস্তিনের মানুষের অধিকার ও সুবিচারের বিষয়টি আবার সবার সামনে তুলে ধরেন। আরবের জমির ওপর ফিলিস্তিনের যে অধিকার, তা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর ওআইসির সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক নতুন যুগের সূচনা করে। ভারতের মতো এক পরাক্রমশালী দেশ ও ইন্দিরা গান্ধীর মতো এ রকম লৌহমানবী যখন বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু, সেখানে পাকিস্তানের সঙ্গে পুরোনো শত্রুতার অবসান ঘটিয়ে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে একধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে এক বাস্তবধর্মী পররাষ্ট্রনীতির বহিঃপ্রকাশ ছিল। এক দিকে বাংলাদেশের সংবিধানে 'ধর্মনিরেপক্ষতা' একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর, অপর দিকে পাকিস্তানের প্ররোচনায় বাংলাদেশ তখনো আরব বিশ্বের অনেকের কাছে ভারতের

অঙ্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত। এই ওআইসির সাবেক সম্মেলনগুলোতে পাকিস্তান বাংলাদেশ সম্পর্কে বহু মিথ্যাচার রটিয়েছে।[৩০] সেই মুহূর্তে তাই একজন বাস্তববাদী ও প্রগতিশীল নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর জন্য বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে আরব বিশ্বের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করাই ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত হয় জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন। সেখানে বঙ্গবন্ধু তাঁর জোট নিরপেক্ষ অবস্থানের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রসারের ক্ষেত্রে দেশসমূহের স্বশাসনের অধিকার থাকা যে জরুরি, তা বঙ্গবন্ধুর ভাষণে পরিস্ফুটিত হয়। তিনি বলেন, 'Let this conference unequivocally pledge its positive support to those who are struggling for national liberation and for their realisation of their legitimate rights in Africa, Asia and Latin America.'[৩১] তিনি বিশ্বব্যাপী অস্ত্রের প্রসার বন্ধে রাষ্ট্রগুলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। তদুপরি স্নায়ুযুদ্ধকালে সহিংসতা কমানোর লক্ষ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে 'শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার এলাকা' হিসেবে তৈরি করা এবং ভারতীয় মহাসাগর এলাকায় সব ধরনের সংঘর্ষের অবসান ঘটানোর দাবির সপক্ষে বাংলাদেশের সহাবস্থান বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় উপস্থাপন করেন।

বঙ্গবন্ধুর বিশ্বদর্শন ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সমাপনী-পূর্ব আলোচনা

এই প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মূলত তিনটি আন্তর্জাতিক ভাষণের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। মার্গারেট জি হারম্যানের (১৯৭০) রোল থিওরি ব্যবহারের মাধ্যমে এই ভাষণগুলোর বিশ্লেষণ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বাংলাদেশের কূটনৈতিক অবস্থান বিশ্লেষণ করলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও তাঁর প্রভাব সম্পর্কে যে ধারণা লাভ হয়, তা হলো, বঙ্গবন্ধু তাঁর নেতৃত্বের সহজাত দক্ষতা (charishmatic), অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তাঁর বহু দিনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত নির্দেশিকা নেতৃত্ব (directive) এবং সমন্বয়মূলক নেতৃত্ব (accommodative) প্রদান করার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইস্যুকে নিয়ে তা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করতেন।

নেতৃত্ব তাঁর মধ্যে সহজাত। যেকোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের অভিজ্ঞতা বহুদিন থেকে তাঁর মধ্যে প্রথিত। তাঁর এই নেতৃত্বের সহজাত দক্ষতার মূলে রয়েছে তাঁর পরিবার থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা। বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে উল্লেখ করেছেন, তাঁর পিতা তাঁকে উপদেশ দিতেন, 'তোমার কাজের প্রতি যদি আন্তরিকতা থাকে, কাজের উদ্দেশ্যে যদি সততা থাকে, তবে তুমি কখনোই জীবনে পরাজিত হবে না।'[৩২] বঙ্গবন্ধু তাঁর পরবর্তী জীবনে এই মূল্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং তাঁর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি প্রণয়নে আমরা এর প্রতিফলন দেখতে

পেয়েছি। বঙ্গবন্ধুর সময়ে তাঁর একসময়কার অনুজ রাজনৈতিক শিক্ষানবিশ এবং পরবর্তী সময়ে আওয়ামীবিরোধী শিবিরে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ তাঁর *বাংলাদেশ : এরা অব শেখ মুজিবুর রহমান* গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সমালোচনা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হন, 'আমাদের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা হচ্ছে মুজিব। মৃত্যুতে তাঁর সমাপ্তি ঘটেনি। তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে একজন আলোচিত ও মহান ব্যক্তি হিসেবে বিরাজ করবেন।'[৩৩]

তাঁর প্রতিটি ভাষণে এক সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনামূলক রূপ রয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে তিনি ভবিষ্যতে জাতিসংঘের ত্রাণ ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ও তার সদস্যরাষ্ট্রগুলোর প্রতি আবেদন জানান। একইভাবে আমরা জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন এবং ওআইসির সভায় বঙ্গবন্ধুকে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে দেখি, যা তাঁকে জাতীয় নেতৃত্বের ঊর্ধ্বে উঠে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এক অনন্য পরিচয় প্রদান করে। বিশেষ করে এই দুই সম্মেলনে ফিলিস্তিনের জনগণের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ এবং তাদের অধিকার নিয়ে বঙ্গবন্ধু যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে নিপীড়িত মানুষের মানবাধিকারের বিষয়টি অতিগুরুত্বের সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হিসেবে স্থাপিত হয়েছে।

সমন্বয়মূলক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু অতুলনীয়। তিনি তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেনের সাহচর্যে কিছু অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ দল তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এস এ করিম, ফকরুদ্দীন আহমেদ, মহিউদ্দীন আহমেদ, কে এম শিহাবউদ্দীন এবং এ এইচ মাহমুদ আলী প্রমুখ। এই দল বঙ্গবন্ধুকে তাদের সার্বিক সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে তাঁর নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহায়তা করত। বঙ্গবন্ধু সমন্বয় করতেন এমনভাবে, যাতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাধাগুলো দূর হয়ে যায় এবং একধরনের ঐকমত্যের ওপর ভিত্তি করে এবং সবার সমৃদ্ধিসাধনের মাধ্যমে সামষ্টিক উন্নয়ন সাধন করা যায়। বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা যে বিচ্ছিন্ন বিষয় ছিল না, এখানে চীন ও আরব বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি একই সুতায় গাঁথা ছিল, তা উপলব্ধি করার মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করার পরিপক্কতা বাংলাদেশের হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের সফল সমন্বয় সাধন করার গুণাবলি অর্জন করার মাধ্যমে।

পরিশেষে

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে অবস্থিত আমেরিকান কূটনীতিক আর্চার কে ব্লাড তাঁর *দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ : মেমোয়ারস অব অ্যান আমেরিকান ডিপ্লোম্যাট* বইয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে 'আপাতদৃষ্টিতে অসাধ্য স্বপ্নকে উজ্বল জ্বলজ্বলে বাস্তবতায় রূ

পান্তরের' সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৩৪] কিন্তু একটি তথাকথিত 'অলস স্বপ্নের' উজ্জ্বল বাস্তবতায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা একাডেমিক গবেষণায় আরও বেশি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে সেই প্রচেষ্টা করা হয়েছে, যা অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের যে দক্ষতা, তার প্রতিফলন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কীভাবে বিকশিত হয়েছে, সে বিষয়ে একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে। 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং কারও সঙ্গে বৈরিতা নয় (Friendship to all and malice towards none)—বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির এই মূলভিত্তি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ থেকে উদ্ধৃত। বাস্তবসম্মত ও প্রায়োগিক এই নীতি এখনো বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল দর্শন হিসেবে বিবেচিত। এসব বাক্যের মাধ্যমে হয়তো অনেকের এই ধারণা হতে পারে যে শুধু শান্তিপ্রিয় একধরনের পররাষ্ট্রনীতিকে প্রচার করা হচ্ছে। সেটা অনেকাংশে সত্য, তবে এ-ও সবার উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বশান্তির বিষয়টি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে জটিল ও অধরা। এ অবস্থায় বৈরিতাকে প্রশ্রয় দেয়—এ ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়। তাই বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ যেভাবে ভারত ও চীনের সঙ্গে বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে সমান্তরাল গতিতে কূটনৈতিক সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে আমরা সবার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে বাস্তবিক পররাষ্ট্রনীতির উদাহরণ দেখতে পাই। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশের আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যেও আমরা এই নীতির প্রতিফলন দেখতে পাই। সুতরাং 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব' বাংলাদেশের বিশ্বদর্শনের এক চিরন্তন সত্য। বঙ্গবন্ধু তাঁর নেতৃত্বের সহজাত দক্ষতা (charishmatic), অভিজ্ঞতাপ্রসূত নির্দেশিকা (directive) ও সমন্বয়মূলক (accommodative) পারদর্শিতা প্রদর্শনের মাধ্যমে এই সত্যকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সুদৃঢ় কাঠামো বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করে গেছেন।

তথ্যসূত্র

১. Margaret G. Hermann, "Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders." *International Studies Quarterly*, no. 24, (1970), pp.07~46.

২. Ali Riaz. *God Willing : The Politics of Islamism in Bangladesh*, Rowman & Littlefield, 2004, p.179.

৩. ডয়চে ভেলে, 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, ৩১.১০.২০১৭, দেখুন : http://www.dw.com/bn/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%

A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%90%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A7%AD-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0% E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%A3/a-41185982

৪. মোহম্মদ শাহজাহান, '৭ মার্চের ভাষণ : পটভূমি ও তাৎপর্য', ৭ মার্চ ২০১৫, https://www.facebook.com/awamileague.1949/posts/345399685649896:0

৫. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ (অডিও ও লিখিত), http://www.somewhereinblog.net/blog/notredamean/28921021

৬. http://www.bbc.com/bengali/news-41813131

৭. *ভোরের ডাক*, 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ মহাকাব্য—ড. জাফর ইকবাল' ১৯ নভেম্বর ২০১৭, http://bhorer-dak.com/details.php?id=84522.

৮. Walter Carlsnaes, "The Agency-Structure Problem in Foreign Policy Analysis." *International Studies Quarterly* 36 (1992): 245-270.

৯. Valerie M. Hudson, *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*, Rowman & Littlefield Publishing Group Inc, 2007, p.10.

১০. Hudson, *Foreign Policy Analysis*.

১১. Margaret G. Hermann (1970) "Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders." *International Studies Quarterly*, no. 24, 7~46.

... (1978) "Effects of Personal Characteristics of Leaders on Foreign Policy." In *Why Nations Act*, edited by M. A. East, S. A. Salmore, and Charles. F. Hermann. Beverly Hills, CA: Sage.

... -(1979) "Who Becomes a Political Leader? Some Societal and Regime Influences on Selection of a Head of Government." In *Psychological Models in International Politics*, edited by Lawrence Falkowski. Boulder, CO: Westview.

... (1984) "A Study of 53 Heads of Government." In *Foreign Policy Decision Making : Perception, Cognition, and Artificial Intelligence*, edited by Donald A. Sylvan and Steve Chan, 53~80. New York : Praeger.

১২. মহিউদ্দিন আহমদ, 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনেক সাফল্য কিছু ব্যর্থতা এবং তিনটি কলংক', *যুগান্তর*, ১৮ আগস্ট ২০১৪, http://www.jugantor.com/old/window/2014/08/18/136168

১৩. Imtiaz Ahmed, Bangladesh Foreign Policy : Constraints, Compulsions and Choices, *BIISS Journal*, vol. 32, no. 3, July 2011 : 207-218.
১৪. Craig Baxter, *Bangladesh: From a Nation to a State*, Boulder, Colorado, Westerview Press, 2006.
১৫. Justus Kroef, 'Bangladesh: The Burdens of Independence', *Asian Affairs*, Vol. 1, No. 6 (1974), pp. 377-389.
১৬. Fakhruddin Ahmed, *Critical Times: Memoires of a South Asian Diplomat*, Dhaka: UPL, 1994, pp.100-04.
১৭. Fakhruddin Ahmed, *Critical Times*, 1994, p.103.
১৮. Fakhruddin Ahmed, *Critical Times*, 1994, p.104.
১৯. Fakhruddin Ahmed, *Critical Times*, 1994, p.114-122.
২০. S. A. Karim, *Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy*, Dhaka: UPL, 2014, p. 340.
২১. বাংলা ভাষায় বঙ্গবন্ধু কর্তৃক জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, http://imli.gov.bd/test6/.
২২. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, http://imli.gov.bd/test6/.
২৩. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট, http://imli.gov.bd/test6/
২৪. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, http://imli.gov.bd/test6/
২৫. আরও বিস্তারিত পড়ার জন্য, Fakhruddin Ahmed, *Critical Times: Memoirs of a South Asian Diplomat*, Dhaka: UPL, 1994, pp.100-110.
২৬. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, http://imli.gov.bd/test6/.
২৭. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, http://imli.gov.bd/test6/.
২৮. Rabindranath Tribedi, *International Relations of Bangladesh and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 1974-75*, Vol. II, Dhaka: Parama, 1999, p.91-93.
২৯. Tribedi, *International Relations of Bangladesh*, II, p.92.
৩০. Kamal Hossain, *Bangladesh: Quest for Freedom and Justice*, Dhaka: UPL, 2016, p. 236.
৩১. Rabindranath Tribedi, *International Relations of Bangladesh and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 1974-75*, Vol. I, Dhaka: Parama, 1999, p.398-9.
৩২. Sheikh Mujibur Rahman, *The Unfinished Memoirs*, Dhaka: UPL, 2012, p.
৩৩. Moudud Ahmed, *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman*, Dhaka: UPL, 1983, p.13.
৩৪. Archer K. Blood, *The Cruel Birth of Bangladesh: Memoirs of an American Diplomat*, Dhaka: UPL, 2002.

রাজনীতি ও ইতিহাসতত্ত্ব

অন্ধকারে হাতড়ানো : একাত্তরের বহুমুখী বয়ান এখনো আসেনি

নাঈম মোহায়মেন

সারসংক্ষেপ

৪৬ বছর পার হওয়ার পরও বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস জড় বস্তু হিসেবেই রয়ে গেছে। ইতিহাসের বয়ানগুলো এখনো বহুমাত্রিক আলোচনা গ্রহণ করতে নারাজ। যেই জটিল এবং স্ববিরোধী সমীকরণের সমষ্টি থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল, ঐতিহাসিকেরা আজও সেই জটগুলো খোলার চেষ্টা করেনি। একই সঙ্গে, জাতিগত বিদ্বেষ এবং উন্মত্ততার যেই মিশেল পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহিংসতার পথে নিয়ে গিয়েছিল, তারও ব্যাপক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই গবেষণা বাংলাদেশকে স্বাধীনতা-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের অর্থপূর্ণ বিশ্লেষণে সাহায্য করবে এবং পাকিস্তানকে তার বর্তমান সামগ্রিক সংকটের মূল খুঁজতে সহায়তা করবে। যুদ্ধ নিয়ে লেখা বেশ কয়েকটি নতুন বইয়ের মধ্যে একটি হচ্ছে শর্মিলা বসুর *ডেড রেকনিং* (অন্ধকারে নিশানা)। এই বই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ মোচনের একটি অসংলগ্ন প্রচেষ্টা। এত দিন পরও আমরা অপেক্ষা করছি একাত্তরের সহিংসতার প্রকৃতি, সংকটের দফারফা, অনিচ্ছাকৃত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং ইতিহাসের এতিমদের একটি অনুপুঙ্খ তদন্তের জন্য। যুদ্ধের সময় মানুষ সব সময়ই স্ববিরোধিতা, সাহসিকতা, ভীতি এবং স্নায়ুবৈকল্যের সমন্বয়ে কাজ করে। এটাই মানুষ হওয়ার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য—স্থিরতার অভাব। বাংলাদেশ এখনো ১৯৭১-এর সেই মানবিক ইতিহাসের জন্য অপেক্ষা করছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : ১৯৭১, গবেষণা, বয়ান, কথ্য ইতিহাস, নথিপত্র

> ‘১৯৭৩ সালে আমি ছয় মাস পাগলাগারদে ছিলাম। আমি কেন পাগল হয়ে গেলাম? আসলে আমি সেনাবাহিনীর আগ্রাসনের সামষ্টিক অপরাধবোধে ভুগছিলাম, যে গণ-অপরাধ ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই বন্ধ করা উচিত ছিল।’
> —কর্নেল নাদির আলী, পাকিস্তানি সেনাসদস্য, *আ খ্যাকি ডিসিডেন্ট অন ১৯৭১*।

ভূমিকা

বাংলাদেশ ৪৭ বছরে পদার্পণ করল। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং যুদ্ধের সময় সংঘটিত গণহত্যা, বাংলাদেশের অস্তিত্ব এবং গতিপথের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে রয়েছে। কিন্তু বহির্বিশ্বে ১৯৭১ প্রায়বিস্মৃত একটি অধ্যায়। বাংলাদেশি ঐতিহাসিকদের অধিকাংশ কাজই বাংলায়, যার ফলে এই প্রান্তিকায়ন আরও বেড়ে গেছে। পশ্চিমা গণমাধ্যমে সচরাচর 'তৃতীয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ' হিসেবেই একাত্তরকে উল্লেখ করা হয়। এই ভুল নামকরণ ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের জন্য সুবিধাজনক, কারণ তারা প্রচলিত ইতিহাসকে তাদের নিজ দাবির সপক্ষে দেখিয়ে (বিশেষ করে কাশ্মীরে) ফায়দা হাসিল করে।

স্বাধীনতার আরও একটি বর্ষপূর্তি উপলক্ষে [মূল লেখাটি ইংরেজিতে বেরিয়েছিল ২০১১ সালে] যুদ্ধের বিষয়ে বেশ কয়েকটি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে : বইয়ের লেখকেরা হচ্ছে নয়নিকা মুখার্জি[১], ইয়াসমিন সাইকিয়া[২], শ্রীনাথ রাঘাভান এবং সলিল ত্রিপাঠি। তবে সবার আগে প্রকাশিত হয়ে গেছে শর্মিলা বসুর *ডেড রেকনিং*। এই বইয়ে আছে কিছু মৌলিক গবেষণা এবং কিছু উগ্র পলেমিক। সেই পলেমিকের স্বর এত কর্কশ যে ভিন্নমতাবলম্বী বয়ান হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে।

ডেড রেকনিং লেখিকা শর্মিলা নিজেকে কাহিনির কেন্দ্রে স্থাপন করেছে এবং তার নেওয়া সাক্ষাৎকারগুলো এই বইয়ের মৌলিক উপাদান। নম্রতার ছলনায় সে সূচনায় বলেছে, '১৯৭১ সালের সঙ্গে আমার যে বর্ণনাতীত সম্পর্ক, তা ভবিষ্যৎ অন্য কোনো লেখকের থাকবে না'[৩] (পৃ. ১৫), 'আমার গবেষণা অদ্বিতীয় হয়ে থাকবে' (৬) এবং 'আমার পক্ষপাতহীনতা পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল' (৯)। বসুর পূর্বনির্ধারিত পক্ষপাত প্রকাশ পায় ঘটনা নির্বাচন, নির্দিষ্ট বর্ণনার প্রতি বিশ্বাসপ্রবণতা এবং অন্য বিশ্বাসকে নাকচ করার মধ্য দিয়ে। বসুর ঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে পক্ষপাতিত্বকে সংশোধন করা। কিন্তু তা করতে গিয়ে তার গবেষণা এতটাই বিপরীতগামী হয়েছে যে নতুন একধরনের পক্ষপাতিত্ব তৈরি হয়েছে। বইটি শেষ পর্যন্ত সংশোধনের মাধ্যমে বিশোধনের রূপ নিয়েছে।

বইয়ের সূচনায় বসু লিখেছে, ১৯৭১ নিয়ে ভারতীয় সাজানো ইতিহাস পড়ে সে বড় হয়েছে। আমরা বাংলাদেশের যে ইতিহাস জানি (ত্রুটিপূর্ণ, কিন্তু ভিন্ন প্রবণতার) তার থেকে সেই ভারতীয় ইতিহাস ভিন্ন। গবেষণাকালে বসু যখন ফাঁকফোকর খুঁজে পেয়েছে (যেগুলো বাংলাদেশি গবেষকদের একটি প্রজন্মের কাছে পরিচিত), তখন ১৯৭১-এর ওপর তার বিশ্বাস ভেঙে গেছে এবং সে পাল্টা প্রতিলিখন শুরু করেছে। ফলে *ডেড রেকনিং*-এ ফুটে উঠেছে গাঢ় ক্রোধ, অসংগত গবেষণা-পদ্ধতি এবং নানা অন্ধ গলি। পাঠক কিন্তু ১৯৭১-এর যথাযথ বিশ্লেষণ

পেল না; যে গবেষণায় থাকবে সহিংসতার প্রকৃতি, সংকটের দফারফা, অনিচ্ছাকৃত প্রভাবসমূহ এবং ইতিহাসের এতিমরা।

সহমর্মিতার বলয়

এই বইয়ে এক পক্ষের প্রতি ক্রমবর্ধমান সহমর্মিতা এবং অন্য পক্ষের প্রতি নির্লিপ্ততা, আমার কাছে অতি পরিচিত মনে হয়েছে। ১৯৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের থমাস জে. ওয়াটসন ফাউন্ডেশনের গবেষক হিসেবে আমি যুদ্ধের ওপর একটি কথ্য ইতিহাস প্রকল্প শুরু করি। সেই সময়ে ১৯৭১[৪] সালের কথ্য ইতিহাসের কাজ তুলনামূলকভাবে নতুন ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে কাহিনিগুলোতে পুনরাবৃত্তির ছায়া পড়া শুরু করেছিল। তখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্থাপিত না হলেও, মুক্তিযুদ্ধের ওপর কিছু 'পরিচিত' উৎস এবং বই ছিল। ফলে আমি এমন কিছু লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম যাদের কথা ইতিমধ্যে কয়েকবার লিপিবদ্ধ হয়েছে—স্নাতকোত্তর থিসিস, সাময়িকীর প্রবন্ধ এবং টেলিভিশনের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে।

একপর্যায়ে আমার মনে হলো যে সীমান্ত পার হওয়ার একই ধরনের গল্প বারবার শুনছি। প্রায় সব সময়ই কোনো হৃদয়বান গ্রামের লোক (দাড়িওয়ালা) তাদের সাহায্য করেছিল। সে হয়তো বলেছিল, 'আপা, আপনারা যান, আমি থাকি। আরও লোক পার হবে।' এই আত্মোৎসর্গকারী মহৎ গ্রামবাসীর সঙ্গে কি সবারই দেখা হয়েছিল? নাকি একটি সামষ্টিক কিংবদন্তি ব্যক্তিগত স্মৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল? বিভিন্ন মানুষের অভিজ্ঞতার অদ্ভুত মিল দেখে আমার অমিতাভ কুমারের গুজরাট দাঙ্গা সাক্ষাৎকারের কথা মনে পড়ে যায়: 'সে যেভাবে একনাগাড়ে বর্ণনা করে চলেছে তা দেখে আমার মনে হলো, দয়ার নামে এবং সংবাদের প্রয়োজনে, এই ছোট্ট ছেলেটিকে একটি রোবট বা মর্মবেদনা-যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে।'[৫]

যুদ্ধসাক্ষীদের উৎসাহ নিষ্প্রভ করার পেছনে কিছু বিষয় কাজ করছিল। পাকিস্তানি রাজাকার বাহিনীর অভিযুক্ত প্রধান গোলাম আযম ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করে (এর আগে সে মেয়াদ উত্তীর্ণ ভিসাসহ পাকিস্তানি পাসপোর্টে বাংলাদেশে বসবাস করছিল)।[৬] রায় ঘোষণার দিন ঢাকায় তুমুল দাঙ্গা হয়েছিল। সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়ার সময় আমি রাস্তায় পোড়ানো গাড়ি এবং ওল্টানো রিকশা দেখছিলাম। আমি যাদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম, তারা অনেকেই এবার বিষণ্ন হয়ে পড়েছিল। ২০টি হতাশ বছরের কারণে 'আমরা কি আসলেই স্বাধীন?' বলে যে অনুভূতি কাজ করছিল, গোলাম আযমের নাগরিকত্বের রায়ের পরে এই বিষণ্নতা আরও ঘনীভূত হয়ে যায়। পরবর্তী বছরগুলোতে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বাধীন যুদ্ধাপরাধ বিচার প্রকল্প[৭] যখন মুখ থুবড়ে পড়ে, তখন হতাশার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে আমিও দেখতে

পাই যে গৌরবান্বিত গল্পের বদলে সবাই বলতে চাইছে ক্লান্তিকর একটি গল্প—১৯৭১-পরবর্তী বছরগুলো কীভাবে তাদের পরাভূত করেছে।

গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি পাকিস্তানে যাই। সেখানে গবেষণার বিষয় ছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ত্যাগ করা উর্দুভাষীরা (বাংলায় যাদের সাধারণত ভুলভাবে "বিহারি" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়)[৮]। বাংলাদেশ থেকে একজন গবেষকের আগমন ১৯৯৪ সালে মোটামুটি অভিনব ব্যাপার ছিল, তাই তারা উৎফুল্ল এবং আগ্রহী ছিল। আমি থাকছিলাম করাচির ওরাংগি টাউনে। হঠাৎ করে সেই এলাকা সরকার এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী *মোহাজির কওমি মুভমেন্টের (এমকিউএম)* মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। ব্যাপক গোলাগুলির পর কারফিউ ঘোষণা করা হয় এবং আমি কাজ বাদ দিয়ে ঘরবন্দী হয়ে যাই। কিন্তু এই ছেদ একটা অভাবনীয় সুফল নিয়ে আসে—১৯৭১ নিয়ে কথা বলার ব্যাপারে আরও বেশি আগ্রহ দেখা দেয়। একজন মোহাজির বিচ্ছিন্নতাবাদী সাক্ষাৎকারের সময় বলে, 'দেখো, ভুট্টো পরিবার ১৯৭১ সালে এই একই কাজ করেছিল। তারা আবার সেই ঘটনা ঘটাবে।'[৯] অন্যরা ১৯৭১-এর ভাঙনকে অনিবার্য এবং ভবিষ্যতে বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধে অনুরূপ বিদ্রোহ হবে বলে আশা প্রকাশ করে।[১০]

বাংলাদেশে অনেক সাক্ষাৎকারদাতাকে অবসাদগ্রস্ত এবং বিষণ্ন বলে মনে হয়েছিল। পক্ষান্তরে পাকিস্তানে যাদের সঙ্গে দেখা হলো, তারা অবশেষে কথা বলার একটা জায়গা পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। একজন বিহারি মর্মস্পর্শী ভাষায় বলেছিল, 'আমি পশ্চিম পাকিস্তানে আশ্রয় নিলাম, কিন্তু তখনো আমার ভাই চট্টগ্রামে ছিল। একদিন আমি জানতে পারি, তোমাদের মুক্তিবাহিনী আমার ভাইকে হত্যা করেছে। জানো, সংবাদটি শোনার পর আমি কাঁদিনি; কিন্তু ঢাকার পতনের খবর পাওয়ার পর আমি অবশেষে কেঁদেছিলাম।'[১১] স্থানীয় বিহারিদের ওপর বাঙালিদের সহিংসতার গল্প শুনে আমার গবেষণার পথে একটা বড় দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কারণ, তখন পর্যন্ত আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম যে বাঙালিরা শুধু পাকিস্তানি সৈন্যদেরই হত্যা করেছিল।

বসুর বই পড়ে মনে হলো যে সেও পাকিস্তানে উষ্ণ আতিথেয়তা পেয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৪ সালে আতিথেয়তা পাওয়ার পরও আমি বসুর পদ্ধতিগত ফলাফলের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করি। বাঙালিরা যদি নির্দোষ বিহারিদের হত্যা করে থাকে, তবে আমি তা সমর্থন করি না। কিন্তু ইতিহাস লেখার সময় ভূমিকা, মাত্রা এবং ক্ষমতার বিষয়গুলো বিশ্লেষণে আনতে হয়। বিশৃঙ্খল, স্বপ্রণোদিত জনতার সহিংসতা এবং রাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ মদদে সেনাবাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর সংগঠিত সহিংসতার মধ্যে একটি পার্থক্য করা প্রয়োজন। ইতিহাসবিদ আফসান চৌধুরী প্রতিশোধের রাজনীতি এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন: 'বাঙালিরা অবশ্যই নৃশংসতা

এবং বিহারি নারীদের ধর্ষণে অংশগ্রহণ করেছিল। এটা যত দিন আমরা স্বীকার করব না, তত দিন আমাদের নিজেদের অবস্থানে দাঁড়াবার নৈতিক শক্তি থাকবে না। এসব ঘটনায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ভূমিকাও আমি ব্যাখ্যা করেছি এবং বিহারিদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানিরা কীভাবে ভাবতে পারল যে তারা ঢাকায় বাঙালিদের আক্রমণ করবে, আর ওদিকে সারা বাংলাদেশে অরক্ষিত এবং অনিরাপদ অবস্থায় বসবাসরত বিহারিদের গায়ে কেউ হাত তুলবে না? আমি বিশ্বাস করি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিহারিদের কথা ভাবেইনি এবং পরোক্ষভাবে তারা বিহারিদের মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেছিল। ডিসেম্বরে পরাজয়ের পরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিহারিদের ফেলে রেখে ভারতীয় সেনা পাহারায় পালিয়ে যায়। যার ফলে বাঙালিদের প্রতিহিংসা পুরোপুরি গিয়ে পড়ে বিহারিদের ওপর, যারা অখণ্ড পাকিস্তানের স্বপ্নের শেষ বলি।'[১২]

কথ্য ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হলো, উভয় পক্ষই জোরালো দাবি তোলে। কিন্তু বাছাই করা কিছু গল্প থেকে সরাসরি সামষ্টিক ইতিহাসে যাওয়া যায় না; তার সঙ্গে যুক্ত করতে হয় বৃহৎ প্রবণতার বিশ্লেষণ। অর্থাৎ কথ্য ইতিহাস লেখার সময় বিস্তারিত গবেষণা এবং কিংবদন্তিগুলোর সাংকেতিক অর্থ আলোচনা করাও প্রয়োজন। বসু তার নেওয়া সাক্ষাৎকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেশ কিছু ভুল করেছে। প্রথমত, পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিয়মমাফিক যুদ্ধ করেছে, এই দাবি সে সাবধানে পরখ করেনি। দ্বিতীয়ত, দখলদারির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিরা যেভাবে মদদদাতা হিসেবে কিছুসংখ্যক বিহারি এবং বাঙালিকে ব্যবহার করেছিল (তথ্য সরবরাহকারী, কৌশলগত অবস্থান এবং ডেথ স্কোয়াডের সদস্য), সে ব্যাপারেও সে বিশেষ কোনো আলোচনা করেনি। তৃতীয়ত, আকাঙ্ক্ষিত শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সে দুই পাকিস্তানের (পূর্ব ও পশ্চিম) মধ্যে বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের বিষয়টা অনেকাংশে পাশ কাটিয়ে গেছে।

সেন্টিমেন্টের ঘোর

পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ১৯৭১ সালের যুদ্ধের একটা মহিমান্বিত দর্শন ধারণ করে রেখেছে। কিন্তু এপার বাংলায় আমরা শুধু ১৯৭১ সালের সুউচ্চতা নয়, পরবর্তী দুই দশকের ভয়াবহ বিফলতা ও হানাহানি দেখেছি। ১৯৭৩ সালে গোপন বিপ্লবী বাম এবং সরকারের মধ্যে তুমুল গৃহযুদ্ধ, ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ, ১৯৭৫ সালের নৃশংস বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড এবং আরও দুটি পাল্টা-অভ্যুত্থান, ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীর ভেতরে তুমুল অস্থিরতা, ১৯৮১ সালে জিয়া হত্যাকাণ্ড—সবকিছু মিলিয়ে একটি কঠিন ও রূঢ় বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী অভিজ্ঞতা এবং সংকট শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের পরিচ্ছন্ন ইতিহাসকে তীব্র সংকটে ফেলে

দিয়েছে। লরেন্স লিফশুলজের ভাষায় বাংলাদেশ ছিল একটি 'অসমাপ্ত বিপ্লব'।

ওদিকে একাত্তর নিয়ে পশ্চিম বাংলার আবেগী ধোঁয়া যুদ্ধের সময়ই শুরু হয়। কলকাতার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'বাংলাদেশি' গানগুলোর কথা ভাবা যাক। এই গানগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটা ছিল পশ্চিম বঙ্গীয় বাঙালির লেখা। যার ফলে এই গানগুলোতে সীমান্তের অন্য পারের এককালীন ভাই-বোনদের জন্য ভালোবাসা ও ক্ষমার আবহ ফুটে ওঠে। জনপ্রিয় গান 'শোন একটি মুজিবরের'[১৩]-এ একটি লাইনে বলা হচ্ছে 'হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাব'। অথবা 'আমরা সবাই বাঙালি'[১৪] গানটি, যেখানে অসম্ভব আশা নিয়ে দেশভাগের বিয়োগান্ত ঘটনাকে মুছে দিয়ে একটা ধর্মনিরপেক্ষ সমষ্টির স্বপ্ন স্থান পেয়েছে (হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান—সবাই বাঙালি)। অথবা 'পদ্মা নদীর পাড়ে আমার ছোট্ট সবুজ গ্রাম'[১৫] গানে ১৯৪৭-পূর্ব মনোরম গ্রামজীবনের স্মৃতি রোমন্থন। শেষ পর্যন্ত সেই ধর্মনিরপেক্ষ যুক্ত বঙ্গের স্বপ্ন একাত্তরের পরে মুখ থুবড়ে পড়ে, কিন্তু গান লেখার সময় পশ্চিমবঙ্গের কেউই সেটা কল্পনা করতে পারেনি।

পশ্চিম বাংলার একটি প্রজন্মের জন্য ১৯৭১ একধরনের বৃহত্তর বাংলা গঠনের অপূর্ণ সম্ভাবনা হিসেবে রয়ে গেছে (রাজনৈতিক ও ভৌগোলিকভাবে না হলেও, ন্যূনপক্ষে দার্শনিকভাবে)। যুদ্ধ ছিল সমরূপতা প্রকাশের সময়, যখন বাঙালি মুসলমানরাও নিজেদের এই একই সংস্কৃতি দ্বারা পরিব্যাপ্ত বলে ঘোষণা করে এবং সংস্কৃতিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। ১৯৭১ সাল একটি ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করেছে, যেখানে পশ্চিম বাংলা অবশেষে দেশভাগের ক্ষত উপশম হবে বলে কল্পনা করেছিল।

সত্তর ও আশির দশকে যখন পশ্চিম বাংলা অর্থনৈতিকভাবে নিষ্প্রভ হয়ে যায়, তখন মানুষ সস্নেহে ১৯৭১-এর কথা স্মরণ করত এমন সময় হিসেবে, যখন তারা বিশ্ব ইতিহাস পাল্টে দিয়েছিল। এই সময়ে মার্কিন সিনেটর এবং প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী এডওয়ার্ড কেনেডি শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করতে দমদম বিমানবন্দরে নেমেছিল। ইন্দিরা গান্ধী শরণার্থীদের বিপর্যয়কর চাপের কথা বিশ্বসভায় তুলে ধরেছিল। সব মুহূর্তেই কলকাতা ছিল ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে। বসুর মতো প্রতিটি পরিবারেই এই সময়ের কোনো একটা স্মৃতি ছিল। নিজেদের ঘরে মুক্তি গেরিলাদের আশ্রয় দিয়েছিল অনেকে। সেই গেরিলা যদি হয় একজন মুসলমান, যুদ্ধের এই প্রথা ভাঙার গল্প আরেকটু বেশি তাৎপর্য বহন করত : 'জানো তো, আমাদের রান্নাঘর অবধি ঢুকতে দিতাম।'[১৬] চাঁদা তোলা, কবিতা লেখা, গান গাওয়া থেকে শুরু করে সবশেষে আসে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুকে অল্প সময়ের জন্য দেখা এবং তাঁর দেওয়া প্রণাম। ২০১০ সালে যখন কিংবদন্তি রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী সুচিত্রা মিত্রের মৃত্যু হয়, কলকাতা টিভি ১৯৭১ সালের একটি চাঁদা সংগ্রহের অনুষ্ঠানে তাঁর গাওয়া 'আমার

সোনার বাংলা' গানটিকে বিশেষভাবে তুলে ধরে। ভিডিওটিতে তাঁর গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে দেখা যায়। এই হলো ১৯৭১-এর সঙ্গে কলকাতার রোমান্টিক সম্পর্ক।

পশ্চিম বাংলার কয়েকজন সহকর্মী বিস্ময় প্রকাশ করেছে যে তাদের নিজেদেরই পটভূমির একজন কীভাবে একাত্তরের ওপর এমন জোরালো আক্রমণ করতে পারল। কিন্তু শর্মিলা বসুর বক্তব্য আসলে সেই অতি সেন্টিমেন্টের একটি যুক্তিযুক্ত পাল্টা-বিবর্তন। ১৯৭১ নিয়ে পশ্চিম বাংলায় যে আবেগময় দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তার করেছে, বসুর ভাবাদর্শ সম্ভবত এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ১৯৭১ সালে যে পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীরা ছিল ভাই, আজ বিজেপি নেতাদের কাছে তারা অবৈধ অভিবাসী এবং ডানপন্থী রাজনীতি উসকে দেওয়ার মোক্ষম অস্ত্র। বাম রাজনীতিবিদেরাও তাঁদের জনমুখী রাজনীতির জন্য এই একই শরণার্থীর দোহাই দেয়। এমনকি কংগ্রেস এবং তৃণমূল নেতারা বলে যে শিয়ালদহ স্টেশনে দারিদ্র্যক্লিষ্ট শরণার্থীদের দেখে তাঁরা রাজনীতিতে যোগ দেয়, যাতে করে একটা উন্নত দেশ গড়া যায়।

১৯৭১ অনেক সময় একটা শূন্য ক্যানভাস হিসেবে কাজ করে, যার ওপর প্রতিদ্বন্দ্বী দৃষ্টিভঙ্গি আরোপ করা যায়। সেই তরঙ্গের অংশ হিসেবেই বসুও একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে। যুদ্ধ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, বসু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে সে প্রমাণ করবে এগুলো সব মিথ্যা। উদয়ন চট্টোপাধ্যায়ের মতে, যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সম্পর্কে নানা আবেগ পশ্চিম বাংলার মানুষের ওপর আরোপ করা হয়েছিল। এত বছর পার করে এবং বর্তমানে বাংলাদেশ-ভারত তিক্ত সম্পর্ক দেখে, অনেকেই নিজেকে প্রশ্ন করে, 'সেই উদ্দীপনা কোথায় হারিয়ে গেল?'[১৭] সাবেক প্রেমিকের এই হতাশা একটি শক্তিশালী ধারা, যা শর্মিলা বসুকে হয়তো ভুল স্বপ্নের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দীপনা দিয়েছে।

বন্ধ দরজা এবং প্রিয়পাত্ররা

বাংলাদেশি তথ্যদাতাদের সঙ্গে বসুর বিরোধ শুরু হয় কিছু পুরোনো লেখার মাধ্যমে। তিনটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : ২০০৩ সালে প্রকাশিত একটি উপসম্পাদকীয়[১৮] এবং যথাক্রমে ২০০৫ ও ২০০৭ সালে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধ[১৯]। এই রচনাগুলোয় মোটা দাগে বসু বলে যে 'সাহসী পাক সেনাবাহিনী' (সে ঠিক এই শব্দগুলোই ব্যবহার করেছে) নিষ্কলঙ্কভাবে আচরণ করেছিল; পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর আরোপিত ধর্ষণের অভিযোগগুলো সত্য নয়[২০], মুক্তিযুদ্ধের বাঙালি বয়ানটি ইচ্ছাকৃতভাবে অতিরঞ্জিত। পরবর্তী সাইবার যুদ্ধ এবং একটি অনুষ্ঠানের প্রশ্ন-উত্তর পর্বে এই গবেষণা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রতীয়মান হয়। যৌথভাবে লিখিত একটি উপসম্পাদকীয়তে পাকিস্তানের কাছে মার্কিন যুদ্ধবিমান বিক্রয়ের প্রশংসা করার কারণে বসুর নাম আরও ক্ষুণ্ন হয়।[২১] ফলে পাকিস্তানের

সামরিক বাহিনীর খাস লোক হিসেবে সে পরিচিতি পায় এবং ঢাকায় অনেকে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে অপারগতা প্রকাশ করে। সেই কথা তার বইয়ের মধ্যেও আছে : 'স্বাধীনতাপন্থীরা কোনো ধরনের সহযোগিতা করেনি' (১২)।

সম্ভবত গবেষণায় বাঙালিরা কোনো ধরনের সহযোগিতা না করায়, বসুর গদ্যে বিনা বাধায় এবং সহানুভূতির কণ্ঠে, পাকিস্তানি বয়ান গৃহীত হয়েছে। বসুর লিখিত বই এবং প্রবন্ধগুলো সূক্ষ্মভাবে পড়লে দেখা যাবে যে ২০০৩ সাল থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের একটি অনানুষ্ঠানিক গোষ্ঠী তাকে মুগ্ধ করতে সফল হয়েছিল। অন্যদিকে বাঙালিরা তার রোষ এবং অনীহার শিকার হয়, ফলে বাঙালিদের গল্পগুলোকে সে সূক্ষ্মভাবে খাটো করে দেখায়। বসুর নেওয়া সাক্ষাৎকারগুলোর ক্ষেত্রেও এই অসামঞ্জস্য লক্ষণীয়। সাক্ষাৎকারের জন্য পাকিস্তানে সে ৩০ জন সেনা কর্মকর্তা এবং তিনজন বেসামরিক ব্যক্তিকে বাছাই করেছে। একই সঙ্গে চারজন সেনা কর্মকর্তা সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হননি বলেও সে জানিয়েছে। অর্থাৎ তার বাছাই করা পাকিস্তানি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মোট ৩৪ জন সেনা কর্মকর্তা এবং তিনজন বেসামরিক ব্যক্তি। ফলে বইটি পড়লে মনে হবে এটি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিশালাকার পুনর্মিলনীর সময়ে লিপিবদ্ধ করা। বইটির মূল বিশ্বাসের জায়গা : পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভূমিকা যাচাই করতে সবচেয়ে নির্মোহ উৎস হচ্ছে তারা নিজেরাই।

অন্যদিকে, যেসব পাকিস্তানি নাগরিক সেনাবাহিনীর নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল, তাদের কথা বসুর সাক্ষাৎকার এবং উদ্ধৃতিগুলোতে অনুপস্থিত। এমনকি ১৯৭১ সালে প্রতিবাদ, ভূমিকার জন্য যে ৪০ জন পাকিস্তানিকে বাংলাদেশ সরকার পুরস্কৃত করেছে, তার উল্লেখও বসু করেনি।[২২] এই ভিন্নমতাবলম্বীদের মধ্যে ছিল লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং মেজর ইকরাম সেগাল (উভয়ই প্রতিবাদ করে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেছিল), এয়ার মার্শাল আজগর খান, বালুচ নেতা মীর গাউস বাজিনজো, ন্যাপ নেতা খান আবদুল ওয়ালী খান, অ্যাডভোকেট জাফর মালিক, সাংবাদিক সাবিহউদ্দীন গাউসি এবং আই এ রহমান, অধ্যাপক এম আর হোসেন, তাহেরা মাজহার ও ইমতিয়াজ আহমদ। ১৯৭১ সালে ভিন্নমত প্রকাশ করায় কারাবরণ করে সিন্ধি নেতা জি এম সাইদ, মালিক গোলাম জিলানি, কবি আহমদ সালিম এবং পাকিস্তান বিমানবাহিনীর আনোয়ার পীরজাদা। বসু কর্নেল নাদির আলীর কথাও এড়িয়ে গেছে, যার বইয়ে আদেশকারী অফিসারের নির্দেশনা হুবহু আছে : 'বেজন্মাদের যত পার হত্যা কর, কোন হিন্দু যেন বেঁচে না থাকে... হিন্দুদেরকে মেরে ফেল। এই আদেশ সবার জন্যই'।[২৩] সে শাইখ আয়াজ, হাবীব জাবিল, আজমল খাত্তাক এবং ফয়েজ আহমদ ফয়েজের মতো প্রতিবাদী কবিদের মতামত গ্রাহ্য করেনি। 'আমার

থেকে দূরে থাক : বাংলাদেশ-১' (আমি কীভাবে হত্যার এই উৎসবকে অলংকৃত করতে পারি,/ কীভাবে সাজাতে পারি এই নৃশংসতাকে?) এবং 'বাংলাদেশ-২' নামে ফয়েজ আহমদ ফয়েজের বিখ্যাত কবিতার কোনো উল্লেখ সে করেনি।[২৪] নিঘাত সাঈদ খান এবং নিলাম হুসাইনের মতো নারীবাদী কণ্ঠস্বরগুলোও বসুর লেখায় অনুপস্থিত।[২৫] পাকিস্তানি গবেষক সাদিয়া তুর *ডেড রেকনিং*-এর গবেষণা-পদ্ধতির বিষয়ে মন্তব্য করেছে : 'শর্মিলা বসু পাকিস্তানে কোনো প্রগতিশীল মানুষের সঙ্গে কথা বলেনি।'[২৬]

বাংলাদেশে বসু ৩৯ জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছে এবং এদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক সাক্ষাৎকারদাতার অভিজ্ঞতা পাকিস্তানে সাক্ষাৎকারদাতাদের সমতুল্য। মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বসু শুধু মেজর জেনারেল ইমামুজ-জামান এবং শমসের মুবিন চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলেছে। বিহারি হত্যাকাণ্ডের স্থানগুলো চিহ্নিত করার জন্য সে চলচ্চিত্র নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেলের তথ্য ব্যবহার করলেও, তার চলচ্চিত্রের অন্য বয়ানগুলো এড়িয়ে গেছে[২৭], যেখানে বাঙালি এবং বিহারি উভয়েরই সহিংসতার কথা আছে। অধ্যাপক মেঘনা গুহঠাকুরতা এক জায়গায় তার বাবার হত্যাকাণ্ড সবিস্তারে বর্ণনা করেছে,[২৮] কিন্তু তার জেন্ডার-সম্পর্কিত গবেষণা আমলে নেওয়া হয়নি। মেঘনা আমাকে বলেছে,

> বসু আমাকে ২৫ মার্চের ঘটনাগুলো সম্পর্কে বলতে বলেছিল। আমি তাকে বলেছিলাম, যে অফিসারটি আমার বাবাকে নিয়ে যেতে এসেছিল, সে বলেছিল, 'বাসার ভিতরে থাকেন, ঘরে কোনো ছেলে আছে?' কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ওই রাতে কোনো নারী হত্যা করা হয়নি। বসু মধু দা'র পরিবারের কাছে প্রমাণগুলো দেখতে পারত; বা সেই নারী সাংবাদিক, যাকে প্রথম রাতে হত্যা করা হয়...আমি বসুকে জগন্নাথ হলে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে সে হিন্দু কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ২৫ মার্চ রাতে হামলার শিকার হওয়া কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছিল। আশ্চর্যের বিষয়, এত কিছুর পরও সে এটাকে জেনোসাইড, বা এমনকি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলতে অস্বীকার করছে।[২৯]

বইটিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিষয় উল্লেখ আছে, তবে তা তাচ্ছিল্যের মোড়কে আবৃত। বসু দুবার উল্লেখ করেছে যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিচালক মফিদুল হক ময়মনসিংহে একটি সেনানিবাস থাকার কথা জানত না [অন্যত্র বসু স্বীকার করেছে যে এটি ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি অগোছালো স্থানীয় কেন্দ্র (৮৩)]। পরে আবার সে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কঠোর সমালোচনা করেছে, কারণ জাদুঘর থেকে তাকে একটি প্রকাশনা দেওয়া হয়েছিল, যেখানে দুজন ডাক্তারের সাংকেতিক অঙ্গচ্ছেদের বর্ণনা ছিল (এটি হয়তো একটি যুদ্ধকালীন মিথ)। আমি যখন মফিদুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম, সে বলেছিল :

শর্মিলা বসু তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এ রকম সবকিছুই এড়িয়ে গেছে। বইটি আমাদের কাজ তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। সে আমাদের ইতিহাস নিয়ে যা করেছে তা দেখার পর, জাদুঘর নিয়ে তার কথাবার্তায় আশ্চর্য হচ্ছি না।[৩০]

আত্মসমালোচনামূলক কণ্ঠস্বরগুলো

তারেক ও ক্যাথরিন মাসুদ (*মুক্তির গান*, *মুক্তির কথা* এবং *মাটির ময়না*), নায়েবুদ্দীন আহমদ (ধর্ষণের শিকার বাঙালিদের ছবি), রেহনুমা আহমেদ (ধর্ষণ এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর লিখিত প্রবন্ধগুলো), ইসরাত ফেরদৌসি (*দ্য ইয়ার দ্যাট ওয়াজ*), বদরুদ্দীন উমর (ভাষা আন্দোলনের সমন্বিত ইতিহাস), বশীর আলহেলাল (ভাষা আন্দোলন), রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (*বাংলাদেশ ১৯৭১*), আইন ও সালিশ কেন্দ্র (ধর্ষণের কথ্য ইতিহাস প্রকল্প), সিরাজুল ইসলাম, রেহমান সোবহান এবং আফসান চৌধুরীর কাজসহ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি প্রধান দলিল, বই এবং চলচ্চিত্রগুলো বসু তার গবেষণায় আনেনি। আফসান চৌধুরীর কাজ এড়িয়ে যাওয়া বিস্ময়কর, কারণ বসুর গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখিত ১১ খণ্ডের স্বাধীনতার ইতিহাস বইয়ের সহসম্পাদক এবং পরবর্তী সময়ে একটি চার খণ্ডের ইতিহাস বইয়ের লেখক, এই একই আফসান চৌধুরী।[৩১] বসু বইগুলো পাদটীকায় উল্লেখ করলেও এগুলোর কোনোটাই বোধ হয় পড়েনি।

অন্যান্য বাংলা উৎস গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে (নীলিমা ইব্রাহিম, মুইদুল হাসান, রশীদ হায়দার), কিন্তু মূল বইয়ের অধ্যায়গুলোতে এসব সূত্রের কোনো উল্লেখ নেই। বরং বসু শ্রদ্ধাসহকারে যে আনুষঙ্গিক উৎসগুলো প্রায়ই উল্লেখ করেছে, সেগুলো হলো পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র, আর্চার ব্লাড ও হেনরি কিসিঞ্জার। ফলে আমরা পাকিস্তান সরকার (এবং সেনাবাহিনী), যুক্তরাষ্ট্রের একজন রাষ্ট্রদূত এবং নিক্সনের পাকিস্তান পলিসির মূল হোতার মতামতই জানতে পারছি। বাংলাদেশের এই ইতিহাসে বাংলাদেশিদের মতামতই অনুপস্থিত।

হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট উদ্ধৃত করা হলেও, এর সার্বিক উপসংহারগুলো বসুর বইতে স্থান পায়নি। এই উপসংহারগুলোর মধ্যে ছিল লে. জেনারেল নিয়াজির কথাবার্তা এবং পদক্ষেপগুলো হত্যাকাণ্ড এবং ধর্ষণ উৎসাহিত করার অভিপ্রায়ে পরিকল্পিত ছিল, সামরিক অভিযানের সময় অতিরিক্ত শক্তির ব্যবহার, উৎপাটনের সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসার এবং সদস্যের আচরণ এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের প্রতি সেনা কর্তৃপক্ষের আচরণ।[৩২]

বসু বাংলাদেশে একটি উৎস হিসেবে ডেভিড লাডেনকে ধন্যবাদ দিয়েছে, কিন্তু লাডেন এই বিশ্লেষণকে বিভ্রান্তিকর হিসেবে বর্ণনা করেছে :

> এই প্রকল্পের শুরুর দিকে আমার সঙ্গে শর্মিলার মতবিনিময় হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বসুর গবেষণা পদ্ধতির মানোন্নয়ন করা এবং তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা; তবে এর

> কিছুই সম্ভব হয়নি। একপর্যায়ে সে আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। তার প্রাথমিক কাজগুলোর যে সমালোচনামূলক পর্যালোচনাগুলো আমি করেছিলাম, সে কখনো সেগুলোর উত্তর দেয়নি। বসু তার বইয়ের কৃতজ্ঞতা স্বীকারে আমাকে উদ্ধৃত করেছে, কিন্তু সে কখনো আমাকে বইটি পাঠায়নি, বা এই বইটা যে প্রকাশিত হয়েছে, এই খবরও জানায়নি।[৩৩]

পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে গল্পগুলো বলেছে, বসু সেগুলোকে সত্য হিসেবে প্রচার করেছে, খুব কম ক্ষেত্রেই সে এগুলো যাচাই করে দেখেছে। যে গল্পগুলোতে বাঙালিদের কাপুরুষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেগুলোর প্রতি সে অতিরিক্ত বিশ্বাসপ্রবণতা দেখিয়েছে। কামাল হোসেনের আত্মসমর্পণ বিষয়ে বসুর গল্পটির কথাই ধরা যাক (পৃ. ২১১, ফুটনোট ৪৯)। হামিদা হোসেনের কাছে এই বিষয়ে জানতে চাইলে, সে জানায় :

> ওই রাতে সেনা কর্মকর্তারা সৈন্যসহ এসেছিল, তারা স্টেনগান এবং অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তারা শিশুসহ আমাদের সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড় করিয়ে কামাল কোথায় জানতে চায়। যেই বুয়া বাচ্চাদের দেখাশোনা করত, তাকে আঘাত করেছিল এবং আমার ভাগনিকেও থাপ্পড় মেরেছিল। কামাল হোসেন কোথায়, তা জানলেও সে এটা তাদের বলবে না; এই কথা বলায় আমার ভাগনিকে আঘাত করে। পাকিস্তানি অফিসারদের কাছে আত্মসমর্পণের কোনো বার্তা কামাল পাঠায়নি। সে কয়েকটি বাসায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিল এবং সবশেষে লালমাটিয়ায় এক আত্মীয়র সঙ্গে ছিল; এই অবস্থাতেই এক রাতে সেনাবাহিনী তাকে খুঁজে পায় এবং তুলে নিয়ে যায়।[৩৪]

যখন আমি হামিদা হোসেনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বসু এই ঘটনাগুলো সহজেই যাচাই করতে পারত কি না, তখন সে উত্তর দিয়েছিল, 'কামালের কাছে সত্যটা যাচাই না করেই বসু জেনারেল মিঠাকে উদ্ধৃত করেছে। যখন বসু ঢাকাতে তার কথিত 'নিবিড় গবেষণা' করছিল, তখন কামাল ঢাকাতেই ছিল এবং বসু খুব সহজেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারত।'[৩৪]

বিহারিবিরোধী সহিংসতার বিষয়ে যে বাংলাদেশিরা কথা বলেছে তাদের কথা আমলে না নিয়ে বসু শুধু পাকিস্তানি প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানই ব্যবহার করেছে। এর ফলে 'বাংলাদেশে বেশ উচ্চ স্বরে এবং ভারতেও এই বিষয়টা কিছুটা অস্বীকার করা হয়' (১৪) বলে বসু যে দাবি করেছে, তা বেশ পাকাপোক্ত হতে পেরেছে। কিন্তু বিহারিবিরোধী সহিংসতার বিষয়টি ঠিক কতটা অস্বীকার করা হয়? যেসব বাংলাদেশি বিহারিবিরোধী সহিংসতা বিষয়ে লিখেছে, যেমন আফসান চৌধুরী, নওশাদ নুরী, তাজ উল-ইসলাম হাশমি (*দ্য বিহারি মাইনোরিটিস ইন বাংলাদেশ*), যতীন সরকার (*পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যুর দর্শন*), আহমেদ ইলিয়াস (*বিহারিস : দ্য ইন্ডিয়ান এমিগ্রেস ইন বাংলাদেশ*'[৩৫]), মীজানুর রহমান (*অ্যা কমিউনিটি ইন ট্রানজিসন : দ্য বিহারিস ইন বাংলাদেশ*'[৩৬]), জাকিয়া হক (*উইমেন, ওয়ার অ্যান্ড স্টেইটলেসনেস : স্ট্র্যানডেন*

বিহারি উইমেন অ্যান্ড গার্লস ইন বাংলাদেশ), হরিপদ দত্ত (*মহাজের*) ও মাহমুদ রহমান (*কিলিং দ্য ওয়াটার*)-এর কাজ বসু বিবেচনা করেনি।

'প্রথম' হওয়ার জন্য বসু এতটাই উদ্‌গ্রীব ছিল যে বাংলাদেশের ভেতরে চার দশক ধরে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সক্রিয়ভাবে প্রশ্ন করে যে গবেষণাগুলো হয়েছে, সেগুলোর কথা সে বলেনি। ১৯৭১-এর বয়ানের সমস্যাগুলোর কথা যদি অন্যরা লিখে থাকে, তবে বসুর বইটিকে 'যুগান্তকারী' (বইয়ের মলাটে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে) দাবি করা যায় না।

গণহত্যা চিহ্নিত করা

মীমাংসিত সত্যগুলোর বাইরেও, ১৯৭১ সালে উভয় পক্ষেই যে কথ্য ইতিহাসগুলো তৈরি হয়েছিল, তা আন্তর্জাতিক (সুপারপাওয়ারদের প্রক্সি দ্বন্দ্বসহ) এবং স্থানীয়ভাবে সংঘটিত এই সংগ্রামের প্রপাগান্ডা প্রবৃত্তি দ্বারা ভারাক্রান্ত ছিল। কিন্তু তার বইতে বসু শুধু পাকিস্তানি পক্ষের বর্ণনাগুলোকে উচ্ছ্বসিত এবং গুরুত্বারোপ করেছে। তার প্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র এবং পশ্চিম পাকিস্তানি ও বাঙালি সরকারপন্থী বর্ণনাগুলো (৩১)। বিশেষত, সে পাকিস্তান সরকারের *হোয়াইট পেপার অন দ্য ক্রাইসিস ইন ইস্ট পাকিস্তান, আগস্ট ১৯৭১*-এর ওপর নির্ভর করেছে। সে রিপোর্টের ভাষ্য অনুযায়ী বাঙালিরাই এই সহিংসতার জন্য সেনাবাহিনীকে প্রচণ্ডভাবে প্ররোচিত করেছিল; বিহারিদের জীবন, সম্পদ এবং জাতীয় ঐক্য রক্ষা করার জন্যই সেনাবাহিনীকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং এই গোটা বিধ্বংসী ঘটনার জন্য দায়ী ছিল ভারতীয় হস্তক্ষেপ। জাতিসংঘে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্যই পাকিস্তান সরকার এই দলিলটি তৈরি করেছিল (পরবর্তী সময়ে যেই কাজটা ভুট্টো করেছিল)। যুদ্ধের সময় প্রকাশিত আরও কয়েকটি শ্বেতপত্রকে বসু অগ্রাহ্য করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি[৩৭], মার্কিন সিনেট[৩৮] এবং হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস[৩৯] এর একাধিক শুনানি এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টিস-এর জেনেভা সেক্রেটারিয়েট।[৪০] ১৯৭১ বিষয়ে প্রতিবেদনের প্রাপ্যতা এবং সম্ভাব্য পক্ষপাতের সমস্যা অবশ্যই রয়েছে, তবে পাকিস্তানি সরকারের শ্বেতপত্র এবং হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টের পক্ষপাতমূলক বর্ণনার (ভুট্টোর চাপে, ১৯৭২ সালের প্রতিবেদনের রাষ্ট্রের প্রতিকূল 'অপলাপ' এবং 'জঞ্জাল' বাদ দেওয়ার পর, ১৯৭৪ সালে সম্পূরক অংশ প্রকাশিত হয়) ভারসাম্য রক্ষার খাতিরে ওপরে উল্লিখিত দলিলগুলো বিবেচনার যোগ্য।

ডেড রেকনিং প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময়ে ধর্ষণের ওপর গবেষক নয়নিকা মুখার্জি[৪১] *দ্য গার্ডিয়ান*-এ প্রশ্ন করে, 'একটি নতুন গবেষণা

পাকিস্তানি সেনাসদস্যদের শান্ত এবং দয়ালু হিসেবে দেখেছে। এটা কি ন্যায্য হতে পারে?'[৪২] শ্রীনাথ রাঘাবান ক্রোধান্বিত হয়ে তার পর্যালোচনায় লিখেছে, 'এই বই যেসব চাতুরী, বিভ্রান্তি, ফাঁকি এবং পদ্ধতিগত ত্রুটি দ্বারা আক্রান্ত, তার সবগুলো পর্যালোচনা করা অসম্ভব।'[৪৩] বইটিতে ভুলের একটি তালিকা করতে বসে আমি রাঘাবানের সঙ্গে একমত হই—সম্ভব-অসম্ভবের চেয়ে বড় কথা, এর শেষ নেই।

বইটির অধিকাংশ বিষয়ে অবসরপ্রাপ্ত পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা প্রাথমিক উৎস ছিল। নির্বাচন-পরবর্তী আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর, লে. জেনারেল গোলাম মোস্তাফা দাবি করে 'প্রথম দিকে সেনাবাহিনী শৃঙ্খলা রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল' (৩১)। অন্যদিকে লেফটেন্যান্ট মুহাম্মদ আলী শাহ 'ঢাকা ক্লাবের মতো জনপ্রিয় জায়গাগুলোতে বাঙালিদের সঙ্গে ভালো সামাজিক জীবনের অবসান' নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছে। উত্তপ্ত মার্চ মাস সম্পর্কে বসু জানাচ্ছে, 'যতজন অনুগত সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে আমি কথা বলেছি...তারা জানিয়েছে যে সেনাবাহিনীকে ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান এবং শক্তি প্রয়োগ না করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল (৩৩)।'

২৫ মার্চের দমন-পীড়ন যখন চলছিল, লেফটেন্যান্ট মুহাম্মদ আলী শাহর দাবি যে 'ওই রাতে গোটা পথে বিশ বা পঁচিশ জনের বেশি লোককে হত্যা করা হয়নি'; শাহ অস্ত্রের একটি হিসাব দিয়েছে, যা বসু মেনে নিয়েছে—'গোটা ঢাকাতে ওই তিনটি ট্যাংকই ছিল', 'ট্যাংকের প্রধান অস্ত্রগুলো ওই রাতে ব্যবহার করাই হয়নি', এবং 'আনুষঙ্গিক অস্ত্রগুলো শুধু শক্তির প্রদর্শন হিসেবেই চালানো হয়েছিল' (৫৫)। বাঙালি পরিচয়ে মৌলিক আঘাত ছিল শহীদ মিনার ধ্বংস করা। সেই ঘটনাকে শুধু 'ধ্বংসোন্মাদনা' এবং 'কোনো সামরিক কারণ না থাকায়' 'সময় এবং সম্পদের অর্থহীন অপচয়' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে (৫৮)। গোটা সামরিক দমন-পীড়ন অভিযান পর্যবেক্ষণ করে বসু শান্তভাবে মন্তব্য করেছে, 'তর্কসাপেক্ষে, যেকোনো পরিস্থিতিতেই এটি সঠিক নীতি ছিল না।'

নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় বা অন্য কোনোভাবে সংজ্ঞায়িত একটি গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায় গণহত্যার আইনি সংজ্ঞা। এই ক্ষেত্রে বসু এটা প্রমাণ করতে উদ্‌গ্রীব যে হামলার লক্ষ্যবস্তুর কোনো ধর্মীয় ভিত্তি ছিল না। চুকনগরে হিন্দুদের সুনির্দিষ্ট হত্যাকাণ্ডকে সে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে, যেন সে জেনোসাইড শব্দটি এড়িয়ে যেতে পারে: 'যদিও মার্কিন কনসাল জেনারেল ব্লাড একভাবে বর্ণনা দিয়েছে, তারপরও এই হত্যাকাণ্ডকে সাধারণভাবে সব হিন্দুর বিরুদ্ধে 'জেনোসাইড' হিসেবে উল্লেখ করা যায় না, কারণ হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্য হিসেবে শুধু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদেরই বেছে নেওয়া হয়েছিল' (১২৩) এবং 'সামরিক সরকার সম্ভবত কোনো একজন ব্যক্তির হিন্দু হওয়ার বিষয়টিকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' হওয়ার রাজনৈতিক সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছিল' (১২৪)।

ভারত সরকারের হিসাব অনুসারে ১৯৭১ সালের মে মাস পর্যন্ত ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের ৮০% ছিল হিন্দুধর্মাবলম্বী[৪৪], যা প্রমাণ করে যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী হামলার লক্ষ্য হিসেবে ধর্মকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছিল। কিন্তু বসু এই বিষয়টি তার বিশ্লেষণে আনেনি।

হামলার নির্দিষ্ট লক্ষ্য

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের হত্যার বিষয়ে বসু বলেছে, 'সৈন্যরা সব বাসার দরজাই ভেঙেছিল', ফলে এটা 'কোনো নামের তালিকার ভিত্তিতে টার্গেট করার বিষয় ছিল না'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের হত্যাকাণ্ডকে তালিকা না থাকার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে: 'যদি সেনাবাহিনীর কাছে অধ্যাপকদের কোনো তালিকা থাকত, তবে তাতে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের নাম থাকাই স্বাভাবিক ছিল, কারণ সে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিল (৬৩)।' বসু যেটা বিশ্লেষণে আনেনি তা হচ্ছে, তালিকা অবশ্যই ছিল, কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে পূর্বাঞ্চলের এলাকাগুলো অপরিচিত ছিল এবং অবশ্যই ভাষা ও হাতের লেখাও পরিচিত ছিল না; যার ফলে প্রায়ই ভুল লোক আটক করা হতো, যেমনটা ঘটেছিল পরিসংখ্যান বিভাগের মনিরুজ্জামানের ক্ষেত্রে (এ কারণেই বাঙালি এবং বিহারি সহযোগীরা সেনাবাহিনীর 'চোখ ও কান' হিসেবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং তা করা হয় আনুষ্ঠানিক শান্তি কমিটি গঠন করার মাধ্যমে)। তালিকা অনুসারে হত্যা করতে গিয়ে যদি বিশৃঙ্খলা এবং ভুল হয়, তার মানে এই নয় যে, সেখানে কোনো তালিকাই ছিল না।

ব্রিগেডিয়ার (লে. কর্নেল) [বন্ধনীর ভেতরে আছে যুদ্ধকালীন র‍্যাংক] তাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার বিষয়টি অস্বীকার করে। সে দাবি করে, 'শিক্ষকদের কোয়ার্টারগুলোতে কেউ যায়নি' (৬০)। কিন্তু তার মিথ্যাটা ধরা পড়ে যায় যখন বসু নিশ্চিত করে যে কয়েকজন সৈনিক অবশ্যই কোয়ার্টারে গিয়েছিল। এরপর কি ব্রিগেডিয়ার তাজকে একজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী হিসেবে গণ্য করা উচিত? তারপরও বসু ব্রিগেডিয়ার তাজের দাবির সঙ্গে একমত প্রকাশ করে উল্লেখ করে যে, শিক্ষকদের টার্গেট করে 'কোনো তালিকা ছিল না' এবং মেজর জেনারেল উমরও একই দাবি করেছে (৬০)। পুনরায় ব্রিগেডিয়ার তাজ ৪৪ জন মৃতের হিসাব দিয়েছে, যা পাকিস্তান রেডিওতে ঘোষণাকৃত ৩০০ জন মৃতের হিসাবের চেয়ে অনেক কম এবং এই সংখ্যাটি বসুও উদ্ধৃত করেছে। যাঁরা সবচেয়ে ভালোভাবে জানেন 'এ রকম দুজন ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের দেওয়া হিসাবমতে মৃতের সংখ্যা ৪৪ থেকে ৩০০; এই মৃতের সংখ্যার হিসাব কীভাবে মেলাবে?' (৬৭)। এমনকি খোদ সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ডেভিড ব্লির মতে,

'বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা অনেক লোককে হত্যা করেছে'[৪৫] কিন্তু তারপরও বসু মৃতের সংখ্যা বাড়াতে নারাজ।

লেফটেন্যান্ট মুহাম্মদ আলী শাহ দাবি করে, সে জিঞ্জিরায় 'উন্মত্ত জনতার মাথার ওপর দিয়ে গুলি করেছে' এবং বসুর জন্য এই দাবিই যথেষ্ট। সে সহানুভূতির সঙ্গে 'বিদ্রোহ মোকাবিলা করতে সেনাবাহিনীর হিমশিম খাওয়ার' বিষয়টি উল্লেখ করেছে (৭৭)। একইভাবে, পাকিস্তানি কর্মকর্তারা বরইতলা হত্যাকাণ্ডকে অস্বীকার করেছে, কারণ তারা এটিকে 'উদ্ভট' হিসেবে বিবেচনা করে এবং উল্লেখ করে যে, 'লোকজনকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হত্যার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি না' (১৪৫)। খুলনায় বিহারিদের হত্যা সম্পর্কে বসু মেজর বাবরের গল্পগুলো নির্দ্বিধায় মেনে নেয়। মেজর বাবরের মতে, বিহারিদের বিরুদ্ধে 'গিলোটিন'-এর মতো কাঠামো, 'ধামা', 'পাঞ্জা' এবং অন্যান্য 'নির্যাতনের হাতিয়ার' (৮২) ব্যবহার করা হয়। বসু এই বর্ণনা যাচাই না করে মেনে নেয়।

সান্তাহারে বিহারি হত্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে ক্যাপ্টেন (ব্রিগেডিয়ার) শওকাত কাদির 'লাশে ভর্তি' গভীর গর্ত, 'শিশুদের লাশে ভর্তি' কক্ষ, এবং 'মানুষের মগজ লেপ্টে থাকা দেয়ালের' কথা বলেছে; অন্যদিকে মেজর আনিস আহমদ 'পচা লাশে ভর্তি প্ল্যাটফর্ম-'এর কথা স্মরণ করেছে (৮৫)। ক্যাপ্টেন সারওয়ার ঈশ্বরদীতে 'বিহারি শিশুদের বর্শাবিদ্ধ এবং নারীদের চিরে ফেলা লাশ' দেখার কথা উল্লেখ করেছে (৮৫)। অন্যদিকে বর্শাবিদ্ধ বাঙালি শিশুর একই ধরনের বর্ণনা ক্যাথলিক চার্চের তহবিল তোলার প্যামফলেটে ছাপা হয়েছিল। এসব পরস্পরবিরোধী, অবিকল বর্ণনাগুলো বসু যেভাবে উদ্ধৃত করেছে, তা অন্তত কিছু প্রমাণসহকারে উপস্থাপনের দাবি রাখে। ঈশ্বরদীতে সেনা কর্মকর্তারা বিহারি নিধনযজ্ঞের ছবি তুলেছে বলে দাবি করেছে, কিন্তু সেই ছবিগুলো কোথায় গেল?

থানাপাড়ায় বাঙালিদের হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু তারপরও সূক্ষ্মভাবে দায়টা বাঙালি বিদ্রোহীদের ওপরই চাপানো হয়েছে: 'যদি বাজারে কেউ তাদের ওপর গুলিবর্ষণ না করত, তবে সম্ভবত সেনা ইউনিটটি চলে যেত এবং গ্রামবাসীদের হত্যা করার প্রয়োজন বোধ করত না' (১১১)। চুকনগরকে বর্ণনা করা হয়েছে এমন ঘটনা হিসেবে, 'যা নিয়মিত ঘটনার ব্যতিক্রম হিসেবে ঘটেছে বলে মনে হয়' (১২২)। ওই অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করা তিনজন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তার বয়ান গ্রহণ করেছে বসু। এই অফিসাররা কেউই 'চুকনগর ঘটনাটি সম্পর্কে শোনেনি'। তাদের বর্ণনা থেকে সে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, চুকনগরে হিন্দু শরণার্থীদের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি শুধু 'পঁচিশ থেকে ত্রিশ জনের একটি দল' ঘটিয়েছিল। এখানে 'দল' শব্দটি বসু দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছে—পরোক্ষভাবে সে দলছুট মিলিশিয়া, এবং অবশ্যই এই দলের অল্প

লোকবল, ইঙ্গিত করেছে। এখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে টার্গেট করা কিলিং থেকে বসু দায়মুক্তি দিচ্ছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বয়ান গ্রহণ করে বসু লিখেছে: 'বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা যেভাবে বেসামরিক বা সামরিক ব্যক্তিদের নির্যাতন, অঙ্গচ্ছেদ এবং হত্যা করেছে, তা বর্বরোচিত; ফলে তা স্বাধীনতাপন্থীদের নৈতিক অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে (১১২)।' এখানে বসু একটি ঘটনা উল্লেখ করেছে (ঈশ্বরদীর বিহারি হত্যা) এবং এর ফলে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে পাকিস্তানের পক্ষের লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়েছে।

ইঙ্গিতময় বিশেষণ

ইঙ্গিতময় বিশেষণ ব্যবহারের মাধ্যমে গোটা বইতেই বসুর রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। শুরুতে তার মূল্যায়ন হচ্ছে 'পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা ভালো লোক ছিল, যারা তাদের সর্বোচ্চ ভালোটুকু করছিল' (১৩)। জেনারেল ওমর সেনা অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার কথা অস্বীকার করে এবং বসু তা গ্রহণ করে: 'তার ভূমিকা পরিষ্কার করার জন্য সে স্পষ্টবাদী ছিল', 'যুক্তি দেখায়', 'অস্বীকার করে', 'দাবি করে'। অন্যদিকে মেজর জেনারেল মিঠা 'একজন সৎ এবং প্রতিভাবান কর্মকর্তা' (৪৯)। মেজর জেনারেল মিঠা সৎ হয়তো হতেও পারে, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বাহুল্য এবং একপক্ষীয় প্রশংসা করা কি ইতিহাসবিদের কাজ? ঘটনাপ্রবাহকে নিজের মতো করেই ফুটে উঠতে দেওয়া উচিত।

শুধু ঘটনা নয়, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত শব্দের ক্ষেত্রেও একই সমালোচনা প্রযোজ্য। *ডেড রেকনিং*-এর পর্যালোচনায় উর্বশী বুটালিয়া এই বিষয়টির ওপর মন্তব্য করেছে। 'বাংলাদেশি বর্ণনাগুলোকে "দাবি" বলা হয়েছে, পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের বর্ণনাকে সরাসরি বয়ান হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে (১৪২-৪৫)।'[৪৬] আমি ৭৬ থেকে ৯৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বিশেষণগুলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। এই অংশে আমরা পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকারগুলো পাব, যেগুলো প্রায়ই পাদটীকা বা নথি ছাড়া উপস্থাপন করা হয়েছে: লেফটেন্যান্ট মুহাম্মদ আলী শাহ ['নিজেকে এই অবস্থায় পেয়েছে' (৭৬)], ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ ['তার নথি একটি স্পষ্ট চিত্র উপস্থাপন করেছে', 'নথিগুলো', 'তারা জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল', 'তারা পেয়েছিল' (৭৮, ৭৯)], মেজর সামিন জান বাবর ['বলে' (৮২)], ক্যাপ্টেন (ব্রিগেডিয়ার) শওকত কাদির ['লিখেছে', 'বর্ণনা করেছে' (৮৪)], মেজর আনিস আহমেদ ['বলছে' (৮৪)], ক্যাপ্টেন সরওয়ার ['সম্পর্কিত', 'বলেছে' (৮৫)], লেফটেন্যান্ট আতাউল্লাহ শাহ ['কিছু দেখেছে', 'এখনো মনে রেখেছে' (৮৯, ৯০)], মেজর আবদুল মজিদ ['বলেছে যে এটা সবাই জানত', 'বলেছে' (৯৩,

৯৪)]। কিন্তু প্রায় ২০ পৃষ্ঠাজুড়ে স্বাধীনতাপন্থী বাঙালি অফিসার বা বেসামরিক নাগরিকদের অন্য ধরনের বিশেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে: লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাকিব ['অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে' (৭৮)], ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ['উল্লেখ করেনি' (৭৮)], লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাসুদ ['দাবি করে' (৭৮)], মেজর সফিউল্লাহ ['দাবি করে' (৭৮)], রুস্তম আলী শিকদার ['দাবি করে যে', 'কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ উপস্থাপন করতে পারেনি' (৮০)], লেফটেন্যান্ট ইমামুজ জামান ['দোষারোপ করে' (৯২), 'মারাত্মক অভিযোগ', 'অভিযোগ', 'অভিযুক্ত অপরাধী'—সবই এক অনুচ্ছেদে (৯৩)] এবং সবশেষে জয়নাল আবেদীন ('অভিযোগ করে' যে 'আধা ডজন (পাকিস্তানি) সৈন্য গ্রামের ঘরে ঘরে যায়, সেগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে এবং সবাইকে হত্যা করে') (৮৮)।

যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষই হয়তো বিশ্বের সহমর্মিতা পাওয়ার জন্য মৃতের সংখ্যা পরিবর্তিত করে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু এই বইতে শুধু এক পক্ষের দাবিগুলোই যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। বসুর বর্ণনায় যুদ্ধ-ক্লান্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনী যেন জোসেফ হেলারের *ক্যাচ ২২* উপন্যাসের একদল শোষিত পুরুষ, 'যারা ডাল-রুটি খেয়ে বেঁচে আছে' (৩৩)। সোজা কথায়, যুদ্ধ খুব বাজে জিনিস এবং রক্ষার প্রথম পদক্ষেপটি হচ্ছে ভালো খাবার খাওয়া। একজন পাকিস্তানি কর্মকর্তার সহিংসতাকে সব সময়ই গুজব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে: 'ক্যাপ্টেন বুখারি এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইয়াকুবের নামে মানুষ হত্যার গুজব ছিল।' পরবর্তী একটা লাইনে বলা হয়েছে, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী পক্ষও কোনো অংশে ভালো ছিল না।' একই অধ্যায়ে, একই পাতায় এবং এই গোটা বইয়ের মধ্যে কোন অভ্যন্তরীণ যুক্তির ভিত্তিতে যুদ্ধরত দুই পক্ষের বয়ান ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে? এখানে বইটির সম্পাদক ভূমিকা পালন করতে পারত—প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানের ক্ষেত্রে 'অভিযোগ করে' ব্যবহার করা যেত, বা কোনো বিশেষণ ব্যবহার করা থেকেই বিরত থাকতে পারত। কিন্তু যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো কথা উচ্চারিত হচ্ছে, তখনই বেছে বেছে বিশেষ কিছু শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে।

'হিট অ্যান্ড রান' শিরোনামের অধ্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্করণগুলোকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা লক্ষ করা যাক। হরিলাল সিংহানিয়া লুটের যে বর্ণনা দিয়েছে, তাতে মনে হয় এখানে অনেক লোক জড়িত ছিল (দুজন পাকিস্তানি সৈনিক এবং ১২ জন পাকিস্তানপন্থী বেসামরিক লোক), যা এই অভিযোগকে বসুর কাছে 'অবিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে এবং প্রকাশের পূর্বে তা আরও বিশদভাবে যাচাই করা উচিত ছিল' (১৩৮)। কিন্তু এর বিপরীত অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রে কেন একই ধরনের সূক্ষ্ম যাচাই প্রযোজ্য হবে না? পোলাঘাট রেল ফ্যাক্টরিতে লুট, জোরপূর্বক কাজ করানো এবং হত্যাকাণ্ডের যে দাবি সিংহানিয়া করেছে (বসু

এটাকে 'চাঞ্চল্যকর অভিযোগ' হিসেবে বর্ণনা করেছে), তা খণ্ডনের জন্য বসু কর্নেল মুহাম্মদ সাফির দ্বারস্থ হয়েছে, যাকে বসু 'মৃদুভাষী কিন্তু মতামতে অটল' বলেছে, যে 'প্রতিটি অভিযোগের সরাসরি উত্তর দিয়েছে'। ইতিহাস কি তাহলে স্নিগ্ধ আচার-ব্যবহার এবং আতিথেয়তায় পর্যবসিত হয়েছে ('কোনো পূর্বপরিচয় ছাড়াই আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলো')? (১৩৮) যে সবচেয়ে ভালো গল্প বলে, সে হবে নথির ইতিহাসবিদ? লুট সম্পর্কে কর্নেল সাফির উত্তর হচ্ছে 'এ রকম ঘটনার কথা কখনো শুনিনি' এবং 'যদি একজন কর্মকর্তা... এ রকম কোনো ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকত, তবে এটা রিপোর্ট হওয়ার কথা ছিল' (তাহলে বলতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে শৃঙ্খলায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থান পৃথিবীতে অনন্য!)। জোরপূর্বক কাজ করানোর বিষয়ে সাফির বক্তব্য হচ্ছে, এটা স্বেচ্ছাশ্রম ছিল, কারণ 'মানুষ দল বেঁধে এসেছিল' (১৩৯)। বসু বাকি শূন্যস্থানটুকুও জুড়ে দেয় : 'সম্ভবত মজুরি হিসেবে কাঠ মূল্যবান ছিল'। অধিকন্তু, সাফি লোকজনকে 'খাবার পানি, চিকিৎসাসেবা' দিয়েছিল এবং 'অবিরত ভারতীয় চলচ্চিত্রের গান' শুনিয়েছিল, যার জন্য 'হাজার হাজার লোক এসেছিল' (১৩৯)।

বইয়ের এই অংশ পড়ার পর বাঙালি পাঠকেরা হয়তো আবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাইবে, শুধু স্বেচ্ছাশ্রমের এই স্বর্গে অংশগ্রহণের জন্য। একটা পর্যায়ে বসু অবশেষে বুঝতে পারে যে, সাফির গল্প একটু বেশি উদ্ভট কল্পনায় পরিণত হচ্ছে। ফলে সে শেষে যোগ করে : 'এটা হতে পারে যে যেসব স্থানীয় লোককে কর্নেল সাফি দায়িত্ব দিয়েছিল, তারা অনেক স্বেচ্ছাশ্রমিককে জোর করে কাজে এনেছিল'। সুতরাং বোঝা গেছে, স্থানীয় সহযোগীদের দায়ী করা যায় (যাদের রক্ষা করতে বসু অনাগ্রহী), কিন্তু সেনাবাহিনী কখনোই সহিংসতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না। পরিশেষে, হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে কর্নেল সাফির সহজ বক্তব্য হচ্ছে, 'সেনাবাহিনীর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।' এখানেই বিষয়ের সমাপ্তি—বসুর বইতে সমীকরণের দুই দিক মিলে গেছে।

অন্যদিকে, ঠাকুরগাঁওয়ে বাঘের খাঁচায় বাঙালিদের অত্যাচার করার কাহিনির মধ্যে সম্ভবত অতিশয়োক্তি থাকতে পারে, কিন্তু এটা উন্মোচন করার দায়িত্ব অভিযুক্ত অত্যাচারকারীদের দেওয়া উচিত হবে না। এখানেও অত্যাচারের শিকার শফিকুল আলম 'দাবি করে', 'অভিযোগ করে' এবং 'আপাত অবিশ্বাস্য' (১৪০, ১৪১)। কিন্তু বসু যখন অত্যাচারকারী হিসেবে অভিযুক্ত ব্রিগেডিয়ার (লেফটেন্যান্ট কর্নেল) আমির মুহাম্মদ খানের সঙ্গে দেখা করে, তার তদন্তপ্রবণতা উবে যায়। বসু মেনে নেয় যে মুহাম্মদ খান 'শুধু শফিকুলকে ভেতরে ফেলে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল'। 'এটাই একমাত্র ঘটনা ছিল', যদি অন্য কেউ বাঙালিদের নির্যাতন করে থাকে 'তবে মুহাম্মদ খান তা অবশ্যই জেনে যেত' এবং 'সেনানিবাসে কাউকে গুলি

করা হয়নি' (১৪২)। পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের মসৃণ আদর দ্বারা বসু কীভাবে চমৎকৃত (বাঙালি কর্মকর্তাদের কোনো গুণ বসুর চোখে পড়েনি) তা ব্রিগেডিয়ার খানের বর্ণনা থেকে ফুটে ওঠে : 'কৌতুক রসবোধসম্পন্ন একজন প্রাণবন্ত মানুষ', যে প্রশ্নগুলোকে 'ভালোভাবেই নিয়েছিল' (১৪২) এবং একটি বিশ্বাসযোগ্য 'স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছিল'। নির্যাতনের গল্পগুলো দ্রুত বাতিল করার পর বসু ব্রিগেডিয়ার খানের একটি গল্প হুবহু বর্ণনা করে, যেখানে একজন পাকিস্তানি কর্মকর্তা এবং তার পরিবারকে 'সবচেয়ে নির্মমভাবে' হত্যা এবং 'জাতিগত হত্যার মাধ্যমে ৩-৪ হাজার বিহারি পরিবারকে পিতৃহারা করা হয়' (১৪৩)।

বর্ণনার বিষয় থেকে সরে এসে, বসু তার সঙ্গে খানের একটি রসপূর্ণ আলাপের কথা উল্লেখ করে, 'আমি তাকে বলেছিলাম যে, আমি তাকে "ঠাকুরগাঁওয়ের আওরঙ্গজেব" হিসেবে আমার পাণ্ডুলিপিতে বর্ণনা করছি এবং আরও বলেছিলাম যে সে যদি বাঙালিদের গান এবং নাচ বন্ধ করে দেয়, তবে মানুষ তার সম্পর্কে যে নিন্দা করে তার জন্য সেই দায়ী!' বসু এরপর উল্লেখ করে, 'আমির বিষয়টি হাস্যরসের সঙ্গেই নিল।' আমিরের রসাল এবং নির্দোষ আত্মা শান্তি পাক! সুরসিক কাজী খালিদ আশরাফ বসুর এই গদ্যের বিদ্রূপ করে লিখেছে :

> ও, তিনি নিতান্তই আদুরে, খুবই প্রীতিকর। আমি সারা জীবনই বুঝতে পারলাম না যে, কেন অক্ষম বাঙালি পুরুষ (এবং কিছু ছ্যাঁচড়া নারীরাও) তাকে 'দানব', 'পশু' ইত্যাদি সব জঘন্য নামে ডাকে... যদি আমি পারতাম, তবে এসব নাম পরিবর্তন করতাম এবং 'হ্যালো কিটির' মতো আদুরে নাম দিতাম। আমি এটাকে বলতাম, 'হ্যালো জেনারেল'। হুম, আমি জেনারেলদের প্রতি এই অবিচার মেনে নিতে পারছি না। আমি কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা খুবই ভালো, তারা সব সময়ই ফিটফাট এবং আচার-ব্যবহারে গোছানো ছিল। ১৯৭১ সালের 'দুর্বৃত্তরা' তাদের ভুলভাবেই চিহ্নিত করেছে।[৪৭]

শর্মিলা বসু তার বইয়ের শুরুতে সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছে যে, বিদেশি সাংবাদিকদের প্রতিবেদনগুলোও সতর্কতার সঙ্গে যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন, যেন 'শোনা গল্পের ভিত্তিতে তৈরি প্রতিবেদনগুলো থেকে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণকে আলাদা করা যায়' (১০)। কিন্তু কয়েক অধ্যায় পরে সে নিজেই নিজের উপদেশ ভুলে গিয়েছে। বসু লিখেছে, বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলোও কারখানাতে অবাঙালিদের গণহারে হত্যা করার প্রমাণ প্রকাশ করেছিল (৮৭)। এ রকম একটি 'বিদেশি সংবাদমাধ্যমের' কথা সে ফুটনোটে উল্লেখ করেছে। এটা হচ্ছে ১১ মে ১৯৭১ সালের *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর ম্যালকম ব্রাউনের প্রতিবেদন। যখন আমি মূল প্রবন্ধটি খুঁটিয়ে দেখলাম, তখন এই স্বীকারোক্তিটি দেখলাম : 'অফিশিয়াল এসকোর্টদের সহায়তায় পাকিস্তান সরকার যে ছয়জন বিদেশি সংবাদকর্মীকে পূর্ব পাকিস্তানে ভ্রমণের সুযোগ দিয়েছিল, তাদের একজন এই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।' যদি যুদ্ধরত একটি সেনা সরকার ভ্রমণের গাইডের ব্যবস্থা করে, পরিষ্কারভাবেই এর উদ্দেশ্য হচ্ছে

বিরোধীপক্ষের নির্মমতার সাজানো প্রমাণগুলো সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরা। ভ্রমণটি যে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত, সেই কথা বসু উল্লেখ করল না কেন? পাকিস্তান সরকারের প্রচারণার কৌশল সম্পর্কে তারিক আলী লিখেছে :

> বালুচিস্তানের ওপর অভিযান পরিচালনার সময় যে ধরনের প্রেস সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়েছিল, বাংলাদেশ জেনোসাইডের ক্ষেত্রে তার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে সরকার একটি সহজ গোয়েবেলসীয় নীতি অনুসরণ করেছিল : মিথ্যাগুলো বিরক্তিকরভাবে প্রতিদিন প্রেস, রেডিও এবং টেলিভিশনে বারংবার প্রচার করা হতো।[৪৮]

বসু অ্যান্থনি মাসকারেনহাসকে সমালোচনা করেছে বাঙালি হত্যার ঘটনার পরোক্ষ বিবরণ উপস্থাপন করার জন্য। অথচ যেই ম্যালকম ব্রাউনের ওপর বসু নির্ভর করেছে, সেও সমানভাবে পরলব্ধ : 'শোনা যায় বিপুলসংখ্যক বিহারিকে হত্যা করা হয়েছে' এবং 'সংবাদকর্মীদের কবরগুলো দেখানো হয়, যেখানে ১৫২ জন বিহারিকে কবর দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়'।

১২ মে ১৯৭১ সালের নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে, একাধিক পত্রিকা এই সরকারি পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। ভিন্নভাবে প্রকাশিত একমাত্র খবরটি ছিল এপির জন্য করা মোর্ট রোজেনব্লুমের প্রতিবেদন।[৪৯] এই প্রতিবেদনে সম্পাদক রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ভ্রমণের কথা উল্লেখ করে এবং লেখে 'এই প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদনটি ব্যাংকক থেকে পাঠানো হয়েছে, যা পাকিস্তানি সরকারের সেন্সরশিপের বাইরে'। রোজেনব্লুম 'দৃশ্যমান প্রমাণ এবং সরকারি বর্ণনার বাইরে প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনার' ওপর নির্ভর করে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছিল। সে এই বলে শেষ করে যে 'সম্ভবত পাঁচ লক্ষেরও বেশি দেহ' এবং 'কেউ জানে না কত বাঙালি পরিবারকে সেনাবাহিনী হত্যা করেছে বা কতজন অভিবাসী বিহারি শ্রমিককে বাঙালি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কুপিয়ে হত্যা করেছে'। তথ্য ধামাচাপা দেওয়ার কথা উল্লেখ করে সে বলে : '২৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান থেকে সংবাদকর্মীদের বহিষ্কার করা হয়। এই সময় ৪০ জন সংবাদকর্মীকে একত্র করে তাদের নোট এবং ফিল্ম কেড়ে নেওয়া হয়। এরপর ৬-১১ মে ছয়জন সাংবাদিকের একটি দলকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়।' রোজেনব্লুম কি অন্য পাঁচজন প্রতিবেদকের চেয়ে অধিক সঠিক চিত্র তুলে ধরেছিল? আমরা এখনো সেটা জানি না, এবং বসুও তা জানে না। কিন্তু সে শুধু নিজের হাইপোথিসিসের সঙ্গে মিল রাখা প্রতিবেদনগুলো বাছাই করেছে।

সংখ্যা ও শব্দের সংযুক্তি

বইটির প্রকাশনা-পরবর্তী প্রচারণায় ফলাও করে বলা হয় যে *ডেড রেকনিং* 'মিথকে ভুল প্রমাণিত' করবে। ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যার দাবি বসুকে সবচেয়ে বেশি বিরক্ত করেছে, যা সে 'দৈত্যাকার রূপকথা' শীর্ষক একটি অধ্যায়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ

করেছে। মৃতের সংখ্যার এই হিসাব যে বেশি হতে পারে, তা ১৯৭২ সালেই বাঙালি গবেষকেরা আলোচনা করেছিল। কিন্তু বসু শেষতক হামুদুর রহমান কমিশনের হিসাবকেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হিসেবে মেনে নিয়েছে—যেখানে মৃতের সংখ্যা 'সর্বোচ্চ' ২৬ হাজার বলে অনুমান করা হয়েছিল। বৈশ্বিক সহমর্মিতা আদায়ের কাজে বাঙালি এবং ভারতীয়রা মৃতের সংখ্যার অতিশায়ন করে থাকতেই পারে, কিন্তু বসু পাকিস্তানি হিসাবকেই আঁকড়ে ধরেছে, এমনকি যেখানে কমিশনের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল এই হিসাবে 'ভুল থাকতে পারে, মৃতের সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে' (১৭৮)। মৃতের সংখ্যা ৩০ লাখ বা তার চেয়ে কম হোক, এটা কি অস্বীকার করা যাবে যে জেনোসাইড ঘটেছিল? যে বইতে মৃতের সংখ্যা এবং জেনোসাইড উভয় বিষয়কেই অস্বীকার করা হয়েছে, সেই বইতেই শেষ পৃষ্ঠায় একটি দোষক্ষালন সতর্কীকরণ রয়েছে : 'পরিশেষে, সংখ্যা বা নামকরণ মূল বিষয় নয়' (১৮৩)। যদি এগুলো মূল বিষয় না হয়ে থাকে, তবে এগুলোকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য এতগুলো পাতা খরচ করা হলো কেন?

বসু দাবি করেছে, সে-ই এই মৃতের সংখ্যাকে 'প্রথম' চ্যালেঞ্জ করেছে। কিন্তু আফসান চৌধুরী উল্লেখ করেছে যে সংখ্যা নিয়ে তর্কবিতর্কের কারণে ১৯৭২ সালেই জরিপগুলো শুরু হয়, এবং অবশেষে জিয়ার শাসনামলে এই জরিপগুলোর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমি জেলা পর্যায়ে জরিপ পরিচালনা করে এবং তাদের জরিপে মৃতের সংখ্যা প্রচলিত ধারণার চেয়ে কম পাওয়া যায়।[৫০] ১৯৭৪ সালের পর মৃতদেহ কবর থেকে তোলার বিষয়টি আলোচনার বাইরে চলে যায়—এই বিষয়টি বসু বুঝতে পুরোপুরি ভুল করেছে। ফলে সে লিখেছে, 'প্রথম বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক সহমর্মিতা এবং সহায়তার অনেক প্রস্তাব ছিল (৬৮)।' এই সময়ে ওআইসির (অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন) সমর্থন পাওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু যে অসম চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন, বসু তা বিবেচনায় আনেনি। শেখ মুজিব এই চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ তখন অর্থনীতির অবস্থা চূড়ান্ত মাত্রায় নাজুক ছিল—ফলে তেল-অর্থের গুরুতর প্রয়োজন ছিল। পরবর্তী সময়ে বসু এটাও উল্লেখ করেছে যে, জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালে যুদ্ধ করেছেন, ফলে তাঁর শাসনামলকে মৃতের সংখ্যা হিসাব করার প্রচেষ্টার সময় হিসেবে দেখা উচিত। কিন্তু এটা জিয়ার শাসনামলের ভুল ব্যাখ্যা। সেই সময়ে লীগের প্রতি বিশ্বস্তদের বাইরে একটি শক্তিকাঠামো তৈরির প্রচেষ্টা ছিল, যা অংশত ১৯৭১-এ অপরাধের দায়ে অভিযুক্তদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে জিয়া সরকার সম্পন্ন করে।

১৯৯২ সালে জুনায়েদ কাজী প্রথম দিককার একটি ইন্টারনেট সাইটের জন্য মৃতের সংখ্যা সম্পর্কিত গণমাধ্যমের হিসাবগুলো সংগ্রহ করে।[৫১] সংখ্যাগুলো ৩০

লাখ (সর্বোচ্চ) থেকে শুরু করে ২ লাখের (সর্বনিম্ন) মধ্যে ছিল। এই পরিসংখ্যানটি নিয়ে বাংলাদেশ সাইবার-সার্কেলে বিতর্ক হয় (এটা ছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রচলনের আগেকার সময়, তাই বিতর্কগুলো প্রধানত soc.culture.bangladesh গ্রুপেই হয়েছিল)। পরবর্তী সময়ে আফসান চৌধুরীর গবেষণাতেও সংখ্যার এই তারতম্য উঠে আসে এবং তাঁর উপসম্পাদকীয়তেও একই কথাগুলো উল্লেখ করা হয়।[৫২] এই সবকিছুই বাংলাদেশি ইতিহাস-সম্পর্কিত গণবিতর্কে স্থান করে নিয়েছে। ফলে বসুর বড় দাবি—মৃতের সংখ্যা নিয়ে ভিন্নমত পোষণকারী 'প্রথম' হচ্ছে এই বই—একটি অসত্য এবং আত্মপ্রচারকারী দাবি।

কিছু নামকরণ গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত ১৯৭১ সালের অমীমাংসিত বিষয়গুলোর আইনগত চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিলে। পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয়টি ইতিমধ্যে সম্ভবত হাতছাড়া হয়ে গেছে। এই কাজের জন্য উপযুক্ত সময় ছিল ১৯৭২, কিন্তু সেই সময় এই অফিসাররা পাকিস্তানে বন্দী বাঙালিদের বিনিময়ে দাবার ঘুঁটি হিসেবে কাজ করেছে। 'বিহারি' বা 'আটকে পড়া পাকিস্তানিদের' প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি এখন মীমাংসিত—তাদের বাংলাদেশে আত্তীকরণের মাধ্যমে, এবং ২০০৮ সালের নির্বাচনের সময়ে আদালতের আদেশের মাধ্যমে (লজ্জাজনকভাবে দেরিতে)। আদালতের এই আদেশে তাদের সম্পূর্ণ ভোটের অধিকার দেওয়া হয়। এখন পাকিস্তানিদের সমর্থনে যেসব বাঙালি যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের বিচার বাকি আছে [প্রবন্ধটি ২০১১ সালে রচিত]। বর্তমান রাজনীতির ওপর এর একটি সরাসরি প্রভাব রয়েছে, কারণ অভিযুক্তদের অনেকে প্রধান ইসলামপন্থী দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জামায়াতের প্রধান গোলাম আযম ইতিমধ্যে অবসর গ্রহণ করেছে (সম্ভবত দলের নবীন সদস্যরা তাকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করেছে, যারা ১৯৭১-এর কলঙ্কচিহ্নটি মুছে ফেলতে চায়), কিন্তু দ্বিতীয় সারির নেতারা বর্তমান সরকারের তদন্তের আওতায় আছে।

অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সম্ভাবনা এখনো একটি খুব আবেগঘন বিষয় এবং আওয়ামী লীগ 'স্মৃতি একাত্তর'-এর ওপর দলীয় দাবি শক্তিশালী করার আশা করে, যা ধারাবাহিকভাবে তাদের সাহায্য করে এসেছে, বিশেষত তরুণ ভোটারদের ক্ষেত্রে। কিন্তু ওয়ার ক্রাইম ট্রাইব্যুনালের আইনি কাঠামো আরও শক্তিশালী করতে হবে বলে বিশ্লেষকেরা বলেছে।[৫৩] জামায়াত ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক আইনজীবীদের ব্যবহারে নিজেদের শক্তি দেখিয়েছে। তারা *ইকোনমিস্ট*-এর একটি প্রবন্ধকে আইনগতভাবে চ্যালেঞ্জ করেছে[৫৪], যেখানে আলবদরের প্রধান হিসেবে জামায়াতের মতিউর রহমান নিজামীর নাম উল্লেখ করা হয়। 'ওয়ার ক্রাইমস ফাইল' নামক চ্যানেল ফোর-এর প্রামাণ্যচিত্র যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা মানহানির মামলায় পরাজিত হয়েছে।

জামায়াতের ব্যবহৃত একটি কৌশল হচ্ছে ১৯৭১ সালে সংঘটিত সহিংসতার প্রকৃতির পুনঃসংজ্ঞায়ন করা। ২০০৭ সালে জামায়াতের একজন আইনজীবী টেলিভিশনে ডেথ স্কোয়াড থাকার কথা অস্বীকার করে। সে আরও বলে, যেসব ব্যক্তি পাকিস্তানপন্থী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিল, তারা বৈধ একক কাঠামোকে রক্ষা করছিল এবং তাদের এই কাজগুলো যুদ্ধাপরাধ ছিল না। যে পরিস্থিতিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিভিন্ন ধরনের আইনি এবং রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে, সেখানে ১৯৭১-এ সংঘটিত জেনোসাইডের উপস্থিতি মুছে ফেলার যে চেষ্টা বসু করেছে, তা ঘটনা-নিরপেক্ষ কাজ হতে পারে না।

প্রয়োজনমাফিক পাঠ

যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী সম্পর্কে ব্যবহার করা শব্দের তালিকা বসুকে খেপিয়ে তুলেছে। শব্দগুলো হচ্ছে: 'খানসেনা', 'পাঞ্জাবি জারজ', 'বর্বর', 'মানব জানোয়ার', 'হিংস্র হায়েনা' এবং 'বাঘ'। বসু কামরুল হাসানের বিখ্যাত পোস্টার 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে'-কে উদ্ধৃত করেছে, যেখানে মানুষখেকো হিসেবে ইয়াহিয়া খানের ব্যঙ্গচিত্র ছিল। একই সঙ্গে পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে ব্যবহৃত শব্দগুলোকে সে সংযমী বলে উল্লেখ করেছে: 'দুষ্কৃতকারী', 'মুক্তি', 'আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্ত' ইত্যাদি। সে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বাঙালিরা বর্ণবাদী অবমাননায় লিপ্ত হয়েছিল; অন্যদিকে পাকিস্তানি রাষ্ট্র রাজনীতি, আইন এবং শৃঙ্খলার ভাষায় কথা বলেছিল।

বসু যে বিষয়টি হিসাবের মধ্যে আনেনি সেটা হচ্ছে, পাকিস্তানি রাষ্ট্রের শ্বেতপত্র ও দাপ্তরিক নথিগুলোয় স্বল্পসংখ্যক শব্দ নথিভুক্ত থাকার কারণ ছিল বিদ্রোহের মাত্রা এবং জনপ্রিয়তা কম প্রমাণ করা। এটাকে পাকিস্তান যুদ্ধকালীন কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছিল। কম সংখ্যার অর্থ হলো মুক্তিবাহিনী 'পথভ্রষ্ট' এবং মোটের ওপর 'সন্ত্রাসী'। এই কাঠামোতে 'দুষ্কৃতকারী' এবং 'দুর্বৃত্ত' (১৬২) ভালো খাপ খায়।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি সহিংসতা, বর্ণবাদ এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রমাণ খুঁজে বের করা কি খুব কঠিন? আমরা যদি ঢাকা ক্লাবে বাঙালিদের সঙ্গে ভালো সামাজিক সম্পর্কের গল্প থেকে বেরিয়ে আসি, অনেক ম্যাক্রো এবং মাইক্রো সূচক খুঁজে পাব। সাদিয়া তুর ১৯৪৭-পরবর্তী পাকিস্তান[৫৫] নিয়ে তার বইয়ে উল্লেখ করেছে যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি এলিটদের আচরণ ক্রমবর্ধমানভাবে বর্ণবাদী হয়ে উঠছিল।[৫৬] তুর কথোপকথনে এই মনোভাবের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেছে,

> অবশ্যই সাংস্কৃতিক কিছু অন্ধবিশ্বাস ছিল। এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা সাংস্কৃতিকভাবে হিন্দু সংস্কৃতির খুব বেশি দাসত্ব করত। কিন্তু পাকিস্তানি

> সেনাবাহিনীর নিজস্ব জ্ঞানভাষ্য আরও অধিক বর্ণবাদী ছিল। তারা ব্রিটিশদের শেখানো উপমহাদেশের 'সামরিক গোত্র' মতাদর্শে বাঙালিদের 'পৌরুষত্বহীন' বলে অবজ্ঞা করত। ১৯৭১ সালে সেনা অভিযানের সময় এই বর্ণবাদ সবচেয়ে বেশি প্রকাশ্য রূপ নিয়েছিল। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে বর্ণবাদ গড়ে উঠেছিল যে, বাঙালিরা যেহেতু একটি নিচ জাত, তাই তাদের জিন-পুল অবশ্যই শোধরাতে হবে এবং এর জন্য তারা বাঙালি নারীদের জোরপূর্বক গর্ভবতী করার পথ বেছে নেয়। '৭০'র দশকের পর থেকেই বিশ্লেষকেরা এটি নিয়ে কথা বলা শুরু করেন। তাঁদের মতে, পশ্চিম পাকিস্তানে সেনাবাহিনী এবং উদারবাদী সমাজের উচ্চবিত্তদের একটি নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে এই আচরণ পরিপক্ক হতে থাকে।[৫৭]

তারিক আলী এই বিষয়টির ওপর মন্তব্য করেছে,

> সৈনিকদের বলা হয়েছিল যে, বাঙালিরা একটি নিচু জাত; খাটো, কালো, দুর্বল (সামরিক পাঞ্জাব জাতের মতো নয়) এবং তারা হিন্দুত্ববাদের দ্বারাও আক্রান্ত। জুনিয়র এবং সিনিয়র উভয় ধরনের অফিসারই অভিযানের সময় বাঙালিদের জিন শোধরাতে চাওয়ার কথা বলেছে। এই ধরনের ফ্যাসিস্ট কথাবার্তা বাঙালি নারীদের গণধর্ষণের সবুজসংকেত হিসেবে কাজ করেছে এবং এই ক্ষেত্রে শ্রেণি বা ধর্মবিশ্বাস বিবেচনা করা হয়নি।[৫৮]

অ্যান্থনি মাসকারেনহাস একই ভাবে পূর্ব পাকিস্তানিদের 'অর্ধ মুসলমান'[৫৯] এবং 'কাফের' এবং বাঙালি হিন্দুদের 'অনির্ভরযোগ্য, অবাঞ্ছিত বহিরাগত'[৬০] বিবেচনার সমীকরণ নথিভুক্ত করেছে। কুমিল্লাতে এক পাঞ্জাবি কর্মকর্তা মাসকারেনহাসকে বলে, 'হায় আল্লাহ, এ রকম সুন্দর জমি দিয়ে আমরা কত কিছুই না করতে পারতাম... কিন্তু বেশি দিন এখানে থাকলে আমরা ওদের মতো হয়ে যেতাম।'[৬১]

উপাখ্যানগুলোর চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অবকাঠামো। পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির সুপারিশ এবং *ডন* পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, বাঙালিদের নিম্নতর নাগরিক হিসেবে দেখা হতো। এই ইতিহাস বসু এড়িয়ে গেলেও, তুর তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছে। পাকিস্তান সরকারের জাতীয় ভাষানীতি থেকে এই ইতিহাস শুরু হয়—এই নীতির যেকোনো বিরোধিতাকারীকে জিন্নাহ 'পাকিস্তানের শত্রু' আখ্যা দেয়।[৬২] ১৯৫২-পরবর্তী সময়ে বাংলা স্বীকৃতি পায়, তবে তা এই শর্তে যে 'সংস্কৃত ভাষার শব্দ ব্যবহারের নিরর্থক প্রবণতাকে'[৬৩] নিরুৎসাহিত করার জন্য এই ভাষাকে 'পুনর্গঠন'[৬৪] করা হবে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্তানের গণমাধ্যমে উঠে আসে ধর্মীয় শ্লেষ এবং বহিরাগত শক্তির গুজব নিয়ে। প্রতিবেদনগুলোতে 'অমুসলিম বিদেশি'[৬৫] 'যারা ভিন্ন পোশাক পরে'[৬৬] এবং 'হিন্দুরা উর্দুবিরোধী রচনা বিতরণ করছে'[৬৭] বলে অভিযোগ করা হয়। এই ঘটনাকে মুসলিম লিগ 'হিন্দুদের চক্রান্ত'[৬৮] হিসেবে উল্লেখ করে। ১৯৫২ সালের বিপদ কেটে যাওয়ার পর দমনের কাঠামো আরও পাকাপোক্ত হয়, যা বাঙালিদের প্রতি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে অবাঙালি সদস্যদের মানহানিকর আচরণের মাধ্যমে বর্ধিত রূপ ধারণ করে।[৬৯]

বসুর বইয়ের কমতি সম্পর্কে তুরের মত হচ্ছে, 'ক্রমাগত এই মাত্রায় তথ্য এড়িয়ে যাওয়াকে ভুল বা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হিসেবে বিবেচনা করা যায় না'।[৭০]

পাকিস্তান আমলের মানহানিকর ভাষা বসুর বইয়ের মধ্যেও ঢুকে গেছে। যুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত প্রাণিবাচক বিশেষণগুলো সম্পর্কে সে নিন্দা করলেও বাঙালিদের সম্পর্কে একই রকম দুটি বর্ণনা দিয়ে তার বইটি শুরু হয়েছে : 'মৌমাছির ঝাঁকের মতো' (মেজর জেনারেল হাকিম কোরেশি, পাকিস্তান সেনাবাহিনী) এবং 'ভোমরের ঝাঁক' [আর্চার ব্লাড (৮)]। সে আরও উল্লেখ করে যে নীরদ চৌধুরী বাঙালির 'আত্মকরুণার' (২১) কথা বলেছে, এবং জি ডব্লিউ চৌধুরী বলেছে যে 'কঠোর পরিশ্রম এবং গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের চেয়ে বাঙালিরা নেতিবাচক এবং ধ্বংসাত্মক মনোভাবের অধিকারী হিসেবে পরিচিত' (২১)।

এই জাতিগত ভাষা দাঁড় করানোর পর, বসু বাঙালিদের ১৯৭১ সম্পর্কিত বয়ানকে 'তথ্যগত যথার্থতা বা বিশ্লেষণগত জটিলতার ব্যাপারে অমনোযোগী' (৫), 'একরোখা ঘৃণা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ' (৮), 'নাটকীয় ভাষা এবং বর্ণনা' (৪৬), 'কিছুটা অতিনাটকীয় ভঙ্গিতে ভাষার ফুলঝুরি' (১৪০) এবং 'নির্বোধ মিথ্যা বর্ণনা' (১৬৩) হিসেবে উল্লেখ করেছে। সর্বোপরি, একজন বাঙালি একজন ভালো 'আড্ডাবাজ' (৭৪)—বসুর কাছে সে উচ্ছ্বসিত গল্পকার, কিন্তু ইতিহাসের উৎস হিসেবে নির্ভরযোগ্য নয়।

বাঙালি লাইন-সর্দার হারুনের ঘটনাটি বিবেচনা করা যাক। তাকে বিহারি ডেথ স্কোয়াড ধরে ফেলে এবং বয়লারে নিক্ষেপ করে। এই ঘটনাকে বসু বাঙালিবিরোধী সহিংসতা হিসেবে বিবেচনা করেনি, বরং এটা বাঙালিদের কাপুরুষতার প্রমাণ : 'ঘরভর্তি বাঙালিরা বসে বসে তা দেখল, একজনও অসহায় হারুনকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না' (৮৩)। একটি 'ছোট' বিহারি ডেথ স্কোয়াডের বিরুদ্ধে বাঙালিদের নিষ্ক্রিয়তা আসলে এটাই প্রকাশ করে যে, এসব সংগঠনের পেছনে সেনাবাহিনীর সমর্থন ছিল ভয়াবহ—কিন্তু বসু সে দিকটা ধরতে পারেনি।

যুদ্ধরত বাঙালিদের সে অযৌক্তিক কাজে ব্যস্ত বলে বিচার করেছে। যেমন জাহানারা ইমামের ছেলে রুমীর মৃত্যুকে সে ঠান্ডা মেজাজে মূল্যায়ন করেছে। রুমীর সাহসী অভিযানগুলোকে বাতিল করেছে এই বলে যে, এগুলো 'নিছক শিশুসুলভতা এবং শৌখিন আচরণ'। পরবর্তী সময়ে আরও প্রশ্ন করেছে 'এই "অ্যাকশন" বাংলাদেশের স্বাধীনতায় কীভাবে অবদান রেখেছে?' (১৩৫)। "অ্যাকশন" শব্দটিতে উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে, গোটা বইটিতে যে বিষয়গুলোকে বসু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখেছে, সেগুলো উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে; এই বিষয়ে আরেক দিন আলোচনা করব। বসু দুই দিক থেকে সুবিধা নিয়েছে—রুমীর স্বল্পস্থায়ী অভিযানগুলোকে 'শিশুসুলভ' বলে

উড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাজের সঙ্গে এগুলোর তুলনা করেছে : 'তার মতো "শত্রু যোদ্ধাদের" (বসু এখানে ৯/১১ পরবর্তী মার্কিন শব্দ 'এনিমি কমব্যাট্যান্ট' ব্যবহার করেছে) হত্যা করাকে সঠিক মনে করলে অন্য পক্ষের কি সমালোচনা করা যায়? এই যোদ্ধারা তো তাদের দেশকে বিভক্ত করতে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল (১৩৬)।' রুমীদের দলটিকে গ্রেপ্তার করার ঘটনাটি সামরিক পদক্ষেপের ন্যায্যতা প্রমাণের হাতিয়ার হয়ে যায় : 'যারা এসব কাজের সঙ্গে সত্যিকার অর্থে যুক্ত নয়, এ রকম কাউকে তারা আটকে রেখেছিল বলে মনে হয় না (১৩৭)।'

সংঘর্ষের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে

১৯৭০ সালের নির্বাচন-পরবর্তী আলাপ-আলোচনা থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মার্চে সামরিক অভিযান পর্যন্ত ঘটনা অনেকভাবেই আবছা রয়ে গেছে। কারণ, অনেক প্রশ্নের উত্তর এখনো অজানা। অনেক সাংঘর্ষিক প্রবণতাসহ ক্রমবর্ধমানভাবে হতাশ বাঙালি জনগণ, এবং গোটা পাকিস্তানের নেতা হওয়ার নির্বাচনী ম্যান্ডেট—এই দুই প্রবণতার মাঝে থেকে বঙ্গবন্ধু কীভাবে নেতৃত্বের ভারসাম্য বজায় রেখেছিলেন? লীগের মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব এবং চরমপন্থী ছাত্রনেতাদের (যারা শিক্ষাঙ্গনে বাংলাদেশের পতাকা তুলেছিল) মধ্যে বিরোধগুলো কী ছিল? ঠিক কোন মুহূর্তে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ল? এই সবকিছুই কিছুটা ঝাপসা, কারণ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনেক বাঙালি নেতাকেই সত্তরের দশকে হত্যা করা হয়।

এই জটিল ঘটনাগুলোর প্রতি বসু সম্পূর্ণভাবে অনীহা দেখিয়েছে, কারণ সে শুধুই যুদ্ধের ক্ষতির হিসাব করতে উদ্‌গ্রীব ছিল। ১৯৭০ সালের ভয়ানক ঘূর্ণিঝড় এবং বিশৃঙ্খল ত্রাণ ব্যবস্থা—বসু তাকে শুধু 'ভয়াবহ বন্যা' (১৯) এবং অলস বাঙালিদের দোষ হিসেবে বর্ণনা করেছে। প্রকৃতপক্ষে ত্রাণ বিতরণ, এবং দুর্যোগকবলিত অঞ্চল পরিদর্শনে ইয়াহিয়ার বিলম্ব, বঙ্গবন্ধুর জন্য নির্বাচনী প্রচারণার হাতিয়ারে পরিণত হয়। *সোনার বাংলা শ্মশান কেন* পোস্টারের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের বিকারহীনতার চিত্র ফুটে ওঠে। ফলে ত্রাণ বিতরণ প্রচেষ্টার বিশৃঙ্খলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে কাজ করে। বসু এই গোটা বিষয়টি এড়িয়ে যায়। এর পরিবর্তে সে শুধু লেফটেন্যান্ট জেনারেল (লেফটেন্যান্ট) গোলাম মোস্তাফার ত্রাণ বিতরণের স্মৃতির কথা উল্লেখ করেছে : 'আমরা কাজ করেছি, আর বাঙালিরা দাঁড়িয়ে দেখছিল এবং অভিযোগ করছিল যে, কিছুই করা হয়নি।'

দুই পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতার বিষয়টি বাঙালি এবং আমেরিকান অর্থনীতিবিদেরা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। কিন্তু বসুর মতে, এগুলো 'শুধুই পরিসংখ্যান যা 'অসমতা' তুলে ধরে, কিন্তু তার অর্থ 'বৈষম্য' নয়' (২০)।

কিন্তু এসব বিশ্লেষণে শুধু অসমতাকেই চিহ্নিত করা হয়নি, বরং পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত রাজস্ব কীভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে চালান হচ্ছিল, তা-ও সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব আয়ের অন্যতম বড় খাত ছিল পাট রপ্তানি। যেহেতু এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর সবকিছু পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত ছিল, তাই যেকোনো রাজস্ব আয় প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তানে যেত, তারপর সেখান থেকে তার অংশবিশেষ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ হতো। ওই সময় 'পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার' শিরোনামের একটি ছক গবেষক মহল এবং রাজনৈতিক পরিসরে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল। ১৯৫৬ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত রেহমান সোবহান,[৭১] আখলাকুর রহমান,[৭২] এ আর খান,[৭৩] নুরুল ইসলাম, আনিসুর রহমান এবং অন্যদের[৭৪] অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট দেখানো হয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদের স্থানান্তরের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন ধারাবাহিকভাবে ব্যাহত হচ্ছিল।

বসু খুব সাধারণভাবে উল্লেখ করেছে যে, ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান যেহেতু বেশ দরিদ্র অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছিল, তাই অসমতা 'এক রাতেই দূর করা সম্ভব ছিল না' (২০)। তবে অর্থনীতির তত্ত্ব অনুসারে অন্য সব চালক স্থির থাকলে, এবং সরকারের স্বতঃপ্রণোদিত ব্যর্থতা না থাকলে, একটি সুসংহত অর্থনীতিতে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অঞ্চল তুলনামূলক ধনী অঞ্চলের চেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য, অধিকতর দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। একই নিয়মেই তুলনামূলকভাবে দরিদ্র ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। বসু ইচ্ছাকৃতভাবেই বিদ্যমান সব অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকে অগ্রাহ্য করেছে। এমনকি ইয়াহিয়া খানও ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকে স্বীকার করেছিল যে, অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষোভগুলো যুক্তিযুক্ত ছিল (এই বৈঠকে বৈদেশিক এবং প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে বিবাদের বিষয়ে পরিণত হয়)। রেহমান সোবহানের মতে,

> ষাটের দশকের প্রথম থেকেই পাকিস্তানিরা স্বীকার করা শুরু করে যে, পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কিত নীতিমালা এবং সম্পদের বণ্টনে বৈষম্য ছিল। মাহবুবুল আলম তাঁর *স্ট্র্যাটেজি ফর ইকোনমিক প্ল্যানিং* শীর্ষক বইতে এই বিষয়টি বেশ যুক্তিসহকারে তুলে ধরে। এই বিষয়ে প্রচুর রচনা রয়েছে এবং এগুলো স্পষ্টতই শর্মিলা বসু পড়েনি।[৭৫]

সামরিক বাহিনীকে ব্যবহারের ব্যাপারে বসু বলে, 'ইয়াহিয়া খান এটা করতে অসম্মতি প্রকাশ করে (২০)।' কিন্তু এই বাক্য নির্বাচন-পরবর্তী ক্ষমতার সমীকরণের একেবারেই ভুল ব্যাখ্যা। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে সামরিক বাহিনী দাবি করে যে, তারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতার হস্তান্তর চেয়েছিল, এবং যুদ্ধের জন্য শুধু

রাজনীতিবিদেরা দায়ী। বসু এই দাবি মেনে নেয়, যদিও বাস্তবতা অনেক বেশি জটিল ছিল। অভূতপূর্ব একটি সর্ব-পাকিস্তান অভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব খানের কাছ থেকে ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। এই অভ্যুত্থানের তিনটি চিহ্নিত শত্রু ছিল : ভূস্বামী এলিট, ব্যবসায়ী শ্রেণি (প্রায় সবাই পশ্চিম পাকিস্তানি), এবং সামরিক বাহিনী। বরাবরের মতোই, নিজেদের বাঁচানোর জন্য সামরিক বাহিনী আইয়ুবকে বলি দেয়। ইয়াহিয়ার মূল দায়িত্ব ছিল বেসামরিক রাজনীতিবিদদের কাছে ক্ষমতার হস্তান্তর এবং একই সঙ্গে প্রধান ক্ষমতার ক্ষেত্রগুলোতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা বজায় রাখা (এটি বর্তমানের 'জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের' একটি পূর্বরূপ)।

নির্বাচনের ফলাফল কী হবে, এই নিয়ে সেনাবাহিনীর মনোভাবের বিষয়ে *ডেড রেকনিং*-এ কোনো আলোচনা নেই। স্থানীয় গোয়েন্দাদের (বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানে) ভুল তথ্যের দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে, বা পাকিস্তানের রাজনৈতিক শ্রেণির বিবাদময় অতীত দ্বারা অতি-আশ্বস্ত হয়ে, সামরিক বাহিনী ভেবেছিল যে নির্বাচনের ফলাফল একটি 'ঝুলন্ত সংসদ' হবে। যেখানে কোনো দলই একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। ফলে সেনাবাহিনী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং মধ্যস্থতাকারী হবে। ইয়াহিয়া আশা করেছিল যে নির্বাচনের পর সে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাবে। ফলে শেষতক সে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং সেনাবাহিনীর ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করবে।

বসু ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের দিকে তাকায়নি এবং নির্বাচন থেকে মাওলানা ভাসানীর প্রত্যাহার বিষয়ে শুধু একটি বাক্য ব্যয় করেছে (২১)। কিন্তু এই দুটি ঘটনা নির্বাচন-পূর্ববর্তী অনেক হিসাব-নিকাশ তছনছ করে দিয়েছিল। ১৯৫৭ সালেই ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের পৃথক হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করে পশ্চিম পাকিস্তানকে বলেছিলেন 'আসসালামু আলাইকুম'[৭৬]। কিন্তু তাঁর বিরোধীদের (এর মধ্যে রয়েছে যুদ্ধকালীন আওয়ামী নেতৃত্ব এবং ৭১-পরবর্তী লীগ) সফলতার ঢেউয়ে তিনি শেষতক অনেক পিছিয়ে পড়েছিলেন। নির্বাচন থেকে নিজের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করার মাধ্যমে ভাসানী প্রতীকী মূল্য অর্জন করার আশা করলেও এর ফলাফল ছিল একেবারে বিপরীত। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় ভাসানীর দল এবং অন্য শরিক বাম গোষ্ঠীগুলো পরবর্তী আলোচনার সময় অংশ নিতে পারেনি (এবং যুদ্ধকালীন সরকারেও তাদের অংশগ্রহণ ব্যাপক ছিল না)।

নির্বাচনের ফলাফল এক আচমকা তুফান তৈরি করেছিল—যার ফলে তৈরি হয় একাধিক রণকৌশল, কৃত্রিম আক্রমণ, গলদ হিসাব এবং চক্রান্ত। স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণী এই দিনগুলোর কোনো বিশ্লেষণ বসু করেনি। বরং ভুল মন্তব্য করেছে, 'পরবর্তী তিন মাসে অনেক উত্থান-পতন থাকলেও শেষতক

আশাবাদ বজায় ছিল।' এই বইতে সামরিক অভিযান-পূর্ববর্তী সময়ের ঘটনাপ্রবাহ একেবারেই উঠে আসেনি। যদিও সেই ঘটনাপ্রবাহ আওয়ামী লীগের 'একগুঁয়েমি' (বসুর ভাষায়), বিহারিবিরোধী সহিংসতা এবং রাজপথের বিশৃঙ্খলা বুঝতে সাহায্য করে। বসু সেই সময়ের উত্তপ্ত রাজনীতির নিন্দা করেছে এবং এর মাধ্যমে সামরিক অভিযানের বৈধতা দিয়েছে :

> যদি ২৫ মার্চ একটি রাজনৈতিক সমস্যার সামরিক সমাধান চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা নৈতিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে ভুল হয়ে থাকে, তবে এর পূর্ববর্তী সপ্তাহগুলোতে শাসনের দায়দায়িত্বগুলো প্রত্যাখ্যান করাও কম ভুল ছিল না (৩৪)।

২৫ মার্চ পূর্ববর্তী আলাপ-আলোচনার ঘটনাপঞ্জি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এগুলো কি নিতান্তই অস্বচ্ছ ছিল? বসু এ রকমটাই মনে করে, ফলে সে বলে, 'তারা কেন ব্যর্থ হলো, তার চূড়ান্ত বিশ্লেষণ শুধু ভবিষ্যৎ বিশেষজ্ঞরাই করতে পারবে' (২২)। কিন্তু সে বইয়ের পরিশিষ্টের শুরুতে প্রথমেই উদ্ধৃত করেছে সিসন এবং রোজ-এর *ওয়ার অ্যান্ড সেসেশন*[৭৭] বইটি। তার মতে, এটি হচ্ছে ১৯৭১ সালের সংঘর্ষের ওপর লিখিত একমাত্র বিস্তৃত এবং পদ্ধতিগতভাবে গবেষণানির্ভর বই (১৮৬)। বইটিতে কিছু পক্ষপাতিত্ব থাকলেও (বইতে ৩৩ জন পাকিস্তানি, ৪৯ জন ভারতীয়, ৩৯ জন আমেরিকান এবং ১২ জন বাংলাদেশির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে), সিসন ও রোজের বইটি সংঘর্ষের ওপর লিখিত একটি ভালো বই। কিন্তু বসু এই বইকে দিকনির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করে থাকলেও সে বোধ হয় অধ্যায় ৪, ৫ ও ৬ পড়তে বা বুঝতে ভুলে গেছে (সিসন ও রোজ, ৫৪ থেকে ১৩৪ পৃষ্ঠা)। বইটির এই অধ্যায়গুলোতে সমঝোতার বিস্তৃত সূক্ষ্ম বিবরণ আছে এবং এই অংশ থেকে ভেতরকার চক্রান্তের কিছু বিষয় আঁচ করা যায়। কিন্তু *ডেড রেকনিং*-এ সিসন ও রোজের বই শুধু দুটি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত, একে অপরের মুখ দেখাদেখি করতে অস্বীকার করা মুজিব ও ভুট্টো সম্পর্কে মুখরোচক গল্পের উৎস হিসেবে—তাদের 'কিংকর্তব্যবিমূঢ় নবদম্পতি' আখ্যা দিয়ে ইয়াহিয়া আলোচনায় সেনাবাহিনীকে নিরপেক্ষ এবং সংবেদনশীল পক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, সিসন ও রোজের বইয়ের দশম অধ্যায়ের ২৪ নম্বর ফুটনোট, যেখানে ১৯৭১ সালে মৃতের সংখ্যা '৩ লাখ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ৩ লাখ থেকে কমাতে শুরু করে বসু তার 'মনস্টরাস ফেবলস' শিরোনামের অধ্যায়ে ১৯৭১ সালে মৃতের সংখ্যা ২৬ হাজারে নামিয়ে এনেছে।

ভুট্টোর কৌশল

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে চলমান সমঝোতা আলোচনা প্রকৃতপক্ষে বিপুল ক্ষমতার লড়াইয়ের একটি কেস স্টাডি। বানচাল সমঝোতা থেকে ভুট্টোই আইনগত প্রাপ্তির

চেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল—একাত্তর-পরবর্তী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অপ্রত্যাশিতভাবে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, যা আলোচনার সময় তাদের জন্য সম্পদ এবং একই সঙ্গে দায়ে পরিণত হয় (সামরিক বাহিনী লীগের ওপর বিশ্বাস রাখতে নারাজ ছিল, কারণ তারা ভয় পেত এই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সামরিক বাজেট হ্রাস করাসহ যেকোনো আইন প্রণয়নের জন্য ব্যবহার করা হবে)। ভুট্টো চালাকি করে পশ্চিম পাকিস্তানে পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) অর্জিত ক্ষুদ্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে শেখ মুজিব এবং লীগের সঙ্গে সমকক্ষ হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। পাঁচ বছর আগে ভুট্টো আইয়ুব শাসনের আসন্ন পতন আঁচ করতে পেরেছিল। ফলে সে ১৯৬৬ সালে দ্রুত সামরিক মন্ত্রিসভা ত্যাগ করে বিদ্রোহী পিপিপি পার্টি গঠন করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ভিন্নমতাবলম্বী মনোভাবকে কবজা করে। ভুট্টোর জমিদারি পরিবার এবং সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক বিবেচনা করলে তার এই নতুন রাজনৈতিক পোশাক অদ্ভুত মনে হবে। একইভাবে ১৯৭১ সালে সামগ্রিক অবস্থা যে বেশ ভঙ্গুর, ভুট্টো তা দ্রুত বুঝতে পেরেছিল। পাকিস্তানের ভেতর তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল অল্প এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে তার দলের অনেক সদস্যই অন্য দলে গিয়ে ভিড়ত। ফলে মুজিব সরকারের বিরোধী দল হিসেবে সংসদে আসন গ্রহণ করলে পিপিপি অবশ্যই চুপসে যেত। ভুট্টো আরও বুঝতে পেরেছিল যে, একটি ঐক্যবদ্ধ পশ্চিম পাকিস্তানি অবস্থানের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেও অনেকেই হয়তো শিগগিরই 'পশ্চিম পাকিস্তান' জোট ত্যাগ করত—সামরিক বাহিনীর ওপর ভুট্টোর নিয়ন্ত্রণ স্পষ্ট হওয়ার পর, মার্চের শেষ দিকে কয়েকটি দল এ রকমই করেছিল। ২৮ ফেব্রুয়ারির এক বক্তব্যে[৭৮] ভুট্টো লীগের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের সাবধান করে দেয় যে 'পা ভেঙে ফেলব' এবং 'তোমরা বিশ্বাসঘাতক হবে'।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, 'নিরপেক্ষ' আলোচনার সময় সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ভুট্টোর বিশেষ যোগাযোগ ছিল। সিসন ও রোজ লারকানাতে ভুট্টোর পারিবারিক জমিদারি বাড়িতে ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার ব্যক্তিগত আলোচনার কথা বর্ণনা করেছে। এই আলোচনায় ভুট্টো মুজিবকে 'চালাক বেজন্মা' ডাকে এবং আরও বলে, মুজিবকে 'সত্যিই বিশ্বাস করা যায় না', কারণ সে জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে 'জোর করে' সংবিধান পাস করাতে চাইছে। পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক প্রকৃতি সম্পর্কে সেনাবাহিনীর বিশ্বাসকেও ভুট্টো কাজে লাগিয়ে প্রশ্ন করে, শেখ মুজিব 'সত্যিকার পাকিস্তানি' কি না।[৭৯] ভুট্টোর প্রভাবে ইয়াহিয়া পরে বলে যে 'এই "বেজন্মাকে" শিক্ষা দিতে হবে' এবং তার 'আনুগত্য পরীক্ষার প্রয়োজন'।[৮০] সেনাবাহিনীর ধারণা ছিল, আওয়ামী লীগের সঙ্গে দিল্লির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ এবং

কাশ্মীর বিষয়ে তাদের অবস্থানও বেশ নমনীয়। বিভিন্ন ধরনের ভয়কে কাজে লাগিয়ে ভুট্টো আওয়ামী লীগ সম্পর্কে সেনাবাহিনীর বদ্ধমূল ধারণাকে আরও উত্তেজিত করে।

আওয়ামী লীগের একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, ফলে কোনো ধরনের সমঝোতা ছাড়াই তাদের ক্ষমতা গ্রহণের আইনি অধিকার ছিল। তাদের মনস্তত্ত্ব সম্ভবত ১৯৭১ সালের ইতিহাস সম্পর্কে বেনজির ভুট্টোর ভুল বর্ণনা প্রসঙ্গে সালমান রুশদির মন্তব্যের সদৃশ ছিল: 'বেনজিরকে কোনো কিছু ব্যাখ্যা করার জন্য খুব সহজ শব্দ ব্যবহার করা দরকার। শোন মা, লোকটি জিতেছিল, কিন্তু তোমার বাবাই গোঁয়ার্তুমি করছিল...।'[৮১] তবে আইনসম্মত হওয়াই রাজনীতির শেষ কথা নয়। শেখ মুজিব সেনাবাহিনীকে আশ্বস্ত এবং ভুট্টোকে একঘরে করতে পারেননি। সরকারি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার অনুরোধ ফিরিয়ে দেওয়া, আলোচনার সময় নতুন অর্জিত স্বাধীনতাস্পৃহা প্রকাশ করা, আলোচনায় অংশগ্রহণের সময় গাড়িতে কালো পতাকা ব্যবহার করা এবং ভুট্টোর ঢাকা সফরের সময় তাকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করতে দেওয়া—এই সব ঘটনার ফলে ইতিমধ্যে ভীত সেনাবাহিনী আরও ভয় পেয়ে যায়। লীগ সঠিকভাবেই সন্দেহ করেছিল যে ভুট্টো সেনাবাহিনীর 'ছদ্ম ঘোড়া' এবং নতুন মন্ত্রিসভায় ভুট্টোকে জায়গা দিলে কিছুতেই তাকে বিশ্বাস করা যাবে না। তবে তাকে মন্ত্রিসভায় আমন্ত্রণ জানানোর পর আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করার পরে শেষতক মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কার করা একটি পালাক্রমে কৌশল হতে পারত। লীগ এই ধরনের চাতুরী ব্যবহার করতে না পারলেও সমঝোতার সকল পর্যায়ে ভুট্টো এ রকম নানা ম্যাকিয়াভেলীয় কৌশল অনুসরণ করেছিল। ওদিকে আওয়ামী লীগ শুরু থেকেই স্পষ্টভাবে ছয় দফার পূর্ণ বাস্তবায়ন দাবি করে আসছিল।

এই সময় আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ বোধ হয় সামর্থ্যমতো সবকিছুই করেছিল। তবে একই সময়ে ভুট্টোর লোক দেখানো আলোচনা এবং সামরিক বাহিনীর শক্তি জোরদার করার মাধ্যমে সবার কাছে দৃশ্যমান হচ্ছিল যে রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী। তারপরও ২০ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের ইংরেজি ভাষায় মতামত প্রদানের প্রধান মাধ্যম *দ্য ফোরাম*-এ 'অপশনস ফর অ্যা সেইন ম্যান' (সুবিবেচক ব্যক্তির জন্য পথগুলো) শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় ছাপানো হয়। এই সম্পাদকীয়তে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কথা আবারও বলা হয়:

> জনগণ পাকিস্তান কামনা করুক বা না করুক, সঙ্গিন মুহূর্তে এটা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হোক, এটা অবশ্যই চান না... হাতে গোনা কয়েকজন দস্যু, যারা জাতিকে ২৩ বছর ধরে শোষণ করেছে, তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কি ইয়াহিয়া সাড়ে সাত কোটি

> বাঙালির বিরুদ্ধে গণহত্যা শুরু করবে?...এই অবস্থায় জাতির রাজনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য ইয়াহিয়া যা করতে পারে তা হলো: প্রকাশ্যে শক্তি ব্যবহার পরিত্যাগ করা, ১ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত জড়ো করা সেনা ইউনিটগুলোকে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং বাকিদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া।[৮২]

১৯৭১-এর অন্ধ গলি

বসু যদি জেনোসাইডের অভিযোগ থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মুক্ত করার ব্যাপারে এতটা মনোনিবেশ না করত, তবে ১৯৭১ সালের ইতিহাসের জটিলতার রহস্যভেদ সে করতে পারত। তার বইটা হয়তো প্রচলিত বয়ানকে একটা দরকারি ঝাঁকুনি দিতে পারত। তা না করে সে এই সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, বাংলাদেশে একাত্তর-পরবর্তী সহিংস দশকটি ছিল একাত্তর দ্বারা প্ররোচিত সহিংস সংস্কৃতির (১৪) একটি সরাসরি প্রতিক্রিয়া। কিন্তু বিশৃঙ্খল সত্তরের দশকের ভেতরের বাস্তবতা আরও অনেক বেশি জটিল এবং বৈচিত্র্যময়।

১৯৭১ সালের যুদ্ধের অমীমাংসিত বিষয়গুলোর মধ্য একটি হচ্ছে সর্বব্যাপী শক্তি হিসেবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণাটি। ১৯৭১-এর মুক্তিসংগ্রামের রোমান্টিক বর্ণনায় বাঙালি হিন্দুরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও এটাই সত্যি যে আওয়ামী লীগসহ রাজনৈতিকভাবে অন্য প্রধান দলগুলোকে বাঙালি মুসলমানরাই নিয়ন্ত্রণ করত। ধীরগতিতে হলেও ধারাবাহিকভাবে দেশে হিন্দু জনসংখ্যার হ্রাস এই বিষয়টি তুলে ধরছে। এই ধারা আরও উসকে দিয়েছে একাত্তর-পরবর্তী 'অর্পিত সম্পত্তি আইন', যা ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় প্রণীত সাম্প্রদায়িক 'শত্রু সম্পত্তি আইন'-এর উত্তরসূরি। একের পর এক সরকার, এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা এই আইন ব্যবহার করে আদালতের নির্দেশ, ঘুষ এবং জোরপূর্বক হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করেছে।[৮৩] যদিও সম্প্রতি এই আইন বাতিল করা হয়েছে, তবে ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিকভাবে হিন্দু জনগোষ্ঠী ব্যাপকভাবে পিছিয়ে পড়েছে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে নিহিত আরেকটি বিষবৃক্ষ হচ্ছে এর কর্তৃত্ব মনোভাব, যেখানে অবাঙালিদের কোনো স্থান নেই, তা সে বিহারি, সমতলের আদিবাসী বা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম (পাহাড়ি) যে-ই হোক না কেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যখন সংবিধান প্রণয়ন শুরু হয়, তখনই এই সমস্যা সামনে চলে আসে। সংসদে দাঁড়িয়ে নতুন সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেছিল সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র লারমা। সংবিধানে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে শুধু বাঙালিদের সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল এবং লারমা এর প্রতিবাদ করে। লারমা ঘোষণা করে, 'আপনি আপনার জাতীয় পরিচয় অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন না। আমি একজন চাকমা, বাঙালি নই। আমি বাংলাদেশের একজন

নাগরিক, বাংলাদেশি। আপনারাও বাংলাদেশি কিন্তু আপনার জাতীয় পরিচয় হচ্ছে আপনি বাঙালি... পাহাড়ি মানুষরা কখনো বাঙালি হতে পারবে না।'[৮৪] পার্বত্য চট্টগ্রামের দুঃখজনক ইতিহাসের সঙ্গে ১৯৭১ সালের ঘটনাগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে: স্বায়ত্তশাসনের জন্য ২০ বছর স্থায়ী একটি গেরিলাযুদ্ধ, বাঙালি সেটেলারদের দ্বারা ধীরগতির জাতিগত উৎখাত এবং পরিশেষে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তির পর দুই দশকের ব্যর্থতা। একজন পাহাড়ির চোখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বাঙালি সেটেলারদের দমনমূলক শক্তিপ্রয়োগ এবং ১৯৭১-এর পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং সশস্ত্র বিহারিদের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হবে।

১৯৭১-এর যুদ্ধ থেকে জন্ম নেওয়া আরেকটি অমীমাংসিত বিষয় হচ্ছে নেতৃত্বের স্থিতিশীলতা। রাজনীতিবিদ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর অনন্যসাধারণ প্রতিভার কারণেই আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তুমুল বিজয় অর্জন করে। শেখ মুজিব জনসাধারণের মনকাড়া বক্তৃতা দিতে পারতেন, বিশেষ করে গ্রামে। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, আন্দোলনে চিড় ধরা শুরু করে। সবার প্রথমে খন্দকার মোশতাক আমেরিকানদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে (এই মোশতাকই ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর মসৃণভাবে বেসামরিক নেতৃত্বে আরোহণ করে)। চরম বামপন্থীরা লীগের যুদ্ধকালীন নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, যদিও ১৯৭১ সালের যুদ্ধকে কোনো কোনো বাম বিশ্লেষক 'দুটি বুর্জোয়া শক্তির মধ্যে লড়াই হিসেবে' চিহ্নিত করে। যুদ্ধের সময় ভাসানীর জনবিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় নেতৃত্ব তাঁকে কড়া নজরদারিতে রাখে এবং একপর্যায়ে তাঁকে আধা-গৃহবন্দী করা হয়।

এতসব স্ববিরোধী উপধারার পথ ধরে ১৯৭১ সালের পর খুব দ্রুত বাম দলগুলো লীগের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। নতুন দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনে লীগের ছাত্রসংগঠন কমিউনিস্ট-সমর্থিত ছাত্র ইউনিয়নের কাছে হেরে যায়। জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) কাছ থেকে জোরালো চ্যালেঞ্জ আসে। যেসব মানুষ আরও শক্ত বাম বিকল্পের জন্য আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেছিল, এই জোটে তারাও ঢোকে। যখন জেএসডিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছিল, তখন ইতিমধ্যে শক্তি অর্জন করতে থাকে মাওবাদীরা (ইন্দিরা গান্ধী ভয় পেত যে, এরা পশ্চিম বাংলার নকশালবাদীদের সঙ্গে আন্তসীমান্ত জোট গড়ে তুলতে পারে)। বিভিন্ন গোত্র গোপনে সর্বহারা পার্টি নামে সংঘবদ্ধ হয়। তাদের নাশকতা, নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে গুপ্তহত্যা, বোমা ফাটানো এবং ১৯৭৪ সালে সফল জাতীয় হরতাল (এটি ইয়াহিয়া সরকারের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর জাতীয় হরতালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়) পালনের ফলে সরকার খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। পুলিশি হেফাজতে সর্বহারা পার্টির

নেতার মৃত্যু সরকারকে দুর্বল করে দেয়। ওদিকে চতুর নিন্দুকদের চাপে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিশ্বস্ত তাজউদ্দীনের দূরত্ব তৈরি হয়। শেষমেশ ১৯৭৫ সালে নিজের জীবন দিয়ে তাজউদ্দীন বঙ্গবন্ধুর প্রতি আনুগত্য প্রমাণ করে। কিন্তু তখন বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে।

১৯৭১ সাল থেকে আরেকটি অমীমাংসিত বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যকার এবং সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রের মধ্যে টানাপোড়েন। পাকিস্তান থেকে ফেরত আসা অফিসার (যারা পাকিস্তানে জেলে বন্দী ছিল) এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া অফিসারদের মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে বামপন্থী অংশও ছিল; একই সঙ্গে ভারতবিরোধী, ইসলামপন্থী এবং অন্যান্য পরস্পর সম্পর্কিত এবং বিরোধী ধারার একটি সংমিশ্রণও ছিল। অনানুষ্ঠানিক গেরিলাদের একটি গোষ্ঠীও ছিল, যাদের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার কথা ছিল। এদের মধ্যে অনেককে কখনোই সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, আবার কেউ কেউ স্বাধীনভাবে কাজ করা শুরু করেছিল। ১৬ ডিসেম্বরের পর যেহেতু আন্তর্জাতিক সংবাদকর্মীদের দেশে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল, তাই অভিযুক্ত পাকিস্তানি দালালদের প্রকাশ্যে হত্যা করার ঘটনাটি ছিল ১৯৭১-এর সবচেয়ে বেশি স্থিরচিত্র ধারণ করা মুহূর্ত।[৮৫] পরিহাসের বিষয়, এই ছবির ওপর ভিত্তি করেই বসু বাঙালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনে।

যেসব অফিসার একসময় শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু ডাকত, তাদের মধ্যেও অসন্তোষ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যে মেজর জিয়া চট্টগ্রাম বেতার দখল করে 'মহান জাতীয় নেতা' শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে ১৯৭৫ সালের বিরোধপূর্ণ অভ্যুত্থান এবং পাল্টা-অভ্যুত্থান শেষে তিনিই একপর্যায়ে ক্ষমতায় চলে আসেন। শেখ মুজিব নিজের আধা সামরিক বাহিনী—রক্ষীবাহিনী ও লালবাহিনী—গঠন করার ফলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব আরও ঘনীভূত হয়। চূড়ান্তভাবে সেনাবাহিনী নিজের খুনে-যুক্তি অনুসারে প্রত্যুত্তর দিয়েছিল। ১৯৪৮ সালের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী যেভাবে গণতন্ত্রকে ব্যাহত করেছিল, স্বাধীনতার চার বছরের মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একই পথে হাঁটল। ১৯৭১ সালে সামরিক আদেশের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বিদ্রোহ করার ফলে বাঙালি অফিসাররা ইতিমধ্যে একটি মানসিক সীমা অতিক্রম করেছিল—হুকুম অমান্য করার রেওয়াজ এখান থেকেই শুরু। শেক্সপিয়রীয় ট্র্যাজেডি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যখন, ১৫ আগস্টের সকালে, শেখ মুজিব তাঁকে আক্রমণ করতে আসা সৈনিকদের সঙ্গে দেখা করতে স্বেচ্ছায় সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসেছিলেন। তিনি হয়তো ভাবছিলেন, ১৯৭১ সালে তিনি এর চেয়েও ভয়ংকর পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন এবং নতুন জাতির নেতা হিসেবে কারাগার থেকে ফিরে

এসেছিলেন। এরা তো তাঁর নিজের সন্তান, এরা তাঁর ক্ষতি করতে পারে না।

গডোর অপেক্ষায়

ষাটের দশকে আমার বাবা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন মেডিকেল সার্জন ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে সেনা সদর দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। তিনি নির্বাচনে লীগকে নির্ভয়ে ভোট দিয়েছিলেন এবং কাঙ্ক্ষিত ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য রেডিওর পাশে অপেক্ষা করছিলেন। অপ্রত্যাশিত যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালি সেনা অফিসারদের পৃথক করে ফেলা হয় এবং সংবেদনশীল দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয়। একপর্যায়ে তাঁদের জিজ্ঞেস করা হয় তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে যেতে চান কি না। যাঁরা হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রিজন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে আমি (তিন বছর বয়সে) এবং আমার মা-বাবা বান্নু প্রিজন ক্যাম্পে পৌঁছাই। এরপর আমাদের মন্ডি বাহাউদ্দিন এবং সবশেষে গুজরানওয়ালে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের নিকটবর্তী ক্যাম্পে আমার এক চাচা ও এক ফুফা ছিলেন, তাঁরা সেনাবাহিনীর প্রকৌশল শাখায় কাজ করতেন। আমি আমার মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এটা ভয়ংকর সময় ছিল কি না। তিনি উত্তর দিয়েছেন, 'আমরা প্রতিটি দিন ভয়ে ছিলাম যে, তারা আমাদের মেরে ফেলতে পারে। ভবিষ্যতে কী হবে, এটা কেউ জানত না।'[৮৬]

১৯৭৩ সালে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ে পাকিস্তান সরকার আমাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠায়। রেডক্রসের কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে ফোক্কার ফ্রেন্ডশিপ বিমান লাহোর বিমানবন্দরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। যখন আমরা বিমানে উঠছিলাম, আমার বাবা আমাদের বিছানাপত্র অন্য একটি বাঙালি পরিবারকে দিয়ে দিয়েছিলেন, যারা তখনো আটকে ছিল। সেই গ্রহীতা ছিলেন এ জি মাহমুদ। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান হয়েছিলেন। চার বছর বয়সে বেশি কিছু মনে থাকার কথা নয়। তবে আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, আমার বাবা তাঁর সাদা ভক্সওয়াগনটি বিপজ্জনক গতিতে বিমানবন্দরের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার মায়ের বমি পাচ্ছিল, তবে বাবা গাড়ি থামানোর সাহস পাচ্ছিলেন না। ফলে আমার মা ক্রমাগত গাড়ির জানালা দিয়ে বমি করছিলেন। এভাবেই পাকিস্তানকে শরীর থেকে নির্গত করতে করতে আমরা ঘরে ফিরি।

বাংলাদেশে সেনাবাহিনীতে তখন ইতিমধ্যে সবাইকেই বিভিন্ন পদে পদায়ন করা হয়ে গেছে। তারা আসলে পাকিস্তান থেকে আমাদের ফেরার জন্য অপেক্ষা করেনি। হঠাৎ করেই অনেক বেশি লেফটেন্যান্ট, ক্যাপ্টেন ও মেজর তৈরি হয়ে গেল। পাকিস্তানে আটকে পড়ার কারণে সিনিয়ররা পিছিয়ে গেল, জুনিয়রদের

স্যালুট দেওয়ার অপমান হজম করতে হলো। ১৯৭৪ সালের মধ্যে অফিসারদের ভেতরে যখন এই টেনশনগুলো ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন অনেক সেনা কর্মকর্তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শেখ মুজিবকে হত্যার ছয় মাস আগে আরও অনেকের মতো আমার বাবাকে ডাক্তার হিসেবে লিবিয়ায় পাঠানো হয়। সেখানে আমরা প্রথমে বঙ্গবন্ধু খুনের খবর পাই এবং পরবর্তী সময়ে আমার দাদার স্বাভাবিক মৃত্যুর খবরও পাই। মরুভূমিতে সেই নির্বাসনে একটি ছোট মিলাদের আয়োজন করা হয়েছিল। এই মিলাদ আমার দাদা, নাকি শেখ মুজিবের উদ্দেশে আয়োজন করা হয়েছিল, তা আমার মনে নেই। তবে মিলাদটি দুজনের জন্যই আয়োজন করা হয়েছিল ভাবতে আমি পছন্দ করি।

পরবর্তী সময়ে পাল্টা অভ্যুত্থানের ফলে শেখ মুজিবের কিছু হত্যাকারী পালিয়ে লিবিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এতে বাঙালি কমিউনিটি বিরক্ত হয়েছিল (আন্তর্জাতিক অপরাধীদের আশ্রয়দাতা হিসেবে ত্রিপলি সরকারের তখনই পরিচিতি ছিল)। শেষতক আমরা বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলাম এবং তখন একজন সামরিক কর্মকর্তা রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তিনি গাঢ় সানগ্লাস পরতেন, নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন ছাড়ার কথা বলেছিলেন এবং জাতিকে খাল খনন করতে উৎসাহিত করার জন্য সাদা শার্ট পরে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ভারতের সঙ্গে সামরিক বিবাদের পথ বেছে নেন। ১৯৭১ সালের 'বিশেষ সম্পর্ক' খুব দ্রুত উবে যায়।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর রক্তাক্ত সিপাহি বিদ্রোহের সময় আমার এক ফুফা বিদ্রোহীদের থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন, কারণ তাঁর পরিচারক (ব্যাটম্যান) তাঁকে পালিয়ে যেতে সাবধান করেছিল—এই বিদ্রোহের ফলে এই ঘৃণ্য 'ব্যাটম্যান' প্রথাটিই বিলুপ্ত হয়ে গেল। শেষতক আমাদের পরিবারের তিন সদস্যই সিনিয়র সেনা কর্মকর্তা হয়ে অবসর গ্রহণ করেছিলেন—পতাকা, ভাষা, সংস্কৃতি এবং বৈশ্বিক অবস্থানের বাইরে ক্ষুদ্র পর্যায়ে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। ব্যক্তিগত জীবনটাই রাজনৈতিক জীবন। প্রবীণ আত্মীয়দেরও একই আবেগ কাজ করে, যাঁরা সাতচল্লিশের দেশভাগের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। এক ফুফা ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক। ১৯৪৭ সালের এক সকালে ঘুম থেকে জেগে তিনি দেখেন অনেক হিন্দু শিক্ষক সীমান্তের ওপারে চলে গিয়েছেন, ফলে তখন তিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হলেন। ব্যক্তিজীবনের এইসব ক্ষুদ্র উন্নয়নকে প্রায়ই নতুন সীমান্ত তৈরির যুক্তি হিসেবে দেখানো হয়। তবে বাম ইতিহাসবিদেরা বলেন, প্রকৃতপক্ষে সাবলটার্নরা একই অন্ধকারে থাকে; একমাত্র বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং এলিটরাই ১৯৭১ থেকে লাভবান হয়েছে। ২২টি পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ী পরিবারের স্থান দখন করেছিল ২২টি বাঙালি পরিবার এবং এখন সম্ভবত তা ৫ হাজার পরিবারে রূপ নিয়েছে।

যখন আমি পারিবারিক ইতিহাস ঘেঁটে দেখি, কোনো কিছুই মীমাংসিত মনে হয় না। কোনো সরল নায়ক বা খলনায়ক নেই, মানুষ শুধু অনেকগুলো কঠিন অপশন থেকে দৈনন্দিন জীবন বেছে নিয়েছিল। যে ভাই-বোনেরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা অল্পের জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। এক চাচা মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলেও তাঁর অন্য প্রকৌশলী সহকর্মীরা পাকিস্তানি ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রাণ দিয়েছিলেন। একই পরিবারের আরেক আত্মীয় যুদ্ধের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি চালিয়ে গিয়েছিলেন, ফলে ১৯৭১-পরবর্তী সময়ে তিনি দালাল নিধনযজ্ঞের টার্গেটে পরিণত হন। এই ব্যাপক ভ্রাতৃঘাতী সমাধানকে নিন্দা করে এনায়েতউল্লাহ খান তাঁর বিখ্যাত সম্পাদকীয় লিখতে বাধ্য হন: 'সাড়ে ছয় কোটি দালাল'।[৮৭]

সম্ভবত আমার নানা সৈয়দ মুর্তাজা আলী ইতিহাসের ভূমিকম্প দেখেছেন সবচেয়ে বেশি। তিনি একজন ইসলামি ইতিহাসবিদ ছিলেন এবং বরেণ্য বাঙালি সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর বড় ভাই ছিলেন। ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে তুলে ধরে যাঁরা প্রথমবারের মতো প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মুজতবা অন্যতম।[৮৮] মুজতবা পশ্চিম বাংলায় আধা-নির্বাসনে থাকার কারণে পাকিস্তানি সরকার তাঁকে কোনো শাস্তি দিতে পারেনি। তাই তাঁর বড় ভাই মুর্তাজা আলীর সরকারি চাকরির গতি অতি শ্লথ করে দিয়েছিল। ১৯৭১ সালে মুর্তাজা কী ভাবছিলেন? ইতিমধ্যে একজন বাঙালি হওয়ার কারণে তিনি অখণ্ড পাকিস্তানে বেশ উচ্চ মূল্য দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিই ১৯৪৭ সালে এই একই পাকিস্তান বেছে নিয়েছিলেন। গোটা পরিবারকে তিনি আসাম থেকে নিয়ে এসেছিলেন, যেখানে আমার মা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি শেখ মুজিবকে ভোট দিয়েছিলেন, সবাই তাঁকে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর যৌবনে যে পাকিস্তান স্বপ্ন ছিল, তা ভাঙনের বিষয়ে তিনি কী ভাবছিলেন?

প্রতিটি বাংলাদেশি পরিবার তাদের নিজেদের মধ্যে এ রকম বহু দ্বন্দ্ব নিয়ে ঘোরে। প্রেরণা, অনুচিন্তা, দ্বিধা এবং সাহসিকতার দ্বন্দ্ব। এত বছর পরে উচ্ছ্বসিত মিথ বা নীরব আত্ম-অনুসন্ধান—কোন পথ তারা বেছে নেবে? যুদ্ধের সময় মানুষের কর্মকাণ্ডে সব সময় মনোমুগ্ধকর বীরত্ব এবং স্নায়ুবৈকল্য মেশানো থাকে। এটা মানুষ হওয়ার একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য—স্থিরতার অভাব।

বাংলাদেশ এখনো ১৯৭১-এর সেই মানবিক ইতিহাসের জন্য অপেক্ষা করছে।

টীকা এবং তথ্যসূত্র

১. Nayanika Mookherjee, *The Spectral Wound: Sexual Violence, Public Memories and the Bangladesh War of 1971* (Duke University Press), 2015.

২. Yasmin Saikia, *Women, War, and the Making of Bangladesh: Remembering 1971* (Duke University Press), 2011.

৩. Sarmila Bose, *Dead Reckoning: Memories of the 1971 Bangladesh War* (Hurst and Company UK), 2011. সকল পৃষ্ঠার তথ্যসূত্র যুক্তরাজ্য প্রথম সংস্করণ থেকে নেওয়া এবং পৃষ্ঠার নম্বর প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির পাশে বন্ধনীতে দেওয়া হয়েছে।

৪. আইন ও সালিশ কেন্দ্রের কথ্য ইতিহাস প্রকল্প ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়। নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ অন্যান্য কথ্য ইতিহাস প্রকাশ করেছে।

৫. Amitava Kumar, *Husband of a Fanatic* (New York: New Press), 2005, 21.

৬. Professor Golam Azam vs Bangladesh, 45 Dhaka Law Report, High Court Division, p. 433 and Bangladesh vs Professor Golam Azam, 46 Dhaka Law Report, Appellate Division, p. 192.

৭. ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি।

৮. ভৌগোলিকভাবে এই শব্দটি সঠিক নয়, কারণ উর্দুভাষী সব অভিবাসী বিহার থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আসেনি। তবে বসুর বইয়ের সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আমি উদ্ধৃতিচিহ্ন ছাড়াই এই শব্দটি ব্যবহার করেছি।

৯. লেখকের নেওয়া সাক্ষাৎকার, ১৯৯৪।

১০. এই অভিজ্ঞতা পাঁচ দফায় প্রকাশ করা হয়েছে: নাঈম মোহায়মেন, 'পাকিস্তান কি আবার ভেঙ্গে যাচ্ছে?', *ভোরের কাগজ*, ১৯৯৪।

১১. লেখকের নেওয়া সাক্ষাৎকার, ১৯৯৪।

১২. Afsan Chowdhury, 'Is Reconciliation with Pakistan a Realistic Goal?', BdNews24.com, 26 March 2011.

১৩. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (কথা), অংশুমান রায় (সংগীত, কণ্ঠ)

১৪. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (কথা), শ্যামল মিত্র (সংগীত, কণ্ঠ)

১৫. শ্যামল মিত্র (কণ্ঠ)

১৬. উদয়ন চট্টোপাধ্যায়ের অনুস্মরণ, লেখকের নেওয়া সাক্ষাৎকার, জুলাই ২০১১।

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. Sarmila Bose, 'The Courageous Pak Army Stand on the Eastern Front', *Daily Times*, 24 November 2003.

১৯. Sarmila Bose, 'Analysis of Civil War in East Pakistan in 1971', *Economic and Political Weekly*, 8 October 2005; Sarmila Bose, 'Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War', *Economic and Political Weekly*, 22 September 2007.

২০. Sarmila Bose quoted in Khalid Hasan, 'Army Not Involved in 1971 Rapes', *Daily Times*, 30 June 2005.

২১. Sarmila Bose and William B Milam, 'The Right Stuff: F-16s to Pakistan is Wise Decision', *Christian Science Monitor*, 11 April 2005.

২২. Ahmar Mustikhan, 'Joy Bangla from a Baloch Heart', Baltimore Examiner, 16 December 2010; theasians.co.uk, 'Pakistani and Indians on Bangladesh's Honour List', 16 December 2010.

২৩. Colonel Nadir Ali, 'A Khaki Dissident on 1971', Viewpoint; 'Liberation War-Historicising a Personal Narrative', talk given at BRAC University, Dhaka, March 2011.

২৪. Faiz Ahmed Faiz, *The Rebel's Silhouette*, translated by Agha Shahid Ali, Gibbs-Smith, 1991.

২৫. খান এবং হোসেন পাকিস্তানি নারীবাদীদের জোটের মধ্যে ছিল। তারা কনফারেন্স এবং কর্মশালা আয়োজন করেছিল, যেখানে সেনাবাহিনীর দ্বারা বাঙালি নারীদের ধর্ষণের বিষয়টি আলোচিত হয়, এবং সেই সময়ে পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সেনা অভিযানকে সমর্থনের বিষয়টি সমালোচনা করা হয়।

২৬. লেখকের নেওয়া সাক্ষাৎকার, ১৫ আগস্ট ২০১১।

২৭. তানভীর মোকাম্মেল, *স্বপ্নভূমি*, ২০০৭, ৯০ মিনিট।

২৮. কাওসার চৌধুরী, *সেই রাতের কথা বলতে এসেছি*, ২০০১, ৪৩ মিনিট।

২৯. লেখকের নেওয়া সাক্ষাৎকার, জুলাই ২০১১।

৩০. লেখকের নেওয়া সাক্ষাৎকার, আগস্ট ২০১১।

৩১. আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১*, খণ্ড ১-৪, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭।

৩২. হামুদুর রহমান কমিশন, সম্পূরক প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা. ৬৩।

৩৩. লেখকের নেওয়া সাক্ষাৎকার, জুলাই ২০১১।

৩৪. লেখকের নেওয়া সাক্ষাৎকার, জুলাই ২০১১।

৩৫. শামসুল হক ফাউন্ডেশন, ২০০৩।

৩৬. Empowerment through Law of the Common People (ELCOP), 2003. আশ্চর্যজনকভাবে বসু এই বইটি আমলে নেয়নি, যদিও তানভীর মোকাম্মেলের চলচ্চিত্রের ওয়েবসাইটে উৎস হিসেবে এই বইয়ের উল্লেখ আছে। ওদিকে মোকাম্মেলের নির্দেশনা নিয়েছে বলে বসু দাবি করেছে।

৩৭. Angier Biddle Duke, 'Report of the IRC Emergency Mission to India for Pakistan Refugees', and subsequent reports by Aaron and Margery Levenstein.

৩৮. E.g., US Senate, *Subcommittee to Investigate Problems Connected with Refugees and Escapees*, 2 February 1972; Senator Edward Kennedy, Crisis in South Asia, 1 November 1971.

৩৯. E.g., Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, Crisis in East Pakistan, 11 and 25 May 1971.

৪০. International Commission of Jurists, *The Events in East Pakistan*, 1971.

৪১. Nayanika Mookherjee, ''Remembering to Forget': Public Secrecy and Memory of Sexual Violence in Bangladesh', *Journal of Royal Anthropological Institute* (JRAI), 12 (2), June 2006: 433-50. The Spectral Wound: Sexul violence, Public Memories, and the Bangladesh War of 1971 (Duke University Press), 2015.

৪২. Nayanika Mookherjee, 'This Account of the Bangladesh War Should Not Be Seen as Unbiased', *The Guardian*, 8 June 2011.

৪৩. Srinath Raghavan, 'A Dhaka Debacle', *Indian Express*, 20 July 2011.

৪৪. Richard Sisson and Leo Rose, *War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh* (University of California Press), 1990, p. 296.

৪৫. Bose, ibid, 60, quoting from FRUS, Vol XI, 42.

৪৬. Urvashi Butalia, 'She Does Not Know Best', *Tehelka*, Vol 8, Issue 32, 13 August 2011.

৪৭. Kazi Khaleed Ashraf, 'Shoromila's War or the Battle of Shame', *Unheard Voices*, 3 July 2011.

৪৮. Tariq Ali, *Can Pakistan Survive? The Death of a State* (Penguin Books), 1983, p.120.

৪৯. Mort Rosenblum, 'Pakistan War Defied Belief', AP, reprinted in several newspapers, including *Star News*, 12 May 1971.

৫০. আফসান চৌধুরী, লেখকের নেওয়া সাক্ষাৎকার, ১০ আগস্ট ২০১১।

৫১. ১০ জুন ১৯৯২ তারিখে soc.culture.bangladesh-এ প্রথম প্রকাশিত। (archived at http://groups.google.com/group/soc.culture.pakistan/msg/a9a69f46a0cafd13). বর্তমানে পাওয়া যাবে, http://www.virtualbangladesh.com/the-basics/history-of-bangladesh/independence/bangladesh-genocide/

৫২. Afsan Chowdhury, 'Meherjaan Controversy: It's Not about the Film, but about Us and Our History', BdNews24.com, 6 February 2011.

৫৩. https://en.wikipedia.org/wiki/international_crimes_Tribunal_(Bangladesh).

৫৪. *The Economist*, 'Guilty at Birth?', 8 December 2007.

৫৫. Saadia Toor, *State of Islam: Culture and Cold War Politics in Pakistan* (Pluto Press), 2011.

৫৬. প্রাগুক্ত, টীকা ১৭, পৃ. ২০৬.

৫৭. লেখকের নেওয়া সাক্ষাৎকার, ২৭ জুলাই ২০১১।

৫৮. Tariq Ali, ibid, p. 91.
৫৯. Anthony Mascarenhas, *The Rape of Bangladesh* (Vikas Publications), 1971; p. 18.
৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৬২. Keith Callard, Pakistan, p. 182.
৬৩. Saadia Toor, ibid, p. 29.
৬৪. Report of East Bengal Language Committee (EBLC), 1949: 2.
৬৫. *Dawn*, 23 February 1952.
৬৬. Debate over the Restriction and Detention Bill, 17 November 1952; cited in Toor, footnote 27. p. 207.
৬৭. *Pakistan Times*, 29 February 1952.
৬৮. Toor, ibid, p. 44.
৬৯. Toor, ibid, p. 41.
৭০. লেখকের নেওয়া সাক্ষাৎকার, ১৫ আগস্ট ২০১১।
৭১. Rehman Sobhan, 'How to Build Pakistan into a Well-knit Nation', paper presented at a conference convened by the Pakistan Bureau of National Integration in Lahore in September 1961; Rehman Sobhan, 'Economic Basis of Bengali Nationalism', *The History of Bangladesh: Economic History*, *Vol 2*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1992.
৭২. Akhlaqur Rahman, *Partition, Integration, Economic Growth and Interregional Trade*, Karachi, 1963.
৭৩. A. R. Khan, *The Economy of Bangladesh*, London, 1972.
৭৪. Conference of Bengali Economists on the First Five-Year Plan, held in Dhaka in 1956; Report of the Panel of Economists on the Fourth Five-Year Plans, Government of Pakistan (Comments of EP Members).
৭৫. লেখকের নেওয়া সাক্ষাৎকার, ১৪ আগস্ট ২০১১।
৭৬. Shah Ahmed Reza, 'Kagmari Shammelan: Bhashanir Assalamu Alaikum', p. 51.
৭৭. Sisson and Rose, ibid.
৭৮. Sisson and Rose, ibid, p 66.
৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৮১
৮০. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৮
৮১. Salman Rushdie, 'Daughter of the East', *Imaginary Homelands* (Penguin) 1992, p. 57.

৮২. Hameeda Hossain, ed., 'Options for a Sane Man', *The Forum*, 20 March 1971.

৮৩. Naeem Mohaiemen, 'Rights of Religious Minorities', Chapter 15 in Ain O Salish Kendra Annual Human Rights Report, 2008, http://askbd.org. Naeem Mohaiemen, 'Our Politics of Dispossession', *Daily Star Forum*, February 2009, http://archive.thedailystar.net/forum/2009/february/our.htm

৮৪. Parliament Debates, Government of Bangladesh, 1972, p. 452.

৮৫. এই ছবিতে দেখা যায়, বন্দীদের কাদের সিদ্দিকী বেয়নেট দিয়ে আঘাত করছেন। বাঙালিদের সহিংসতা প্রমাণ করার জন্য এই ছবি অসংখ্যবার ব্যবহার এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এমনকি ওরিয়ানা ফালাচি এটাকে ৯/১১-এর ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেছে: 'তারা আল্লাহু-আকবর, আল্লাহু-আকবর...বলে গগনবিদারী চিৎকার করেছিল। ২০,০০০ বিশ্বাসীরা (যাদের অনেকে নারী ছিল) আসন ছেড়ে মাঠে নেমে গিয়েছিল। উন্মত্ত জনতা হিসেবে নয়, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এবং গাম্ভীর্যের সঙ্গে। আবারও তারা সারিবদ্ধ হয়েছিল এবং মৃতদেহগুলোর ওপর হেঁটে গিয়েছিল। এই পুরোটা সময় ধরেই তারা আল্লাহু-আকবর, আল্লাহু-আকবর বলে চিৎকার করছিল। নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারের মতোই তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়ের রক্তমাখা কার্পেটে পরিণত হয়েছিল।' (Oriana Fallaci, La Rabbia e l'Orgoglio [The Rage and the Pride], translated from Italian, Rizzolo, 2002). এটা দেখার বিষয় যে, ফালাচি দর্শকদের সংখ্যা এবং আল্লাহু-আকবর ধ্বনির বিষয়ে মনগড়া কথা বলেছে। কারণ, ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই 'আল্লাহু আকবর' কথাটা এখানে আসার কথা না। সম্ভবত ১৯৭৯ সালে ইরানের সংবাদের সঙ্গে সে স্মৃতি গুলিয়ে ফেলেছে।

৮৬. লেখকের নেওয়া সাক্ষাৎকার, ১৯৯৪।

৮৭. Enayetullah Khan, 'Sixty-five million collaborators', *The Weekly Holiday*, 2 February 1972.

৮৮. সৈয়দ মুজতবা আলী, *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা: বাংলা না উর্দু?*, তমুদ্দুন মজলিশ, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।

বই আলোচনা

ক্রোনিজম : পুঁজিবাদের এক কদর্য রূপ

প্রতীক বর্ধন

চায়না'স ক্রোনি ক্যাপিটালিজম: দ্য ডাইনামিকস অব রেজিম ডিকোয়—মিনঝিন পি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৬, আইএসবিএন : ৯৭৮০৬৭৪৭৩৭২৯৭।

১৯৮৯ সালে চীনে গণতন্ত্রের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়, তাতে দেশটির ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিল। দাপ্তরিক নথিপত্র অনুসারে সে বছরের ১৮ মে চীনের ১৩২টি শহরে একযোগে ৬০ লাখ মানুষ প্রতিবাদ বিক্ষোভে অংশ নেয়। তিয়েনআনমেন স্কয়ারের সেই বিক্ষোভ কমিউনিস্ট পার্টি বল প্রয়োগে দমন করে। এরপর দলের ভবিষ্যৎ নেতাদের মধ্যে আনুগত্য পুনঃসৃষ্টিতে সব স্তরের নেতাদের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি লুটপাটের সুযোগ দেওয়া হয়। আর এভাবেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জবাবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় লুটপাটের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়, যার মাধ্যমে শুরু হয় ক্রোনি ক্যাপিটালিজম বা দল বেঁধে লুটপাটের পুঁজিবাদ। *দ্য ইকোনমিস্ট*[১]-এর সংজ্ঞায় ক্রোনি ক্যাপিটালিজম হলো সেই বন্দোবস্ত, যার মাধ্যমে পুঁজিপতিরা রাজনীতিকদের কাছ থেকে মূল্যবান সম্পদ লাভ করে থাকে। আরেকটু বিস্তৃত করে বলা যায়, এটা পুঁজিপতি ও রাজনীতিকদের মধ্যকার বন্দোবস্ত, যার মাধ্যমে পুঁজিপতিরা বৈধ বা অন্য উপায়ে সম্পদ আহরণ করেন এবং রাজনীতিকেরা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখে। অর্থাৎ একদিকে চীনের শনৈঃ শনৈঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে, অন্যদিকে ১৯৯০ সালের পর সেখানে এরূপ ব্যাপক দুর্নীতি শুরু হয়।

ক্যালিফোর্নিয়ার ক্লেয়ারমন্ট ম্যাককেনা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মিনঝিন পি *চায়না'স ক্রোনি ক্যাপিটালিজম* গ্রন্থে চীনের লুটপাটতন্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তবে খুব সংযত ভাষায়। বইটি পড়লে বোঝা

যায়, চীনে দুর্নীতি কোন মাত্রায় পৌঁছেছে। মিনঝিন পি দেখিয়েছেন, রাষ্ট্রীয় সম্পদের ওপর পার্টির নেতাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলেও চীনে কখনোই আনুষ্ঠানিকভাবে বেসরকারীকরণ ঘটেনি। সেখানে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটলেও মালিকানার অধিকারের ব্যাপারটা পরিষ্কার করা হয়নি। ফলে যারা শাসন করে, তারা 'সমাজের সম্পদ আহরণে চূড়ান্ত সুযোগ পেয়েছে'। অর্থাৎ চীনে মালিকানার অধিকার আর নিয়ন্ত্রণের অধিকারের মধ্যে সীমারেখা টানা হয়েছে। আর যেখানে মালিকানার ব্যাপারটা অনিশ্চিত, সেখানে নিয়ন্ত্রণই মুখ্য ব্যাপার—মিনঝিন পি আমাদের বলছেন।

অত্যন্ত কষ্টসাধ্য গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বইটি লিখেছেন মিনঝিন পি। মনগড়া কথা নেই এতে। প্রতিটি কথার পেছনে তিনি বিপুল তথ্যপ্রমাণ হাজির করেন। বইটির বিন্যাস দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। ৩৬৫ পৃষ্ঠা বইটির মূল অংশ শেষ হয়েছে ২৬৮ পৃষ্ঠায়, বাকি ৯০ পৃষ্ঠাজুড়ে আছে পরিশিষ্ট, সংক্ষিপ্ত নামের বিবরণ, টীকা, স্বীকৃতি ও নির্ঘণ্ট। লেখক আমাদের বলছেন, ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের ধারণা এমনিতে অনেক জনপ্রিয় হলেও এর ওপর গবেষণা করতে গেলে বিদ্যায়তনের মানুষদের অন্তত দুটি কঠিন কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। প্রথম চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে এমন একধরনের বিশ্লেষণী কাঠামো তৈরি করা, যার মধ্যে ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের মূল ধারণার নির্যাস থাকবে এবং সেটা এর অভিজ্ঞতাভিত্তিক অনুসন্ধানে প্রয়োগ করা। সে জন্য তিনি 'অভিজাতদের মধ্যকার যোগসাজশ' শীর্ষক এক ধারণার প্রস্তাব দেন, যার আলোকে এই ক্রোনি ক্যাপিটালিজম পাঠ করা হবে বা তিনি যেভাবে সেটা করেছেন। এই ধারণা প্রয়োগের যৌক্তিকতা হলো, ক্ষমতায় যে ধরনের রাজনৈতিক দলই থাকুক না কেন, এই ব্যাপারটা সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, এ-বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত পাওয়া কঠিন, কারণ এর জন্মই হয়েছে ১৯৯০-এর দশকে। আর কোনো দেশের সরকারই সাধারণত এ ব্যাপারে তদন্ত করতে বা মুখ খুলতে চায় না।

এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত খুব বেশি গবেষণা না হলেও যে অল্প কিছু মানুষ এ নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরা এই বিষয়ে একমত যে এই দল বেঁধে দুর্নীতি অধিকতর পরিশীলিত ও ধ্বংসাত্মক, আর সেটা চিহ্নিত করাও কঠিন। মিনঝিন পি বলেন, তত্ত্বগতভাবে এবং বাস্তবে এই ধরনের যোগসাজশমূলক দুর্নীতি ব্যক্তিগত দুর্নীতি থেকে অধিকতর ধ্বংসাত্মক। কারণ, এতে রাষ্ট্রের সাংগঠনিক ও নিয়মতান্ত্রিক রূপটি ধ্বংস হয়ে যায়। একই সঙ্গে তা যেমন চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে যায়, তেমনি এর খেলোয়াড়েরাও বেশি লাভবান হন। আমাদের দেশের পরিভাষায় যাকে সিন্ডিকেট ঘুষ বলা যায়। এই ব্যবস্থায় ঘুষ না দিয়ে কারও উপায় থাকে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি কার্যালয়ের ৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে

৪৫ জন বা ৫০ জনই ঘুষ খেলে তার প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র থাকে না। মানুষেরও তখন ঘুষ না দিয়ে উপায় থাকে না। তবে ওই কার্যালয়ের যদি ১০ জন ঘুষ নিত, তাহলে সমস্যা এত গভীর হতো না।

যাহোক, বইটির ভূমিকায় লেখক চীনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের বক্তৃতা থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা আমাদের চোখ খুলে দেয়: 'বিভিন্ন খাতে ও অঞ্চলে যে দুর্নীতি হচ্ছে, তা পরস্পর-সম্পর্কিত। গোপন সমঝোতার মাধ্যমে দুর্নীতি ক্রমেই বাড়ছে। কর্মী ও নির্বাহী কর্মকর্তারা যোগসাজশ করে ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। ক্ষমতার সঙ্গে ক্ষমতার বিনিময়, ক্ষমতার সঙ্গে টাকা ও ক্ষমতার সঙ্গে যৌনতার বিনিময়—এসব যেন নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে গেছে। কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যকার যোগসাজশ ও ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে অধস্তনদের যোগসাজশ পরস্পর গ্রন্থিত হয়ে গেছে। আর তারা বিভিন্ন কায়দায় ও গোপনে পারস্পরিক সুবিধা বিনিময় করছে।'

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে ব্যাপারটা মিনঝিন পি আমাদের বলেন, তা হলো, এই দল বেঁধে লুটপাটতন্ত্রের ব্যাপার দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপজাত হিসেবে ঘটেনি। বরং দেশটির কমিউনিস্ট পার্টির কৌশলগত সিদ্ধান্তের ফল হিসেবে এটি ঘটেছে। লেখক অত্যন্ত সুচারুভাবে দেখিয়েছেন, কীভাবে দলের প্রতিটি পর্যায়ে দুর্নীতি হচ্ছে। এতে দলের প্রতিটি শাখাই বিপথগামী হচ্ছে এবং সরকারের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব খর্ব হচ্ছে। আর সি চিন পিং যেভাবে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান শুরু করেছেন, তাতে দুর্নীতি তো কমবে না, বরং এতে শাসক অভিজাত শ্রেণির মধ্যে বিভাজন তৈরি হবে এবং দলের পতন ত্বরান্বিত হবে। যদিও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত সেখানে আছে।

'ক্রোনিজম ইন অ্যাকশন: কলিউশন বিটুইন অফিশিয়ালস অ্যান্ড বিজনেসম্যান' শীর্ষক অধ্যায়ে মিনঝিন পি দেখিয়েছেন, একদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অভিজাত ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগসাজশটা একদম পরিষ্কার। এখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকলে তা দ্রুতই বিপুল সম্পদে পরিণত হতে পারে। তবে বেসরকারি খাতে অংশীদার না থাকলে এই যোগসাজশের রূপান্তর ঘটে না। জীবনভর রাজনীতি করতে তো একটা মাশুল দিতে হয়, আর সেটাই তাদের বিনিয়োগ। সে কারণে দলের ভেতরে পুরস্কারস্বরূপ যে পদ দেওয়া হয়, তা প্রত্যাখ্যান করা আকর্ষণীয় ব্যাপার নয়। আবার রাজনৈতিক পদ ছাড়ার ঝুঁকিও আছে। এতে দলীয় নেতাদের রোষানলে পড়ার ভয় থাকে। তারা নিজেরা বেসরকারি খাতে যেতে পারে না বলে আত্মীয়স্বজনদের ওই জায়গায় বসায়। ফলে তারা যেমন দলের বড় পদে থাকতে পারে, তেমনি বিপুল সম্পদও বানাতে পারে। ধরা পড়ার সুযোগও আছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ সম্পদ বানানো সম্ভব,

সেটা ধরা পড়ার ক্ষতির তুলনায় বেশি লাভজনক।

বইটির পরিশিষ্টে দেওয়া তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, দুর্নীতি যত বেশি দিন ধরে চলবে, ততই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পদোন্নতির সম্ভাবনা বাড়ে। দুর্নীতি শুরু করার পর গ্রেপ্তার হতে ওই কর্মকর্তাদের গড়ে আট বছর সময় লেগেছে। মেয়াদের মধ্যে এই শ্রেণির ৫০ জন শীর্ষ দুর্নীতিবাজের মধ্যে ৪২ জন পদোন্নতি পেয়েছে। অর্থাৎ দীর্ঘ মেয়াদে দুর্নীতির কালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পদোন্নতির এই উচ্চ হার (৮৪ শতাংশ) থেকে বোঝা যায়, দুর্নীতি চিহ্নিত হওয়ার হার অনেক কম।

তবে চীনের অর্জনও কম নয়। ১৯৪৯ সালে যে দেশের সিংহভাগ মানুষ আফিম খেয়ে ঘুমাতে যেত, সেই দেশের অর্থনীতি এখন পৃথিবীতে এক নম্বর। এখন তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে টেক্কা দিচ্ছে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের বিকল্প প্রতিষ্ঠান বানানোর চেষ্টা করছে। অন্যদিকে আজ সারা পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমে আসার পেছনে এক চীনের দারিদ্র্য হ্রাস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭৮ সালে দেশটির গ্রামীণ এলাকায় চরম দরিদ্রের সংখ্যা ছিল ২৫ কোটি, যেটা ২০০৫ সালে ২ কোটি ৩৬ লাখে নেমে আসে[২]। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে দৈনিক এক ডলারের নিচে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছে ২৭ কোটি ৪০ লাখ। এর মধ্যে শুধু চীনে কমেছে ১৫ কোটি ১০ লাখ, যা উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষের ৭৫ শতাংশ (খবর ২০০৬)। অক্টোবরে অনুষ্ঠিত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেসের উদ্বোধনী অধিবেশনে সি চিন পিং যে প্রতিবেদন পাঠ করে শোনান, সেখানে উল্লেখ করেছেন, গত পাঁচ বছরে চীনে ছয় কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠে এসেছে। ২০১২ সালে চীনে দারিদ্র্যের হার ছিল ১০ শতাংশ, এখন তা কমে নেমেছে ৪ শতাংশে। দারিদ্র্য বিমোচনের এই তৎপরতা অব্যাহত থাকবে এবং ২০২০ সালের মধ্যে চীনে আর কোনো মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকবে না।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে চীন এক বিস্ময়। ১৯৭৮ সালে দেং জিয়াও পিংয়ের আমলে সংস্কার কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর ২০০২ সাল পর্যন্ত তার গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮ দশমিক ১ শতাংশ[৩]। ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় যে ২০০৫ সালের চীনের প্রকৃত মাথাপিছু জিডিপি ১৯৮০ সালের তুলনায় আট গুণ বেশি হয়ে যায়। এই দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে গ্রামীণ দারিদ্র্যও দ্রুতগতিতে কমে। ফলে অবকাঠামো, সামাজিক সেবা ও দরিদ্রের জীবিকার পরিবেশের যথেষ্ট উন্নতি হয়। কিন্তু একই সময়ে সেখানে বণ্টনের বৈষম্যও অনেকটা বেড়েছে (সারণি-১)। চীনে এখনো সাড়ে পাঁচ কোটির বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে মানবেতর জীবন যাপন করে। তাদের মাথাপিছু দৈনিক ভোগের পরিমাণ এক মার্কিন ডলারের কম। আর হিউরান রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জরিপে বলা হচ্ছে, চীনে সবচেয়ে ধনী তিন

ব্যক্তির প্রত্যেকে তিন হাজার কোটি মার্কিন ডলারের সম্পদের মালিক। চীনে অঞ্চলভেদে উন্নয়নের ফারাকও বিস্তর। যেমন পাহাড়-পর্বতময় গুইঝু প্রদেশের মানুষের গড় বার্ষিক আয় সাংহাই এলাকার মানুষের গড় আয়ের তিন ভাগের এক ভাগ থেকেও কম[৪]। অন্যদিকে তার শহর ও গ্রামীণ আয়ের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। অথচ এই দেশ নিজেকে সমাজতান্ত্রিক দাবি করে, যেখানে সমাজতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধীরে ধীরে সব ধরনের বৈষম্যের অবসান।

সারণি-১
চীনে ব্যয় বণ্টনের গিনি সহগ

স্থান	সাল			
	১৯৭৮	১৯৮৮	১৯৯৭	২০০২
জাতীয়	০.৩০	০.৩৮	০.৩৪	০.৪৫
গ্রামীণ	০.২১	০.৩০	০.৩৪	০.৩৮
শহুরে	০.১৬	০.২৩	০.২৯	০.৩৪

উৎস : Huang et. al. 2009

চীনের এই অভাবনীয় উন্নতির মূল কারণ হচ্ছে বিশ্বায়ন, আমরা সবাই সেটা জানি। সংস্কারের পর তারা ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীর কারখানা হয়ে ওঠে। আর সেটা সম্ভব হয়েছে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিতে ব্যাপক বিনিয়োগের ফলে। মানবসম্পদ বিকাশে তারা যথেষ্ট বিনিয়োগ করেছে, যার ফল তারা এখন পাচ্ছে। উৎপাদন ও বাণিজ্যে তারা যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ—সব ধরনের পণ্যই তারা উৎপাদন করে থাকে। এই প্রক্রিয়া থেকে আমাদের শেখার আছে অনেক কিছু।

বক্ষ্যমাণ বইয়ের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। মিনঝিন পি বইটির 'ইন বেড উইথ দ্য মাফিয়া' অধ্যায়ে বলেছেন, এই যে সংঘবদ্ধ অপরাধ তার যেমন স্থানীয় সরকারের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব আছে, তেমনি সংগঠিত অপরাধী চক্র ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে যে যোগসাজশ—রাষ্ট্রের অখণ্ডতার ওপর তার প্রভাব আরও সুদূরপ্রসারী। দৃশ্যত, এই ধরনের যোগসাজশের কারণে চীনা রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলাজনিত ও প্রশাসনিক সক্ষমতা ধ্বংস হচ্ছে। একদিকে সংগঠিত অপরাধের পরিসর বড় হচ্ছে, অন্যদিকে তারা সব পদস্থ কর্মকর্তাকে ঘুষ দিয়ে কাজ হাসিল করতে ইচ্ছুক। ফলে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোয় দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের চক্র ক্রমেই বড় হচ্ছে। চীনের ক্ষমতাদম্ভী রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় যার অধীনে গোপন পুলিশের কার্যক্রম চলে, তার বড় কর্তারা সংগঠিত অপরাধী চক্রের সঙ্গে

জড়িয়ে যাচ্ছে। অথবা তারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ এসেছে। তবে সংগঠিত অপরাধী চক্রের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যোগসাজশের ফলে স্থানীয় সরকারের এই সূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটেছে, যেটা আবার সম্ভব হয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অবৈধ বেসরকারীকরণের কারণে। আর এতে এই দুই ধরনের যোগসাজশের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় : কর্মকর্তাদের মধ্যকার যোগসাজশ এবং কর্মকর্তা ও সংগঠিত অপরাধী চক্রের মধ্যকার যোগসাজশ। পৃথিবীতে কোনো কিছু তো কেউ এমনি এমনি দেয় না, তার একটা বিনিময়মূল্য থাকে। কর্মকর্তারা ঘুষ খেলে দাতাদের তো বিনিময়ে কিছু দিতে হয়।

উদার গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে চীনের পার্থক্য এই জায়গায় যে সেখানে ক্ষমতার ভারসাম্য নেই। দেশটির সরকারের কাঠামোই এমন, যেখানে দুর্নীতির রাশ টেনে ধরা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে দলটির শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে চারিত্রিক সততা বা সাধুতার অভাব আছে। ভূমি-সম্পদ উন্নয়ন, খনি ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি সবচেয়ে বেশি। দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তারা উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশ করে থাকেন। তাদের অর্থলোলুপতায় প্রতিটি প্রদেশ আক্রান্ত হয়েছে। কিছু অঞ্চল তো মাফিয়া রাজ্যে পরিণত হয়েছে। প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ের পার্টি নেতারা 'পুঁজিবণ্টন, বড় ঠিকা দেওয়া ও ভূমির ব্যবহার নির্ধারণ করার' অধিকার পেয়েছে। আর যায় কোথায়, স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এই স্থানীয় নেতাদের ঘুষ দিয়ে সহজে কাজ বাগিয়ে নেয়। নিয়ন্ত্রণ শিথিল হওয়ায় তারা সেই ক্ষমতা ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য ব্যবহার করতে পারে। শুধু যেসব খাতে ব্যাপক প্রতিযোগিতা আছে বা যেখানে সম্পদের অধিকার চমৎকারভাবে সংজ্ঞায়িত আছে, যেমন ভোক্তা পণ্য ও উচ্চপ্রযুক্তির উৎপাদনশীল খাতে, সেখানে এসব দুর্নীতি নেই।

তবে সি চিন পিং দুর্নীতিকে প্রধান শত্রু জ্ঞান করে শুদ্ধি অভিযান চালাচ্ছেন, যদিও এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত হিসাব-নিকাশও জড়িয়ে আছে। কিন্তু দুর্নীতিবিরোধী অভিযান এখন তাঁদের প্রধান অগ্রাধিকার। ২০১৭ সালের অক্টোবরে দলটির ১৯তম কংগ্রেস চলাকালীন *চায়না ডেইলির* ২০ অক্টোবরের সংখ্যায় প্রথম সম্পাদকীয় ছিল দুর্নীতিবিরোধী অভিযান নিয়ে। এতে বলা হয়েছে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সে নিজেকে কীভাবে পরিচালনা করছে। তারা বলছে, দল পরিচালনার চারটি মৌলিক কৌশলের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কঠোরভাবে দলীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা। দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের কিছু পরিসংখ্যানও তারা প্রকাশ করেছে। *চায়না ডেইলি* সূত্রে জানা যায়, ব্যুরো পর্যায়ের আট হাজার কর্মকর্তা ও গ্রামীণ পর্যায়ের ৬০ হাজার

কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে মন্ত্রী পর্যায়ের ৪৪০ জন কর্মকর্তাকে ইতিমধ্যে অভিযুক্ত করা হয়েছে বা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়ে তদন্ত হচ্ছে। অন্যদিকে যেসব দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন, তাঁদের ধরার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করছে তারা। আবার তারা ইতিমধ্যে ৩ হাজার ৪৫৩ জন পলাতক আসামিকে ফিরিয়েও এনেছে[৫]।

এক নজরে গত পাঁচ বছরে চীনের দুর্নীতি দমনবিষয়ক আরও কিছু তথ্য

- শৃঙ্খলা পরীক্ষা কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক এজেন্সিগুলো ২০ লাখ ৬৭ হাজার শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা তদন্ত করেছে। তারা ১৫ লাখ ৫০ হাজার মামলা দায়ের এবং ১৫ লাখ ৩০ হাজার দলীয় সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। এ ছাড়া তারা ৫৮ হাজার সন্দেহভাজন কর্মকর্তাকে বিচারিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছে।
- ৩ হাজার ৪৫৩ জন পলাতক আসামি চীনে ফিরে এসেছে। ইন্টারপোলের রেড নোটিশের ১০০ জন শীর্ষ পলাতক ব্যক্তির মধ্যে ৪৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
- নগর, শহর ও গ্রামের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের সময় ৯ হাজার ৩০০ জন কর্মকর্তা পর্যবেক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হলে তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়নি।
- পদোন্নতি ও পদাবনতি বিধি অনুসারে গ্রাম ও তার ওপরের পর্যায়ের ২২ হাজার কর্মকর্তার অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে।
- ছয় লাখের বেশি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দলের সাংগঠনিক ও মানবসম্পদ বিভাগ কর্মকর্তাদের সতর্ক ও তিরস্কার করেছে।
- ব্যক্তিগত বিষয়ে যথাযথ প্রতিবেদন পেশ না করায় ১ লাখ ২৫ হাজার কর্মকর্তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগের সঙ্গে সম্পর্কিত পারিবারিক ও সম্পদবিষয়ক প্রসঙ্গ জড়িত (সূত্র: *চায়না ডেইলি*, ২০ অক্টোবর, ২০১৭)।

পৃথিবীতে এখন স্নায়ুযুদ্ধ নেই, আবার মার্কিন সাম্রাজ্যও অস্তগামী। এশিয়া হয়ে উঠছে উন্নয়নের কেন্দ্র, যার নেতৃত্বে আছে চীন ও ভারত। চীন নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় পশ্চিমের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সে যে নতুন ও উন্নত ব্যবস্থার সন্ধান দেবে—এমনটা এখনো মনে হচ্ছে না। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক অধ্যাপক প্রণব বর্ধন এ প্রসঙ্গে মনে করেন, 'চীনা নেতারা বিশ্বাস করে, তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মডেল

পশ্চিমাব্যবস্থার চেয়ে উন্নত। তারা এখন অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার "নতুন যুগের" ধারণা ফেরি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার যতই আকর্ষণ থাকুক না কেন, তার কিছু মৌলিক গলদ আছে। আর তা সহজেই সব জায়গায় অনুসৃত হতে পারবে না।' কারণ হিসেবে তিনি বলেন, এর জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মতো মহিরুহ সংগঠন লাগবে। সঙ্গে লাগবে তার মতো বিশাল ও সমৃদ্ধিশালী বাজার, যে কারণে তারা বিদেশি বিনিয়োগ নিজের মতো করে কাজে লাগাতে পেরেছে। স্বাভাবিকভাবেই সেটা সবার পক্ষে সম্ভব নয়[৬]।

যাহোক, সংক্ষেপে বলা যায়, চীনের দুর্নীতি সম্ভব হয়েছে সম্পত্তির অধিকার নিয়ে অস্পষ্টতা, বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক ভারসাম্যের অভাব যেমন: স্বাধীন বিচার বিভাগ, মুক্ত গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার অভাবের কারণে। এসবের উন্নতি হলেই কেবল দুর্নীতি চিরস্থায়ীভাবে হ্রাস পেতে পারে। কিন্তু চীনে গণতান্ত্রিক ভারসাম্য আসার সম্ভাবনা নিকট ভবিষ্যতে দেখা যাচ্ছে না। ২০১৭ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেসে বর্তমান প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং নিজের ক্ষমতা আরও কুক্ষিগত করেছেন। যারা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারত, তারা এখন আর মাঠেই নেই, তাদের বেশির ভাগের ঠাঁই হয়েছে শ্রীঘরে। দুর্নীতির অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মিনঝিন পি তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন, সির হাতে এখন লাগামহীন ক্ষমতা[৭]। তবে সি চিন পিং ২০৫০ সালের মধ্যে চীনকে মহান আধুনিক সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বিপুল কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন।

মিনঝিন পি ১৯৮০-এর দশকে চীনের আশার দিনগুলোয় সাংহাই শহরে বেড়ে উঠেছেন। কিন্তু এখন তাঁর মধ্যে আশার ছিটেফোঁটা নেই: 'এমনকি বিপ্লবী কায়দায় পুরোনো ব্যবস্থা উৎখাত হলেও উদার গণতন্ত্র আসবে, তা নয়। এই ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের রেশের কারণে...যারা বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থ উপার্জন করেছে, তারা নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করবে, যেখানে ওই গণতন্ত্রের টিকে থাকার আশাও থাকবে খুব ক্ষীণ।' তাঁর ভয়, একদলীয় ব্যবস্থা উৎখাত হলে কী হবে, তা বোঝা যায় রাশিয়া ও ইউক্রেনকে দেখে, যদিও চীনের এই ব্যবস্থা ১৯৮৯ সালে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। আজকের চীন রাষ্ট্র বুঝতে চাইলে এই বই পাঠ অত্যাবশ্যকীয়। তবে এটা আর যা-ই হোক, সমাজতন্ত্র নয়।

তথ্য নির্দেশ

১. The Economist's Books and Arts, "To have and to Hold": Review of *China's Crony Capitalism: The Dynamics of Regime Decay*, <https://www.economist.com/news/books-and-arts/21708644-

how-chinas-elite-has-taken-control-economyand-country-have-and-hold>

২. মোস্তফা কামাল মুজেরী, "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন : বাংলাদেশ এবং চীনের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার একটি তুলনামূলক চিত্র", *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, খণ্ড ৩১, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪২০।

৩. প্রাগুক্ত

৪. মশিউল আলম, "চীনা-সমাজতন্ত্রের-প্রধান-দ্বন্দ্ব", দৈনিক *প্রথম আলো*, ৩০ অক্টোবর ২০১৭ <http://www.prothomalo.com/opinion/article/1354631/>

৫. সম্পাদকীয়, *চায়না ডেইলি*, ২০ অক্টোবর, ২০১৭ <http://www.chinadaily.com.cn/opinion/>

৬. Pranab Bardhan, "China's Solitary Development Model", *Project Syndicate*, 5 December, 2017, <https://www.project-syndicate.org/commentary/china-model-xi-jinping-new-option-to-democracy-by-pranab-bardhan-2017-12>

৭. মিনঝিন পি, "সির হাতে লাগামহীন ক্ষমতা", দৈনিক *প্রথম আলো*, ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ <http://www.prothomalo.com/opinion/article/1398241/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A8->ÞgZv|

লে খ ক প রি চি তি

বদরুল আলম খান

বদরুল আলম খান দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষকতার পর বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনিতে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বাংলাদেশ সমাজ, শ্রেণি, ধর্ম ও বিশ্বায়ন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা: *পুঁজিবাদের সমাজতত্ত্ব* (সম্পাদনা), *সংঘাতময় বাংলাদেশ: অতীত থেকে বর্তমান* ২০১৫ সালে এবং *গণতন্ত্রের বিশ্বরূপ ও বাংলাদেশ* ২০১৭ সালে প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বায়নের ওপর তাঁর আরও একটি বই প্রথমা প্রকাশন থেকে ২০১৮ সালের বাংলা একাডেমি বইমেলায় বের হচ্ছে।

তারিক আলি

পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখক, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র পরিচালক। বিশ্ব ইতিহাস ও রাজনীতির ওপর তিনি দুই ডজনেরও বেশি বই লিখেছেন। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা সাত (এক ডজনেরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে)। তিনি মঞ্চ ও বড় পর্দার জন্য স্ক্রিপ্ট লেখিয়ে হিসেবেও সুপরিচিত। তিনি বিখ্যাত *নিউ লেফট রিভিউ জার্নাল*-এর একজন সম্পাদক।

আন্তোনিও গ্রামসি জুনিয়র

ইতালীয় বামপন্থী নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামসির নাতি। তিনি মস্কোয় জন্মগ্রহণ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে সংগীত ও জীববিজ্ঞানে পড়াশোনা করেছেন। ইতালি ভ্রমণের পরে দাদা সম্পর্কে এবং দাদির পরিবার সম্পর্কে জানতে পারেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা *লা স্তোরিয়া দ্য উনা ফ্যামিগলিয়া রিভোলুজিওনারিয়া* (২০১৪)।

নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা করছেন। একই বিভাগ থেকে তিনি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি ২০১৬ সালে সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন (ইংল্যান্ড) থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচডি) ডিগ্রি লাভ করেন। এর আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রদত্ত ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি থেকে সিকিউরিটি পলিসি স্টাডিজে মাস্টার্স ডিগ্রি

অর্জন করেন। তিনি মূলত আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়াবলি নিয়ে গবেষণা করে থাকেন। তাঁর গবেষণালব্ধ প্রবন্ধসমূহ বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে : *The Round Table : The Commonwealth Journal of International Affairs*, *International Peacekeeping* (Taylor & Francis), *Journal of International Peacekeeping* (Brill) and *Bangladesh Institute of International and Strategic Studies Journal*.

নাঈম মোহায়মেন

নিউইয়র্ক-প্রবাসী গবেষক। চলচ্চিত্র এবং প্রবন্ধের মাধ্যমে উত্তর-ঔপনিবেশিক এবং সমাজতান্ত্রিক পটভূমিতে বাম ইউটোপিয়া (স্বপ্নরাজ্য) প্রচেষ্টা নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর চলচ্চিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৭৭ সালে জাপান এয়ারলাইনস ছিনতাই নিয়ে *সম্মিলিত লাল বাহিনী* (২০১১) এবং ১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ায় জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন নিয়ে *দুটি সমাবেশ, একটি জানাজা* (২০১৭)। চলচ্চিত্রগুলো প্রদর্শন হয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, টেইট মডার্ন এবং বর্তমানে নিউইয়র্কের মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টে। *ইতিহাসের শেষ পুরুষ বলে কিছু নেই* বর্তমানে প্রদর্শনীতে রয়েছে। তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দৈত্যের ছায়ায় দাঁড়িয়ে : ইতিহাসের আদার ব্যাপারী' (উইট ডে উইট, ২০১৬), 'যুদ্ধ শেষে মহড়ার পালা : মুক্তির গান যখন প্রামাণ্য দলিল' (বায়োস্কোপ, ২০১৬) এবং 'লেখার সময়, পড়ার ঘণ্টা' (ই পি ডব্লিউ, ২০১৬)। তিনি বর্তমানে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন করছেন।

প্রতীক বর্ধন

সাংবাদিক ও অনুবাদক। বর্তমানে দৈনিক *প্রথম আলোর* সহসম্পাদক পদে নিয়োজিত। অনুবাদের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মতামত কলামও লিখে থাকেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। আগ্রহের বিষয় রাজনীতি, অর্থনীতি ও ইতিহাস।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। ডাকযোগে নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বারসহ নগদ টাকাও পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যাবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৮১